বাংলা দেশের অগণিত মুক্তি যোদ্ধা ও শহীদ ভাই বোনদের
স্মৃতি ও সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে।

আমি মুজিব বলছি

কৃত্তিবাস ওঝা

বাণীপীঠ
৩৫ কলেজ রো ॥ কলিকাতা ৯

সবিনয় নিবেদন

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নিয়ে বইয়ের অভাব নেই। বহু গুণীজন পাকিস্তানের রাজনীতি ও বর্তমানের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বই লিখেছেন। এত বই থাকতে এ বাংলার একজন সাংবাদিক কেন এই বই লিখতে উৎসাহী হলাম তার জবাব বই পাঠ করে পাঠকরা পাবেন। পাকিস্তান-রাজনীতি ভিত্তি করে রচিত বই-গুলিতে পাকিস্তান সৃষ্টির মূল রহস্যটি অনেকেই এড়িয়ে যান, কিন্তু আজকের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্য কখনই সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না যদি না জানা যায় কোন রাজনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতে ও চক্রান্তে, কাদের জিদ, একগুঁয়েমি, অভিমান, ক্ষোভ ও হীনমন্য মনোভাবের কারণ পাকিস্তান সৃষ্টির রসদ জুগিয়েছিল। বিজ্ঞানের কাছে ভাবাবেগের কোন মূল্য নেই। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে, ধর্মকে ভিত্তি করে অবৈজ্ঞানিক রাষ্ট্র গঠনের বিপথগামী স্রোতকে বিজ্ঞান নিজের নিয়মে স্বাভাবিক নিয়মের পথে নিয়ে এসেছে। আজকের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের মূল তাৎপর্য এইখানে। তাই আজকের মুক্তি-যুদ্ধের ইতিহাস ও পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব ও পরবর্তী কালের ইতিহাস অভিন্ন। সেই ইতিহাসের অভিন্ন ধারাটি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। কাদের ভুল ও পাপের মূল্যের প্রায়শ্চিত্ত আজ রক্ত দিয়ে শোধ করতে হচ্ছে, সে কথা না জানলে আজকের মুক্তিযুদ্ধকে জানা সম্পূর্ণ হবে না।

এই গ্রন্থ রচনায় পাকিস্তান সম্পর্কিত বহু গ্রন্থের ও বহু সংবাদপত্রের সহায়তা গ্রহণ করেছি। বহু গ্রন্থ ও সংবাদপত্র থেকে বিবরণ হুবহু তুলে ধরেছি। কোথাও যদি তার অনুল্লেখ থাকে তবে সে ত্রুটির জন্য আগাম মার্জনা চেয়ে রাখছি। শ্রীবরুণ সেনগুপ্ত, শ্রীঅমিতাভ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রফুল্ল রায়চৌধুরী, ডঃ সৌমেন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাংবাদিক সুধীবৃন্দ নানা সময়ে নানাভাবে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীভবানী ঘোষ বইয়ের একটি অধ্যায় লিখে বইয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। শ্রীবিশু চৌধুরী ও শ্রীঅগ্নিবর্ণ ভাদুড়ী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। বসুমতী পত্রিকার প্রখ্যাত ফটোগ্রাফার শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চলা-কালে জীবন বিপন্ন করে আমার সঙ্গে থেকে যুদ্ধের ছবিগুলো তুলেছেন। শ্রীধীরেন অধিকারীও একখানি ছবি দিয়েছেন। বাংলা দেশের অভ্যন্তরে থাকাকালে আশ্রয়, আহার্য ও নিরাপত্তা রক্ষা করে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম আজ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেদিন সম্ভব হবে সেদিন সগর্বে ঘোষণা করব। সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এবং সকলেই আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করেছেন।

বিনীত

কৃত্তিবাস ওঝা

॥ প্রারম্ভ ॥

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

মুজিব নগর

বাংলাদেশ

শেখ মুজিব একটি দর্শন

একটি মহান ব্যক্তিত্ব, যার নির্দেশে আজও আমরা এগিয়ে চলেছি একটি শোষিত বঞ্চিত জাতির সার্বিক মুক্তির দিকে, সেই ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হবে--তা কৃত্তিবাসদার দেওয়া এ প্রস্তাবের আগে এমন করে কখনও ভাবিনি। তাই এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলার আগে এইটুকু বলা দরকার যে শেখ মুজিব একটি নাম নয়, শেখ মুজিব একটি দর্শন। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী মানুষের যে সংগ্রাম, যা আজ বিশ্বের ইতিহাসে এক নূতন দিগন্তের উন্মোচন করতে চলেছে—তা শুধু শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করেই নয় বরং শেখ মুজিবের দর্শন ভিত্তি করে এগিয়ে চলেছে। অসহযোগ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, সংসদীয় পদ্ধতি ও সশস্ত্র বিপ্লব—এ দুয়ের সংমিশ্রণে গড়ে উঠা মুক্তি সংগ্রামের এক নূতন পথ। এ নতুন দর্শন, মুক্তিকামী মানুষের কাছে এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে, কিভাবে সংসদীয় পদ্ধতি ব্যর্থ হলে সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হয় এবং সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য যে জনসমর্থনের প্রয়োজন তা অসহযোগ ও সংসদীয় পদ্ধতিতে সৃষ্টি করে বিপ্লবী সংগঠনের মাধ্যমে শত্রুকে চরম রূপে আঘাত হানা যায়, সে আন্দোলনে শেখ মুজিব এক নূতন অধ্যায়। তাই পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের কাছে এই মহান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একজন মুক্তির দিশারী হয়ে নতুন করে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছেন।

শেখ মুজিবের সাথে আমার পরিচয় সংগঠনের মাধ্যমে। অর্থাৎ আমি যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সে সংগঠন 'ছাত্র লীগ' করতে এসে। কেউ কেউ

এ সংগঠনকে আওয়ামী লীগের বি-টিম হিসেবে ভুলও করে থাকেন! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা হলো যুবধর্মে সংগঠিত পাকিস্তান উপনিবেশবাদের উপর চরম ভাবে আঘাত হানার জন্য, অস্ত্রের জবাব অস্ত্রের মাধ্যমে দেওয়ার জন্য গড়ে ওঠা এক ছাত্র সংগঠন—যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ভারত বিভক্তির সময় বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা "বাংলাদেশ" সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা পদদলিত হয়ে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে হস্তান্তরিত হয়েছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুর হাত হতে পাকিস্তান উপনিবেশবাদের হাতে। এবং এই পাকিস্তান উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল মুক্ত করে এক শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে জন্ম ছাত্র লীগ সংগঠনের। তাই আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বঙ্গবন্ধুর ভাষায় খুব সহজ হয়ে ধরা পড়ে—"আমি আওয়ামী লীগ-প্রধান আর ছাত্র লীগের আজীবন সভাপতি"। অর্থাৎ সংসদীয় রাজনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠা গণসংগঠন আওয়ামী লীগ আর যুবধর্মে বলীয়ান বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত ছাত্র লীগ—এ দুই দর্শনের মিলনসেতু বঙ্গবন্ধু। তেমনি বাংলাদেশের মানুষকে শ্রেণীশোষণমুক্ত শোষণহীন সমাজে গড়ে উঠার সহায়তায় বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে শ্রমিক সংগঠন—শ্রমিক লীগ। কেননা তিনি বলেন—"কৃষক শ্রমিকের রাজত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত শোষিত মানুষের মুক্তি আসে না।" তাই এই সংগঠনগুলোর মধ্যেই ফুটে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের যথার্থতা।

ছাত্র লীগের হয়ে প্রায়ই বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাদের এই সংগঠনের কাজে পরামর্শ নিতে যেতে হয়। এবং যতবারই তাঁর সম্মুখে যেতে হয় ততবারই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয় তাঁর অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে। গণসংগঠনের সাথে অধিক জড়িত হলেও ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের প্রতি জায়গার কার্যকলাপ যেন তাঁর নখদর্পণে। কোথায় কোন ইউনিয়নে কোন ছাত্র লীগ কর্মী কতটুকু কাজ করেছে তা যেন তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্ত। মাঝে মাঝে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন, "সারা বাংলাদেশের লোকই তো আমার। তাই কোথায় কি হচ্ছে তা কি আমার অজানা থাকতে পারে।" তখন ভাবতাম সত্যিই তো, সারা বাংলাদেশের লোক যে তাঁর লোক। তাই তো উনসত্তরের ২৩শে ফেব্রুয়ারীতে রেসকোর্সের সম্বর্ধনার জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—"এই বলে মোর পরিচয় হোক, আমি তোমাদেরই লোক।" সত্যি করে বলতে কি একথা তাঁরই বলা সাজে; যাঁর হাতের ইসারাতে লক্ষ লক্ষ জনতা ওঠে বসে, এ

কথা তো তিনিই বলতে পারেন। মাঝে মাঝে গণ সংগঠনের কর্মীদের চেয়ে ছাত্র সংগঠনের বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত কর্মীদের প্রগতিমনায় স্পষ্ট ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি এমনিভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের দর্শন, কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করতেন যে আমরা অবাক হয়ে যেতাম আর ভাবতাম বঙ্গবন্ধু এখনও যেন আমাদের সভাপতি। আমরা এমন এক বিপ্লবী মহানায়কের সাথে আলোচনা করছি, যে মহানায়কই শুধু পারেন একটি জাতিকে উপনিবেশবাদের শৃঙ্খল হতে মুক্ত করে বলিষ্ঠ জাতি হিসাবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে।

মুক্তি আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিব তাই তাঁর সিদ্ধান্তে অটল বিশ্বাসী এবং বিনা যুক্তিতে কারও পক্ষেই সম্ভব নয় তাঁর সামনে কোন বিষয়ের অবতারণা করে কিংবা তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। মৃত্যুর সম্মুখেও তিনি দৃঢ়তার সাথে সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারেন। '৬৯এর ফেব্রুয়ারীর চতুর্থ সপ্তাহের শেষের দিকে যখন তিনি ষড়যন্ত্র মামলায় 'অন্তরীণ' তখন তৎকালীন দেশরক্ষা মন্ত্রী এ আর খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুকে 'প্যারলে' গোলটেবিলে যেতে অনুরোধ করলো, এমন কি বঙ্গবন্ধুকে মৃত্যুভয়ও দেখালো, তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকে সেদিন এ আর খানকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন "You are general in war but child in politics". তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ও মনের দৃঢ়তাই তাঁকে আজ জাতির পিতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যা গণমানুষের মনে এনে দিয়েছে আলোর হাতছানি।

বাংলাদেশের এই শ্যামল মাটিতে তিনি যেমন জন্ম নিয়ে এর শ্যামল মায়ায় বর্ধিত হয়েছেন তেমনি এই মাটিকে ঘিরেই তাঁর দর্শন গড়ে উঠেছে। আর এই মাটিকে যে তিনি কত ভালবাসেন তার নিদর্শন পাই কয়েকটি ঘটনা থেকে। '৬৭এর শেষের দিকে বাংলার শোষিত মানুষের পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবি পেশের অভিযোগে তিনি তখন দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকা জেলে আবদ্ধ। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে তাঁকে মুক্ত বলে জেল থেকে বাইরে নিয়ে আসা হলো। তিনি জেল গেটের বাইরে এসে বুঝলেন যে এটা তাঁর মুক্তি নয়, কেননা তাঁকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার জন্য বিরাট সামরিক সাঁজোয়া গাড়ীর দল প্রস্তুত। তিনি এই ষড়যন্ত্রের আভাস বুঝতে পেরে সামরিক অফিসারটিকে একটু দাঁড়াতে বলে একটু দূরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে হাতে মাটি নিয়ে কপালে ঠেকালেন। পরে তাঁর কাছ হতে শুনেছি তিনি নাকি সেদিন একথাই বলেছিলেন—"এ মাটিতে আমার জন্ম, এ মাটিতেই যেন মরতে পারি।" শুধু এই নয়, যখন এই সেদিনও ঔপনিবেশিক

গোষ্ঠী বাংলাদেশ হতে সমস্ত অর্থ ও স্বর্ণ পাচার করছিল এবং তা যখন আমরা তাঁর দৃষ্টিতে এনে আমাদের দেশেব ভবিষ্যৎ কি হবে বলে প্রশ্ন করলাম, তখন অতি সহজে হাসতে হাসতে তিনি বললেন—"এতদিন ওরা আমাদের সব নিয়েছে, কিন্তু বাংলার মাটি তো নিতে পারে নাই! এ মাটিই যে আমার সোনা, একে রক্ষা করলেই সব হবে।"

এমনি শত শত ঘটনা তাঁব মাটির প্রেমের স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। তিনি যেমনি দেশের মাটিকে ভালবাসেন তেমনি ভালবাসেন সাধারণ মানুষকে। শত পরিশ্রান্ত হয়ে এসেও যদি দেখেন তাঁর জন্য একজন সামান্য মজুরও বসে আছেন তবে তিনি তাঁর অন্য কাজে বিলম্ব করে এলেও তার সাথে খোলাখুলি আলোচনায় মেতে যান। তিনি যখন যেখানেই থাকুন না কেন জনগণের জন্য তাঁর সাথে দেখা করার ব্যাপারে তিনি কোন বাধার সৃষ্টি হতে দেন না। তাইতো তাঁর বাস-ভবনের সামনে সর্বক্ষণের জন্য যেন একটা মেলা লেগেই থাকে। জনগণের প্রতি তাঁর এই অক্ষত ভালবাসাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংগ্রামে লিপ্ত হতে। তাই তিনি শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত অনাহারক্লিষ্ট সাড়ে সাত কোটি জনগণের অতি আপনজন, তাদের অতি প্রিয় নেতা—বঙ্গবন্ধু—যার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে শত বছরের পরাধীন এক জাতি এক নূতন সূর্যের সন্ধান। এবং যার প্রত্যাশায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ শত বুলেট, বেয়নেট, ট্যাংক, কামান আর মেসিনগানকে উপেক্ষা করে।

এমনি এক মহান নেতার আশীর্বাদ ও পরিচর্যায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ তার জন্মলগ্ন হতে পাকিস্তান উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত শোষণহীন বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রাম করে আসছে। বহু ঘাত প্রতিঘাত তুচ্ছ করে বাংলা-দেশের জনগণের বিজয় নিশানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বেরিয়ে এসেছে '৫২, '৬২, '৬৬ ও '৬৯এর রক্তঝরা ইতিহাসকে। শত শহিদের রক্তে পবিত্র হয়ে মুক্তির শপথে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে এসেছে এর প্রতিটি কর্মী, যারা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নেতৃত্ব দিয়েছেন, বাংলাদেশের মাটিতে গড়ে উঠছে এক একটি গণজোয়ার। তারাই তো জয় বাংলার দর্শনকে সামনে রেখে অর্জন করেছে '৭০এর ঐতিহাসিক গণবিজয়। '৭০-এর নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাদের রায় স্পষ্ট করে জানালেও গত ২৩ বছরের পাকিস্তানী শাসনের ইতিহাসের একটা যোগফল বার বার একথাই বলে দিয়েছে যে পাকিস্তানের বর্বর শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের

জনগণের এ রায়কে অত সহজে মেনে নেবে না। পৃথিবীতে কোথাও কোন ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী তার বিসদাঁত ভাঙার আগে পর্যন্ত মেনে নেয় নি, বা নিতে পারে না। এই ঐতিহাসিক সত্যকে সামনে রেখেই বাংলার যুবসমাজ এগিয়ে চলেছিল স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রামের দিকে। যুবসমাজের এই সংগ্রামে এক একটি স্তর অতিক্রম করে তার বিস্ফোরণের উপযুক্ত সময় ১লা মার্চে এসে উপনীত হয়। এই এগিয়ে চলার পথে ছাত্র লীগকে শুধু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বাধাই অতিক্রম করতে হয়নি, অতিক্রম করতে হয়েছে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীকে।

এমনি করে ১লা মার্চ পাকিস্তান কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশনকে স্থগিত করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানী ষড়যন্ত্র। জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল স্বাধীনতার ধ্বনি দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্র লীগ পল্টনে ঘোষণা করে দিল বহু-দিনের হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতাকে। শুরু হয়ে গেল প্রত্যক্ষ স্বাধীনতার সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানালেন অসহযোগের, সাড়া দিল লক্ষ কোটি জনতা সে ডাকে। ২রা মার্চ ঐতিহাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সর্ববৃহৎ ছাত্র সমাবেশে ছাত্র সমাজ পুড়িয়ে দিল পাকিস্তানের পতাকা। সেখানে উত্তোলন করা হলো বহু আশা আকাঙ্ক্ষার নূতন পতাকা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা।

৩রা মার্চ পল্টনে ছাত্র লীগের জনসভা। বিকেল ৩টায় সভা শুরু হলো সংগঠনের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকির সভাপতিত্বে। বঙ্গবন্ধু সেই সভায় অনির্ধারিতভাবে এসে উপস্থিত ছিলেন। আমাকেই পড়তে হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের এক নং ইস্তাহার। সে ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের কথা। এরপর বাংলাদেশ চলতে শুরু করল আমাদের প্রিয় নেতার নির্দেশে। সরকারী বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠান মেনে চলছে সেই নির্দেশকে. বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর সরকার। ৬ তারিখে ইয়াহিয়ার ভাষণের জবাবে ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমুদ্রের সামনে বঙ্গবন্ধু উপস্থাপিত করলেন তার ঐতিহাসিক ঘোষণা—
"এ সংগাম মুক্তির সংগ্রাম, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

এরপর একদিকে আলোচনা অপরদিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে মুক্তির সংগ্রাম। এগিয়ে এল ২৫শে মার্চ। দু পক্ষের রাইফেল

হতে বেরিয়ে এল বুলেট। বাংলাদেশের আকাশ ভরে গেল কাল ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধে। পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যেরা স্থাপন করল বর্বরতার এক নজির-বিহীন দৃষ্টান্ত। পুড়িয়ে দিল গ্রামের পর গ্রাম আর হত্যা করলো নিরীহ নিরস্ত্র জনসাধারণকে। কিন্তু মুক্তিকামী জনসাধারণ বীভৎস সামরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে চললো তাদের স্বাধীনতার পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে। জনগণ সামরিক বাহিনীর হত্যা ও নারীধর্ষণ, আগুন জ্বালানো প্রভৃতির মাঝে পরিবার পরিজনদের হারিয়ে নতুন মনোবল নিয়ে এগিয়ে চলেছে মুক্তির পথে। পাকিস্তানী সৈন্যের এই বর্বরতা কোন এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়, এটা ঘটেছে সেখানে যেখানে এই ববর সৈন্যেরা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই ভাবতে বিস্ময় লাগে যে একজন নেতার প্রতি কতটা শ্রদ্ধা থাকলে বা নেতা কত মহৎ হলে মানুষ পারে তার নির্দেশে এমনি করে এগিয়ে যেতে। তাই স্থির করা যায় না কোনটা সত্য যে —মুজিব বাংলাদেশের, না বাংলাদেশ মুজিবের।

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নেতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক কথাই বলে ফেলেছি, কিন্তু নেতার সত্যিকারের একটি ছবি যে আঁকতে পারিনি সেটা সত্য। কেননা শেখ মুজিবকে কোন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা উক্তির মধ্যে বোঝা বড়ই কঠিন। তাকে বুঝতে হলে তাই আমাদের খুঁজে ফিরতে হবে বাংলাদেশের এই মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে স্তরে। কিন্তু আমাদের অনেক বন্ধুই সেটা না করে তাঁর একটা বিচ্ছিন্ন উক্তিকে নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মেতে প্রকৃত মানুষটিকে না দেখে একটি বিকৃত মানুষের সন্ধান করে ফেরেন। সেখানেই বন্ধুরা ভুল করে বসেন। তাঁকে বুঝতে হলে দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শোষণে আবদ্ধ এমন একটি জাতীয় ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে যেখানে তাকে দেখতে পাওয়া যাবে মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি মুক্তি-যোদ্ধার মাঝে। কেননা মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে শেখ মুজিব একটি নূতন দিগন্ত। তাই সবশেষে আমি আবার সেই কথাই বলব,—শেখ মুজিব একটি নাম নয়, শেখ মুজিব একটি দর্শন।

বাংলাদেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলনে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ বিনা দ্বিধায় বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিচ্ছে। দেশ স্বাধীন হবে। পৃথিবীর কোন শক্তিই বাংলার স্বাধীনতাকে রোধ করতে পারবে না। আমাদেরকে ত রও অনেক রক্ত দিতে

হবে। এ রক্তের বিনিময়েই আমাদের উত্তরসূরীরা পৃথিবীর সবশ্রেষ্ঠ জাতি বলে পরিচয় দেবে। কিন্তু ফিরে পাবেনা তারা বাংলার এই স্বাধীনতা আন্দোলনের পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে, বাহান্নোর ভাষা আন্দোলনের পবিত্র শহিদ মিনারকে যা আজ পাঞ্জাবী হানাদারদের বুলেট, মেসিনগান আর ট্যাংকের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে (পরবর্তীকালে তার নাম হয়েছে সার্জেন্ট জহুরুল হল) ছাত্ররা সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর করছিলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। তারিখ ২৫ মার্চ। ছাত্র লীগের নেতারা পর পর কয়েকটি সংবাদ পেলেন টেলিফোনে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অবিলম্বে আক্রমণ করবে বলে গোপন সূত্র থেকে জানা গেছে।

ছাত্র নেতারা ছুটলেন শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে, স্থান : ঢাকার ধানমুণ্ডি। শেখ সাহেব নানা নেতা ও কর্মীকে নির্দেশ দিলেন। বললেন, "কেউ যেন অযথা সময় নষ্ট না করি।"

শেখ সাহেবের নিজের নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠল। কিন্তু তিনি বললেন, বাসস্থান ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। তাঁর কথা : "আমার লাস পড়ে যায় তো যাক।" তবু তিনি নড়বেন না, কেননা তাঁকে না পেলে ইয়াহিয়ার সৈন্যরা ঢাকায় কাউকে বাঁচতে দেবে না, গোটা শহরটাকেই ধ্বংস করে দেবে।

"মানুষ কারে কয় দেখলেন! মহত্বটা একবার দেখেন। কিন্তু আমরাও ছাড়লাম না।" বহু অনুনয় বিনয় করে আমি এবং আমার মতো আরো অনেকে শেখ মুজিবকে রাজী করিয়েছিলাম। রাত্রি এগারোটা নাগাদ বিশ্বস্ত কয়েকজন সংযোদ্ধার পাহারায় তাকে বাসস্থান থেকে নিরাপদে সরিয়ে দেওয়া হয়।

রাত্রি সাড়ে এগারোটায় গুলিবর্ষণ শুরু হল। সারা শহর জুড়ে। প্রথমে চারিদিক থেকে কাতর আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তারপর শুধু ফৌজী চীৎকার, গাড়ির আনাগোনা এবং গুলি আর গুলির শব্দ।

কিন্তু তা সাময়িক। পাকিস্তানী বাহিনী অতঃপর ট্যাংক নিয়ে রাজারবাগ আক্রমণ করে। সে-ও আমেরিকান আর চীনা ট্যাংক। পুলিশ লাইন এবং পুলিশ সেই হামলার সামনে দাঁড়াতে পারে নি। বাড়িটা গেছে গুঁড়িয়ে; এবং পুলিশদের অনেকেই মরেছে, সামান্য কয়েকজন পালাতে পেরেছিল।

এখন মনে হয় রাজারবাগে ওরকম প্রতিরোধ গড়ে তোলা ভুল হয়েছিল। ওখানে প্রতিকূল অভিজ্ঞতার সম্মুখীন না হলে ইয়াহিয়ার সৈন্যরা বোধহয় ঢাকার থানাগুলিকে একের পর এক শেষ করে দিত না।

রাজারবাগের ঘটনার পর সৈন্যবাহিনী শহরের থানাগুলিতে আক্রমণ চালায়। একমাত্র লালবাগ থানাটি এই হামলা থেকে রক্ষা পায়, কারণ সেখানে ইয়াহিয়ার

দালালরা ঘাঁটি করেছিল। ঢাকা শহরে অতঃপর আর একটি থানাও অক্ষত ছিল না। ইউনিফর্মপরা পুলিশ কত যে নিহত হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই।

শহরের প্রত্যেকটি দমকল-কেন্দ্রে হানা দিয়ে ইয়াহিয়া বাহিনী সেগুলিকে ধ্বংস করে দিল। যত দমকলেব কর্মী ছিলেন তাঁদের একজনও বাদ যান নি, প্রত্যেককে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। ২৬ মার্চ সকালে ইউনিফর্ম-পরা ১০০ পুলিশ এবং তাব দ্বিগুণ দমকল-কর্মীর মৃতদেহ এক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

রাত্রি প্রায় দুটোর সময় আক্রমণ চলল সদরঘাট স্টেশনে। পুরো চার ঘণ্টা গুলিবৃষ্টির পর স্টেশনে উপস্থিত যাত্রী, পোর্টার এবং অন্যান্য নানা শ্রেণীর লোকের অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে সেকথা কাউকে বলে দিতে হয় না। আশ্চয হবার নয় যে, পরদিন বুড়িগঙ্গা নদীতে শত শত মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেছে।

২৬ মার্চ ভোরবেলা গুলিবৃষ্টি হঠাৎ থেমে গেল। ভয়ে সন্তর্পণে কিছু কিছু লোক বেরিয়েছে রাস্তায়। চারিদিকে মৃতদেহ। পরিচিত এবং অপরিচিত মুখগুলি। সবাই হাত লাগায়। এক মর্মান্তিক কর্তব্য। অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে হাজারখানেক লাস জমা হয়েছে।

ততক্ষণে সৈন্যরা এসে গেছে। তাদের কড়া হুকুম: কেউ যেন লাস সরাবার চেষ্টা না করে। যেখানে যেমন আছে সেখানেই লাস পড়ে থাকবে। তবু কেউ কেউ মৃতদেহ সরাবার চেষ্টা করেছিল কোথাও কোথাও। যারা তা করতে গেছে মিলিটারির গুলি তাদেরও লাস বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

এ দিনকার ঘটনাবলী থেকে বোঝা গেল, ইয়াহিয়া বাহিনী আক্রমণের ছক বহু পূর্ব হতেই তৈরি করে রেখেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রদের হস্টেলগুলি এবং তাব চারদিকের বাড়ি-ঘরে পাকিস্তানী ফৌজ যে তাণ্ডব চালিয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। নামজাদা অধ্যাপক, মেধাবী ছাত্র, সাধারণ কর্মচারী—সবাইকে পরিকল্পনা অনুযায়ী খতম করা হয়েছে। ঢাকার বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রায় কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এইসব পরিবারবর্গকে—মায় শিশুদের পযন্ত—একেবারে নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে।

ইয়াহিয়ার ঔপনিবেশিক যুদ্ধ সুস্পষ্টভাবে তার শ্রেণীযুদ্ধও। ২৬ মার্চ ঢাকা শহরে এই কথাটির নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গেল।

শাজাহান সিরাজ
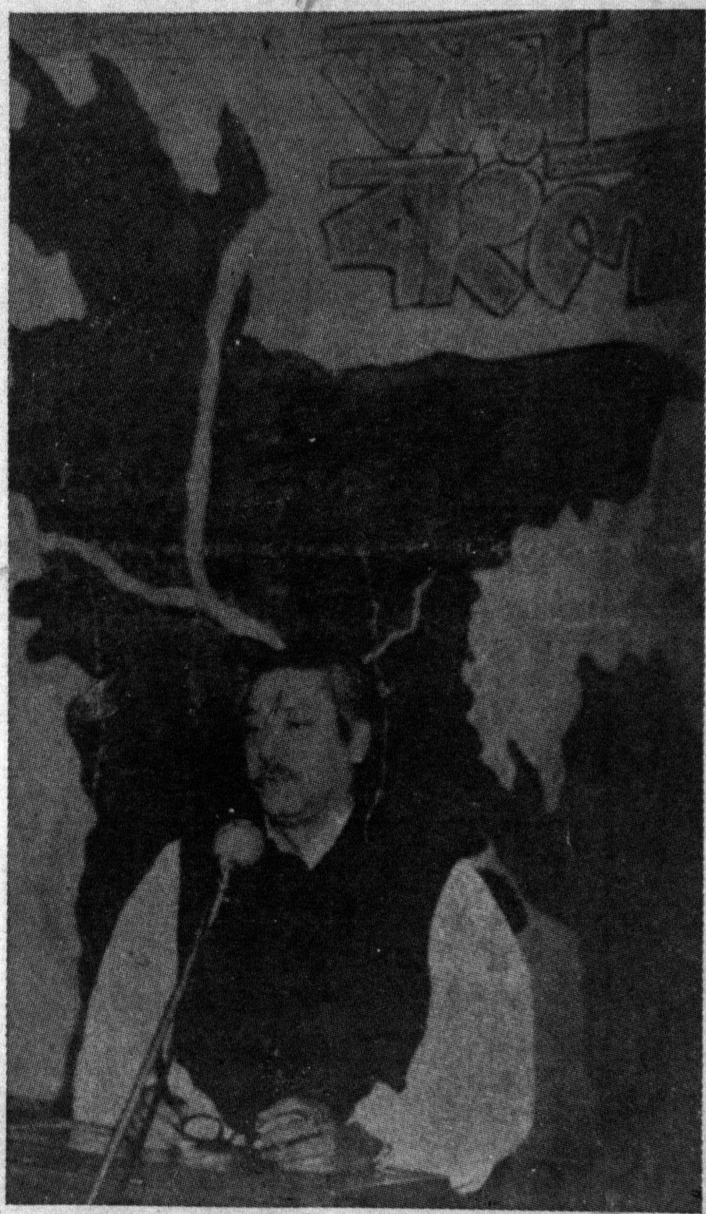
সেখ মুজিবের সঙ্গে নির্যাতিত বেলুচিনেতা আগবর খান বুগতি

দেশের বাড়ীতে পিতা ও মাতার সঙ্গে মুজিব
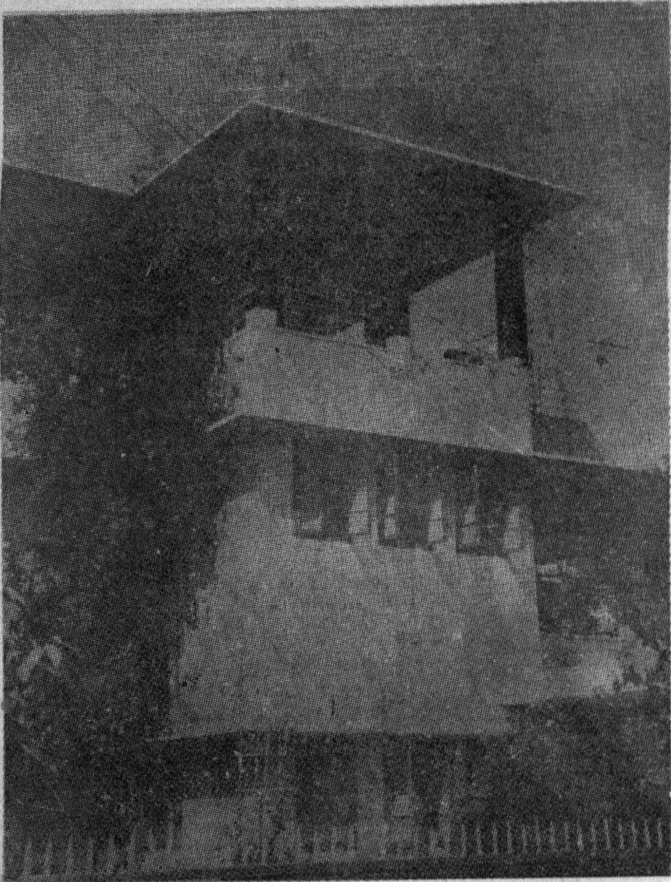
ঢাকা ধানমণ্ডির ৩২নং সড়কে সেখ মুজিবের বাসভবন। যে বাসভবন থেকে সাতকোটি বাঙ্গালী নির্দ্দেশ গ্রহণ করতো এবং ২৫শে মার্চ মধ্য রাত্রে যে বাড়ী গোলাবর্ষণ করে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতলের এক কক্ষ থেকেই মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়।
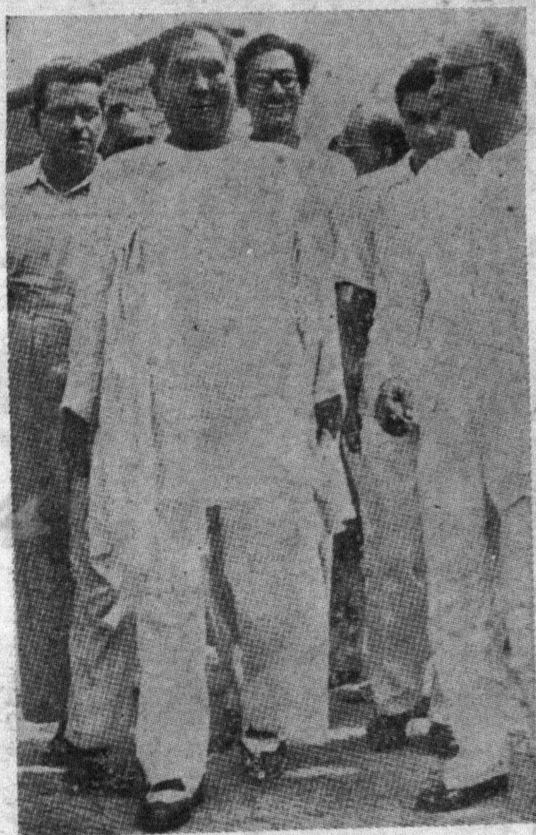
১৯৫৪ সালে দমদম বিমান বন্দরে জনাব ফজলুল হকের শেষ পদার্পন সঙ্গে রয়েছেন সেই দিনের তরুণ রাজনৈতিক নেতা সেখ মুজিবুর রহমান।

৭ই মার্চ্চ রবিবার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক সভায় উপস্থিত "একটি মুখ"। কোন রণসম্ভার তার নেই, নেই কোন আধুনিক মারনাস্ত্র আছে শুধু একখণ্ড বংশ দণ্ড। এই বংশ দণ্ডই তার শক্তির প্রতীক।
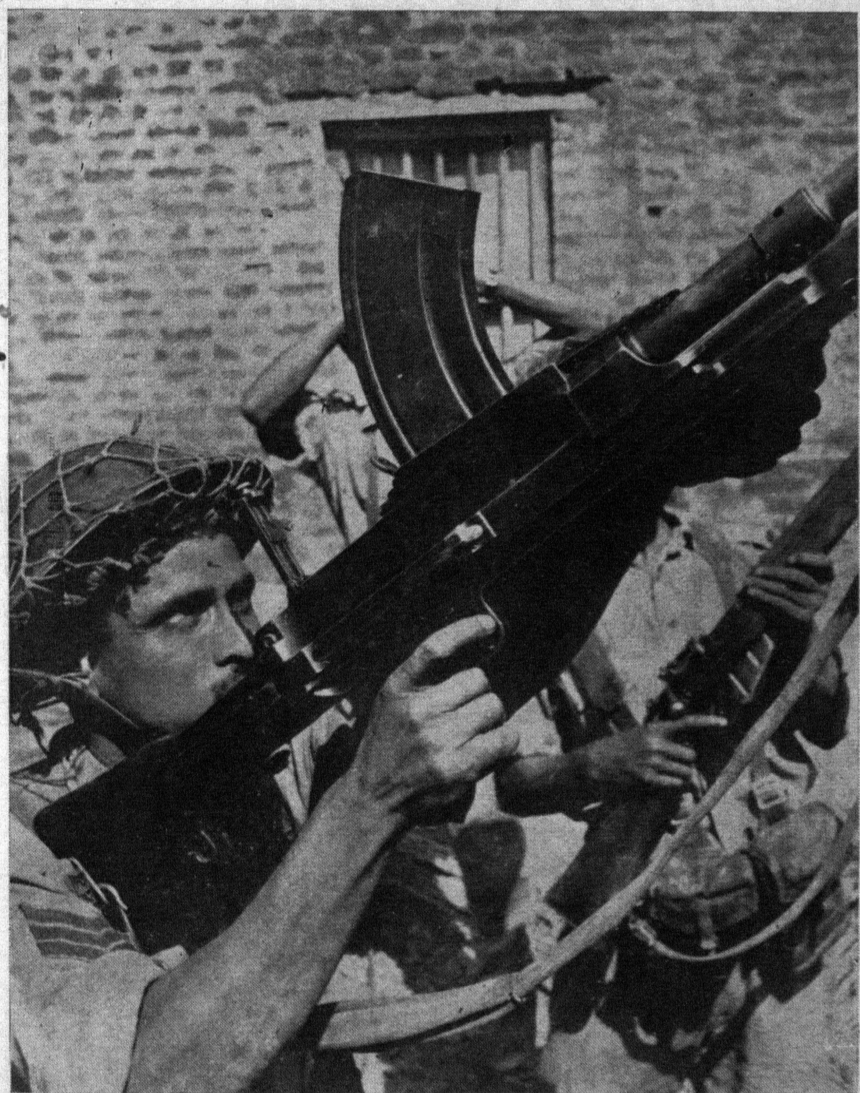
মুক্তি সেনার হাতে অস্ত্র লাইট মেশিনগান, এই দিয়েই জঙ্গীশাহীর বিমান নামাবার প্রচেষ্টা। ছবিটি রংপুর সহরের।
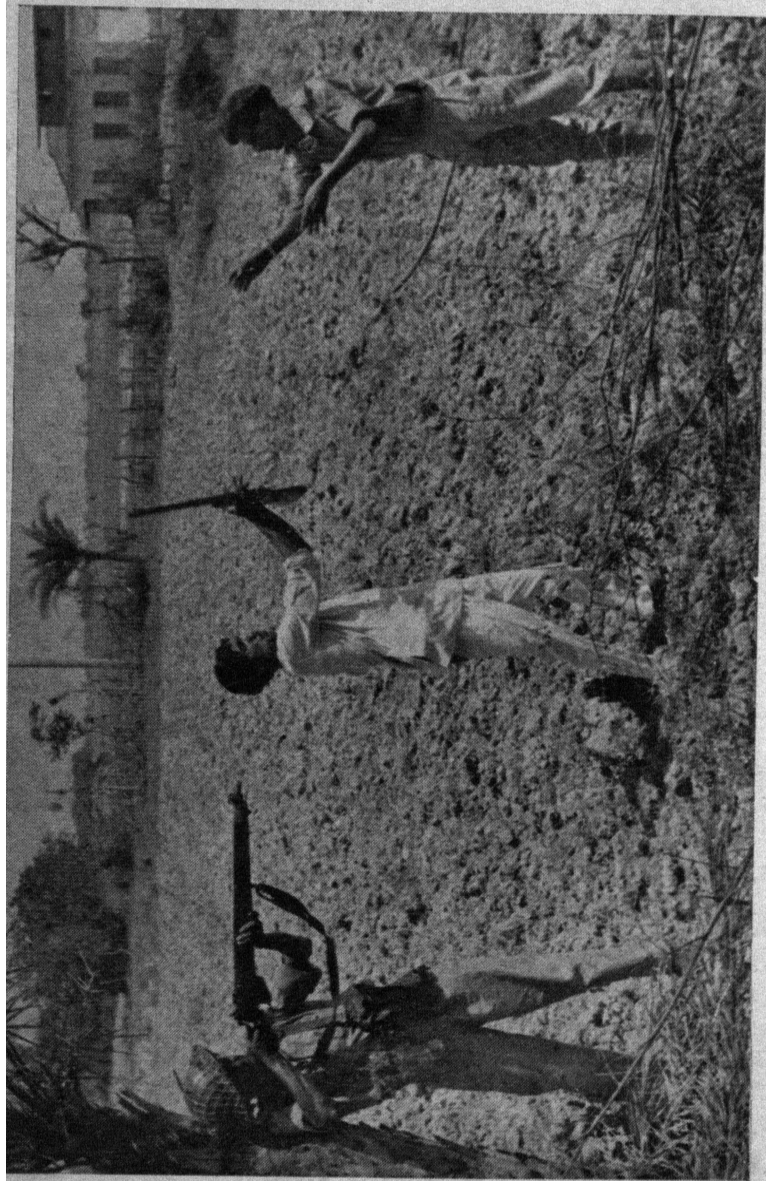
বন্দুক এখন হাতে হইতে হাতে ঘুরছে। একই রনাঙ্গনে যুদ্ধ চলছে সাথে সাথে চ'লছে প্রশিক্ষণও।
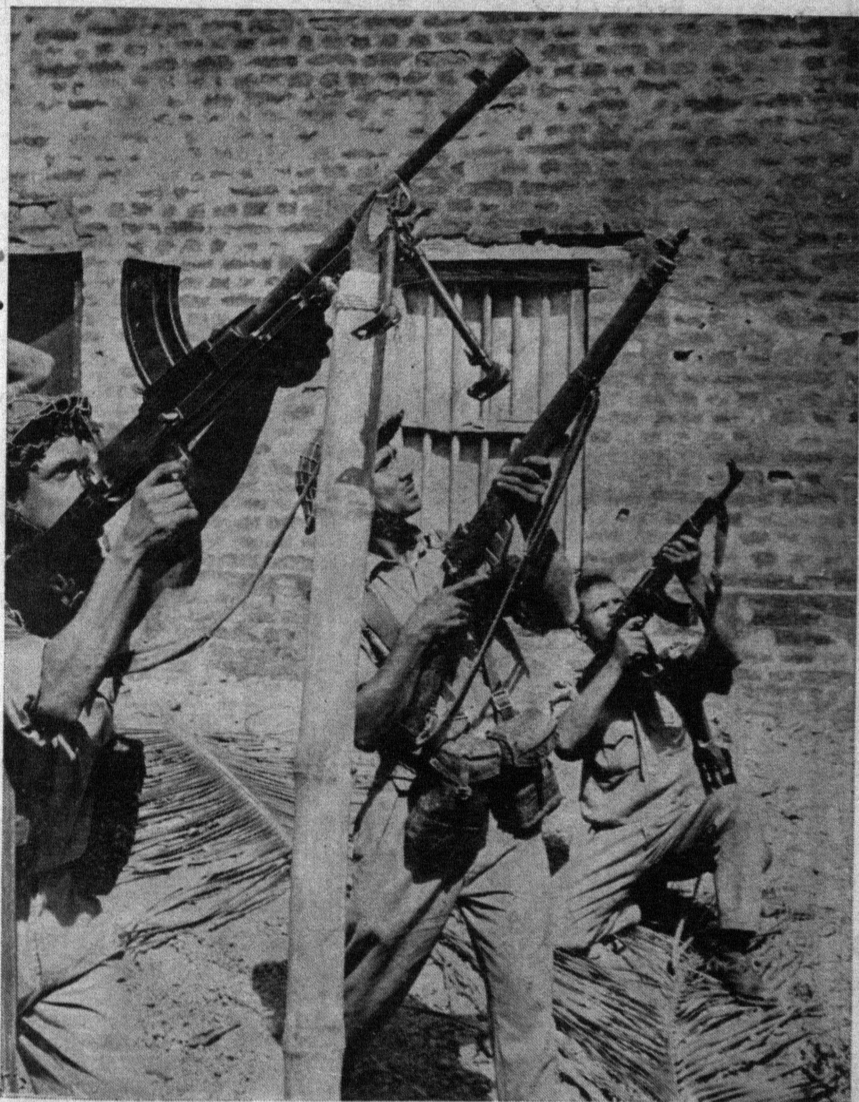
মুক্তি সেনারা লাইট মেশিনগান নিয়েই তাক করছেন পাক হানাদার বিমানের দিকে
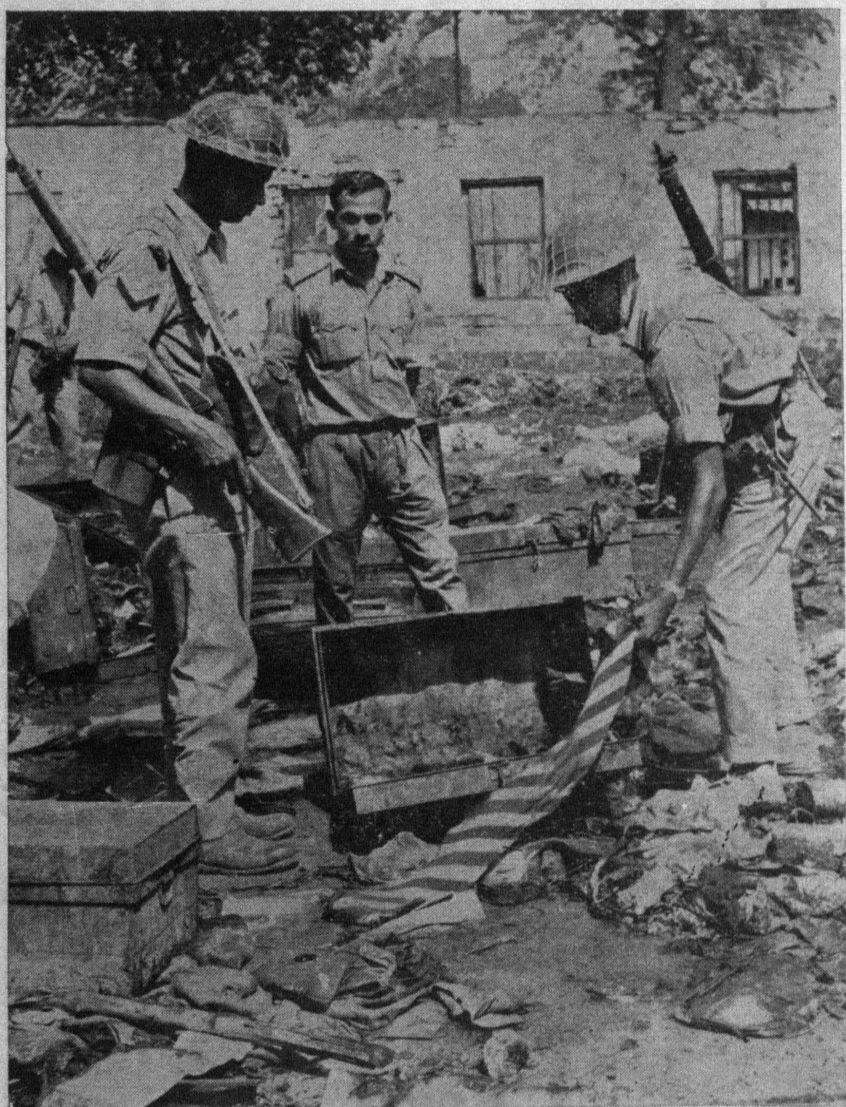
চুয়াডাঙ্গার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের ক্যাম্প পাক হানাদারদের বোমায় ধ্বংস হয়ে যাবার পর ; মুক্তি সেনারা খুঁজে দেখছেন কোন মৃতদেহ আছে কিনা।

পাক হানাদারদের বোমায় স্বরনগর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।
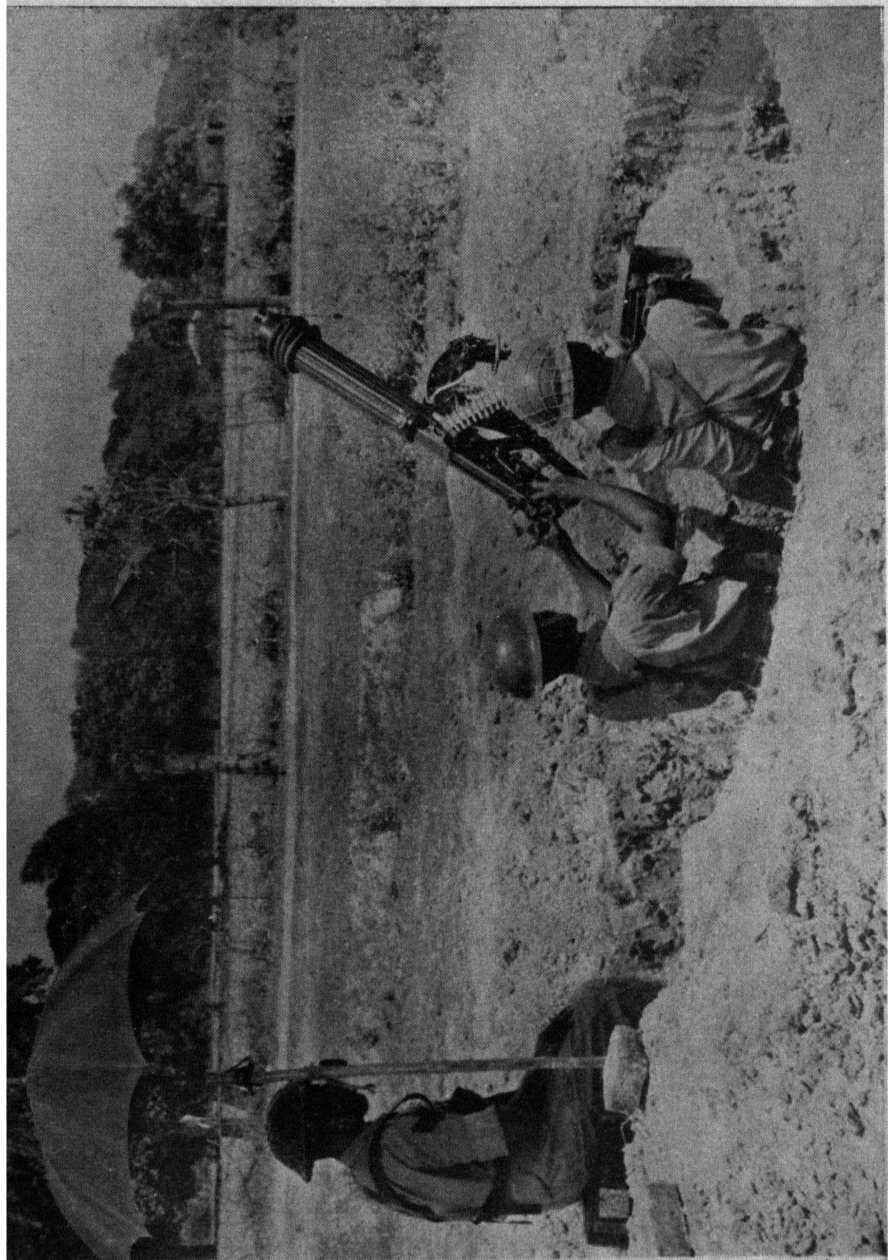
বাংলাদেশের আকাশে মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়েছে বর্ষার বৃষ্টি; মুক্তি ফৌজের কাছে প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ।
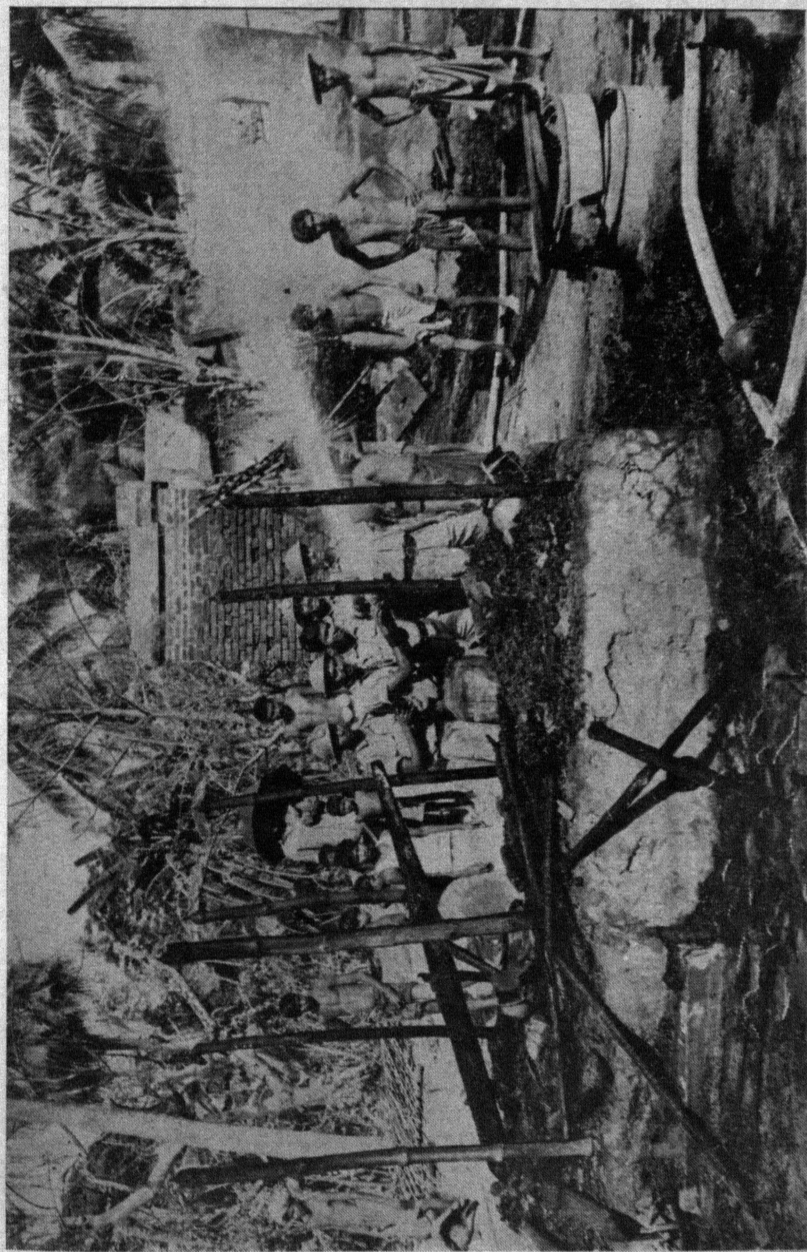
যুদ্ধ চলছে স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে, ওরা বোমা ফেললো—বোমার আগুনে গ্রাম জলছে, দমকল বাহিনী এগিয়ে এল আগুন নেভাতে।
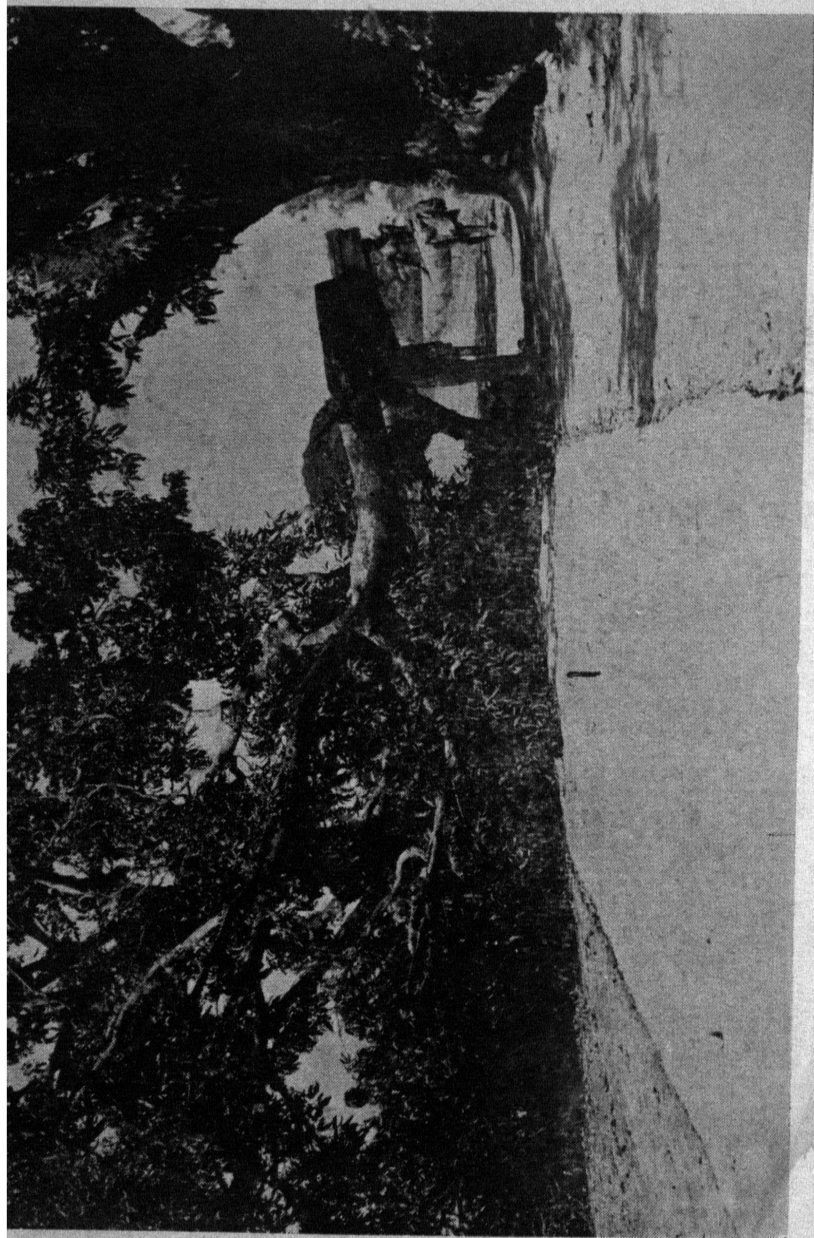
ঢাকা রাজশাহী প্রধান সরক। প্রতিটি সরকই বন্ধ।

প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতি সেখ মুজিবুর রহমান ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম

ইয়ুসুফ আলি চৌধুরী (মোহন মিয়া)

জনাব সৈয়দ আজিজুল হক

জনাব নরুল আমিন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মুজিবনগরে স্বাধীন সার্ব্বভৌম বাংলা দেশ প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা করছেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম, পাশে প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন।

আওয়ামী লীগের পরিষদীয় দলের কর্ম-কর্ত্তাগণ

সহকারী নেতা সৈয়দ
নজরুল ইসলাম

জনাব আবদুল মান্নান

সম্পাদক এ, এইচ, কামরুজ্জমান

জনাব আদীরুল ইসলাম

চীপ হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলি
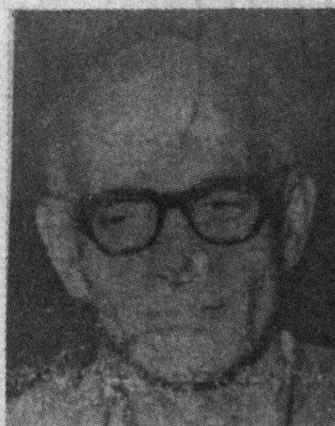
পূর্ব্বপাকিস্তান পরিষদ দলের নেতা
ক্যাপটেন মনসুর আলি।

বাংলাদেশ

আমি মুজিবর বলছি,—"বাংলাদেশ স্বাধীন, সার্বভৌম।" শুক্রবার ২৬শে মার্চ, ১৯১১ সাল সকাল ৯টা ৮ মিনিটে অজ্ঞাত রেডিও থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"আমি মুজিবর রহমান বলছি, বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রে পাক সশস্ত্রবাহিনী ঢাকায় পিলখানা ও রাজারবাগে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ ও পুলিশবাহিনীর উপর হঠাৎ আক্রমণ চালায়। বহু নিরস্ত্র লোক নিহত। ঢাকা শহরে ও ঢাকার অন্যান্য অঞ্চলে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ ও পুলিশের সঙ্গে পাক বাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণ শত্রুর সঙ্গে বীরের মত লড়াই করছে। বাংলাদেশ-এর কোণায় কোণায় শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আল্লাহ আপনাদের দোয়া দিন, শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করুন। আমরা বিড়াল কুকুরের মত মরব না, যদি মরতে হয় তবে বাংলা মায়ের সুযোগ্য সন্তান হিসাবেই প্রাণ দেব। 'বাংলাদেশের' পতাকা বাংলাদেশের সমস্ত গ্রামে উড়ছে। 'জয় বাংলা'।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই যুদ্ধের নেতা —নায়ক—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। সংগ্রাম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের বিপ্লবী জনতা ফৌজী চলাচল বন্ধ করতে উড়িয়ে দিচ্ছে পুল, ভেঙ্গে দিচ্ছে রেললাইন। ঢাকা বেতার কেন্দ্র মিলিটারীর দখলে গিয়েছে ৭টা ১৫ মিনিটে, কিন্তু স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র ঘোষণা করেছে যে তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও দিনাজপুরের বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছে। দখল করেছে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র।

এদিকে লড়াই চলছে সর্বত্র। চলছে ঢাকায়, সিলেটে, কুমিল্লায়, চট্টগ্রামে। গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে। সারাদিন সারারাত ধরে

চলছে যুদ্ধ। দু-পক্ষেই হতাহত অনেক। মুজিবর তাঁর গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে বলেছেন, "শত্রুর শেষ না দেখা পর্যন্ত লড়াই চলবে। জঙ্গীশাসন উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে যেতে হবে। জয় বাংলা দেশের হবেই।" শুধু তাই নয় আজ শনিবার সারা বাংলাদেশে হরতাল পালন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্বাধীন বেতার কেন্দ্র জানিয়ে দিয়েছে যে, টিক্কা খানের কোন ফতোয়াই বাংলাদেশ মানবে না, মানবে না, মানবে না।

এগারদিন ধরে ঢাকায় সাংবিধানিক সংকট নিরসনের আলোচনা চালিয়ে মুজিবের ৪ দফা দাবি নীতিগত ভাবে মেনে নেওয়ার পর ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রে ইয়াহিয়া খাঁ চুপিসাড়ে সরে পড়েন। পালিয়েছেন ভুট্টোও। তাঁরই নির্দেশে সামরিক কর্তৃত্ব পুনরায় কার্যকর করার উদ্দেশ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেনাণ্ট জেনারেল টিক্কা খান ১৬ দফার এক নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশে আছে : সর্বত্র কারফিউ, দেখামাত্র গুলি, ব্যাঙ্ক বেতার বন্ধ, রাজ-নৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ, সরকারী কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজে যোগদানের আদেশ, ইত্যাদি।

ঢাকা এবং আর কয়েকটি স্থানে ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রির পর সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। ঢাকায় সংঘর্ষ মারাত্মক। ঢাকায় ও চট্টগ্রামের পথে লড়াই চলছে। এবং জনগণ সামরিক প্রশাসনের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বদ্ধপরিকর। পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস্ এবং পুলিশ 'বাংলাদেশের' স্বাধিকার রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জনগণ। গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত দশ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য চট্টগ্রাম ও খুলনার চালনা বন্দরে নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। তাদের ঢাকা, কুমিল্লা ও যশোহর সেনানিবাসে পাঠানো হয়। তার ফলে পূর্ববঙ্গে পাক সেনার সংখ্যা দাঁড়ালো ৭০ হাজার। এই নতুন সৈন্য আসার পরই সংঘর্ষের খবর

পাওয়া যায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ছাড়াও কুমিল্লাতে সংঘর্ষ হয়েছে। কুমিল্লায় কয়েকজন ব্যক্তিকে গুলি করা হয়। সেনাবাহিনী বিভিন্ন স্থানে কয়েকশ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। সৈন্য, আধা-সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর বাঙালীদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। লাঠি হাতে পুলিশদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্তব্যরত রাখা হয়েছে।

কিন্তু বন্ধ হলনা কিছুই। ইতিহাসের চাকা বলদর্পীরা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু শুরু হল শেকল ছেঁড়ার যুদ্ধ। আহ্বান এল—'সকাল হয়েছে, বন্ধু শেকল ছেঁড়ো, বন্ধু শেকল ছেঁড়ো।' শত্রু সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র মানুষের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে।' সামরিক শক্তি উন্মত্ত ব্যভিচারে বিদ্রোহ দমন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই ভয়ঙ্কর রাতের ঘটনা ঢাকার এক হোটেলের জানলা থেকে দেখেছিলেন বিদেশী সাংবাদিকরা। তাঁরা বলছেন, "বৃহস্পতিবার রাত্রে দেখেছি সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে আসছে। অটোমেটিক অস্ত্র হাতে নিয়ে তারা ছুটছে। ট্যাঙ্কের উপর কামান ও রকেট নিয়ে তারা ছুটছে শহরের প্রতিটি রাস্তায়, অলি-গলিতে। রাত সাড়ে দশটায় সামরিক বাহিনীর এই অভিযান শুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল, যে-কেউ বাইরে পা দেবে তাকে গুলি করা হবে। ইন্টারকনটিনেণ্টাল হোটেলে আমরা পৃথিবীর নানা দেশের ত্রিশজন সাংবাদিক, ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নামজাদা সংবাদ সংস্থা, পত্র ও বেতার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এবং সোভিয়েট, যুগোশ্লাভ ও জাপানী সাংবাদিকরাও রয়েছেন। সৈন্যরা হোটেলটি ঘিরে রাখল। আমরা বন্দী হলাম। শুক্রবার (২৬শে মার্চ) সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট পর্যন্ত বন্দিদশা। সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে সামরিক ভ্যানে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ঢাকা বিমান বন্দরে। সেখান থেকে করাচী। করাচী থেকে বিমানে করে নিজ নিজ দেশে

বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় ঢাকা ইন্টারকনটিনেন্টাল হোটেলে আমরা জন ত্রিশেক বিদেশী সাংবাদিক বন্দী। জানলার পথে দেখলাম বন্যার মত সৈন্যরা রাস্তায় নেমে পড়েছে, যেখানে পাচ্ছে সেইখানেই বাংলাদেশের পতাকা ছিঁড়ে ফেলছে—সেগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। সারারাত গুলি গোলার শব্দ। তারই মধ্যে নিরস্ত্র জনতা তাড়া-হুড়া করে রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করছে। ব্যারিকেড গড়ে তুলছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গীরা এসে রকেট দিয়ে বা বুলডোজার চালিয়ে সেগুলি ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। আবার ব্যারিকেড, আবার অবরোধ। সারারাত এভাবে চলল। বাইরের পৃথিবীতে তাদের এ সকল কাজের কথাবার্তা যাতে না পৌঁছতে পারে সেজন্য সামরিক কর্তাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না।

ঢাকায় বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে প্যারিসে ফিরে গিয়ে এ এফ পি-র সংবাদদাতা ব্রিঁয়ামে বলেছেন : দেখলাম সৈন্যরা একটি একটি করে বাড়ী-ঘর বেছে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে এবং এও দেখেছি, প্রকাশ্য দিবালোকে কোন কোন বাড়ীর জানলা লক্ষ্য করে সৈন্যরা সাব-মেসিনগান থেকে গুলি চালাচ্ছে। প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় আমাদের বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হল। পথে যা দেখলাম তাতে এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে এসেছি, বাঙালীরা প্রচণ্ড ভাবে বাধা দিয়েছে। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে গিয়ে তাদের হাতে কি-ই বা ছিল? হয়তো ছোরা বা ছুরি। ক্যাণ্টনমেণ্টের ভিতর দিয়ে বিমান বন্দরে আসার পথ। সেই এক মাইল পথের মধ্যেও সংঘর্ষের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে হোটেলে বন্দিজীবন। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই, কোথায় কি ঘটছে জানি না। শুধু মুহুর্মুহু মেসিনগানের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাইনি। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে ইন্টারকনটিনেন্টালের কর্মীরা হোটেলের শীর্ষে বাংলাদেশের

পতাকা তুলে দিয়েছিলেন। জানালা-পথে দেখলাম মশাল হাতে সৈন্যরা এগিয়ে এল এবং পতাকাটি নামিয়ে নিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে সেটাকে পুড়িয়ে দিল। সেই গভীর রাত্রে মশালের অগ্নিআভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাকে আলোকিত করে তুলেছে। ওখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গত দুই সপ্তাহ ধরে আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার করে এমন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা থেকে মেসিনগানের শব্দ শুনতে পেলাম। অনুমান করে নিলাম ছাত্র স্বেচ্ছা-সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টারস্ দখলের জন্যই সেনাবাহিনীর এই নৈশ অভিযান। মুহুর্মুহু মেসিনগানের শব্দ আসতে লাগল। বুঝলাম হেড কোয়ার্টারস্ রক্ষার জন্য ছাত্ররা সর্বস্ব পণ করে লড়ছে, নিজেদের সামান্য শক্তি দিয়ে তারা সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বুঝতে পারলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা যে প্রতিরোধ ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার নানা শাখা। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আকাশ লালে লাল। বাড়ীর পর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে সৈন্যরা প্রেতনৃত্য করতে করতে চলে গেল। পথে যেতে যেতে ইংরাজী পত্রিকা পীপল্-এর অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে ঢাকার পুরনো মহল্লায়। সাংবাদিকরা সে অগ্নিকাণ্ড দেখেন নি। শুধু দেখেছেন তার বিরাট ধূম্রপুঞ্জ। পাকিস্তানী সেনারা ঢাকা শহরটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চলেছে। বৃহস্পতিবার রাত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তারা যে আগুন দিয়েছিল তার আভা আমরা একমাইল দূরে হোটেল থেকে দেখেছি। এও দেখেছি বাজার এলাকায় একটি তিনতলা বাড়ীর বারান্দা থেকে "বাঙ্গালী এক হও" আওয়াজ হওয়া মাত্র রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক জীপ থেকে মেসিনগান সেদিকে আগুন ছিটিয়ে দিল।

এ সময়েই সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির ঘটনা। আমাদের হোটেল থেকে বেশ খানিকটা দূরে কারফিউ বাঁধা রাত্রিতে একদল ছেলে কি একটা ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সামনে একদল জঙ্গী সেনা। হালকা মেসিনগানের গুলি ও ধোঁয়া—আর কিছু দেখা গেল না। ওদের কি হল বুঝতে পারলাম না। রয়টারের প্রতিনিধি হুইটেন জানাচ্ছেন, "কিছুক্ষণ পরে এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতার প্রাচীর ভেদ করে বহু দূর থেকে আর্তনাদের সুর ভেসে এল।"

ইণ্টারকনটিনেণ্টাল হোটেলের ১৬ তলা ছাদ থেকে দেখলাম, দিগন্ত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বুঝতে দেরী হল না, গভীর রাত্রে এটা সেনাদলেরই কীর্তি। আমরা পৃথিবীর নানা দেশের সাংবাদিক গোষ্ঠী ওদের প্রহরাধীনে সামরিক বন্দিগাড়ী করে বিমান বন্দরে পৌঁছুলাম। একজন পাঞ্জাবী সেনা তার রাইফেল দিয়ে ইঙ্গিত করে মজাদার গলায় বলল,—"দেখলে তো, ওদের সখের বাংলাদেশ কেমন খতম করে দিলাম।"

না, বাংলাদেশকে খতম করা যায়নি। বাংলাদেশকে খতম করা যায় না। বাঙালী জাতিকে খতম করা যায় না। ইতিহাস বার বার একথা প্রমাণ করেছে। (সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে দ্বাদশ শতকে নবদ্বীপ বিজয়ে এসেছিলেন বখতিয়ার খিলজি। কিন্তু ফিরে যেতে হয়েছিল তাঁকে। বক্তিয়ার খিলজি কোন স্মরণচিহ্ন রেখে যেতে পারেন নি নবদ্বীপের বুকে। সেখানে স্মরণচিহ্ন রয়েছে বাংলার স্বাধীন সুলতান মুনীষ-উদ্দীন-রজুফের। লক্ষ্ণাবতীতে রাজত্বকালে দিল্লীর মসনদকে মাত্র একজনই সুলতান সেলাম জানিয়েছিলেন। বাংলাদেশ বার বার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বার বার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে লক্ষ্মণাবতী তথা বাংলাদেশ। সামসুদ্দিন ইলিয়াস

শাহ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তারপর এলেন হোসেন শাহ। সেই পূর্ব বাংলা, সেই বাংলাদেশ, যেখানে সুবর্ণগ্রামের রাজধানীর প্রতিরক্ষা দুর্গ একডালায় সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে ফিরোজ শাহের অভিযান। সেই একডালা দুর্গ কেন্দ্র করে যে লড়াই—আজ যেন সেই একই লড়াই। আজ যেন সামসুদ্দিন ইলিয়াস মুজিবর তাজউদ্দিনের মধ্যে বেঁচে উঠেছেন, আর ইয়াহিয়া খাঁ বেঁচে উঠেছেন ফিরোজ শাহের মধ্যে। একডালা দুর্গ সেদিন দখল করতে পারেন নি ফিরোজ শাহ। এ সেই পূর্ব বাংলা যেখানে বারবার এসে মোঘলরা ফিরে গেছে। এ সেই বারভুঁইয়ার দেশ—বাংলা দেশ। ঈশা খাঁ বশ্যতা মানে নি মোঘল দরবারের কাছে। আইন-ই-আকবরীতে লেখা আছে—বাংলার আসল বাদশা ঈশা খাঁ। দিল্লীর মুদ্রা ছাড়া সেখানে আর বাদশাহী কোন কিছু চলে না। সেই ঈশা খাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন আজ ইয়াহিয়া খাঁ। ঈশা খাঁ বার বার জন্মগ্রহণ করেছে বাংলাদেশে। ঈশা খাই আজ 'মুজিবর'। বাংলা দেশের চির বিদ্রোহে 'মুজিবর' চিরবিদ্রোহী। 'মুজিবর' বার বার বিদ্রোহ করেছেন।

শুক্রবার ২৬শে মার্চ ঢাকা থেকে গোপনে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করলেন ইয়াহিয়া খাঁ। নিরাপদ দূরত্ব করাচী থেকে বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া বললেন, মুজিবর রহমান ও তার অনুগামীরা পাকিস্তানের শত্রু। ইয়াহিয়া বললেন, মুজিবর পাকিস্তানকে ভাঙতে চায়. তার শাস্তি মুজিবরকে পেতেই হবে। আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হল। ইয়াহিয়া বলেন, আজ দেশে যে গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সারা দেশে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হল। সংবাদপত্রের উপর কড়া সেন্সর ব্যবস্থা কায়েম করা

হল। এই সমস্ত ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শীঘ্রই সামরিক শাসন জারী করা হবে। দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হবে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, সরকারের কর্তৃত্ব পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে প্রয়োজনীয় সবকিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইয়াহিয়া খাঁর নির্দেশের রূপ দিলেন টিক্কা খাঁ। অবশ্য বৃহস্পতিবার রাত থেকেই পুরোদস্তুর লড়াই শুরু হয়ে যায়। তবে সে লড়াই প্রথম কয়েক ঘণ্টা সীমাবদ্ধ ছিল শহরের বিভিন্ন পুলিশ ব্যারাকে। সেনাবাহিনী ব্যারাকগুলি ঘিরে ধরে। পুলিশ ও ই পি আরের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিতে বলে। তাঁরা জবাব দেন যে, তাঁদের আই জি-র নির্দেশ ছাড়া তাঁরা তা কখনও করবেন না। সেনাবাহিনী তখন জোর করে অস্ত্র ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখনও কিন্তু গ্রাম ও ছোট ছোট শহরগুলির দিকে এগোবার চেষ্টা করেনি। তারা প্রধানত বড় বড় শহরেই ব্যস্ত। কলকারখানা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সেনাবাহিনী রয়েছে।

শুক্রবার সীমান্তের কতকগুলি এলাকায় ওপারের কিছু বাঙালী যুবক এসে এপারের লোকজনদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র চায়, চায় গ্রেনেড ও বোমা। কিন্তু তাদের বিফল হয়েই ফিরতে হয়েছে। কারণ আঞ্চলিক অধিবাসীরা কেউই গ্রেনেড ও বোমা দিতে পারেন নি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে দিন তিন-চার আগে থেকেই এই ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তারও খবর পাওয়া যায়। তিনদিন আগে টিক্কা খাঁ পূর্ব পাকিস্তানের আই জি-কে ডেকে বলেন, "আপনি সব এস পি-কে নির্দেশ দিন তাঁরা যেন সেনাবাহিনীর লোকদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দেয়।" বাঙালী আই জি সেই নির্দেশ মানতে অরাজী হন। তখন তাঁকে বলা হয়,

"আপনি পদত্যাগ করুন।" আই জি তাতেও অরাজী হন। এই খবর আই জি সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে দেন। ফলে পুলিশ এবং ই পি আরের কিছু লোক আগে থেকেই অস্ত্র নিয়ে ব্যারাক থেকে সরে যায়। ফরমান দিলেন টিক্কা খাঁ—১৬ দফা আদেশ জারী করে। বাংলাদেশকে তাঁবে রাখতে, পদ্মা মেঘনা বুড়ীগঙ্গার উত্তাল তরঙ্গকে বাঁধতে ১৬ দফা বিধিনিষেধ আরোপ করলেন টিক্কা খাঁ। সেই দফাগুলির মধ্যে আছে :—

এক :—পূর্ব পাকিস্তানে সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা। ঘরে বাইরে বক্তৃতা, সমাবেশ, সভা, ধ্বনি, মিছিল বিলকুল বন্ধ রাখতে হবে। কেউ এসবে যোগ দিতে পারবে না।

দুই :—ফৌজী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া খবরের কাগজে, বেতারে, টি ভি-তে, প্রাচীরপত্রে, পুস্তিকায় বা ভাষণে—কোন কিছু প্রকাশ করা চলবে না।

তিন :—পূর্ব পাকিস্তানের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে এমন কোন খবর বা মন্তব্য কোনভাবে প্রকাশ, প্রচার বা পাচার করা চলবে না। টেলিপ্রিন্টার ও বেতারবার্তা এই আওতার মধ্যে আসবে। সামরিক আইন প্রশাসক বা তাঁর অধস্তন অফিসার সেন্সর ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবেন। কোন কিছু প্রকাশে তাঁদের অনুমোদন অবশ্যই চাই।

চার :—সরকারী, বেসরকারী সব ক্ষেত্রের সব পর্যায়ের কর্মচারীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজ নিজ কর্মস্থলে হাজিরা দিতে হবে। এ আদেশ অমান্য করলে চাকরী যাবে এবং ফৌজী আদালতের সম্মুখীন হতে হবে। পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস্-এর কর্মীরা এই আদেশের আওতায় পড়বেন না।

পাঁচ :—পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

ছয় :—পূর্ব পাকিস্তানের কোন বাসিন্দা আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি বা বিস্ফোরক রাখতে পারবে না। যাদের কাছে এসব আছে সেগুলি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম থানায় জমা দিয়ে রসিদ নিতে হবে। কূটনীতিকরা ও ফৌজের লোকেরা এই হুকুমের আওতায় পড়বেন না।

সাত :—পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ব্যাংক বন্ধ থাকবে। কেউ টাকা তুলতে বা লকার থেকে কিছু বার করতে পারবে না।

আট :—সশস্ত্র, আধা-সামরিক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী সংগঠন ইত্যাদি ধরনের কোন তৎপরতা চলবে না।

নয় :—লাঠি, লোহার রড, রাম-দা বা অন্যকে আঘাত করা যায় এমন কোন কিছু কেউ রাখতে পারবে না।

দশ :—আগামী ৭২ ঘণ্টায় কোন পাঁচজন লোক একসঙ্গে জমায়েত হতে পারবে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য ফৌজী শাসকদের হুকুম নিতে হবে।

এগারো :—সরকারী শিল্প ও অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলিতে ধর্মঘট, লক্‌আউট বা কোনরকম আন্দোলন চলবে না। পশ্চিম পাকিস্তান সম্পর্কেও এই আদেশ প্রযোজ্য।

বার :—পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত কোন বিদেশী কাউকে কোন ভাবে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারবে না।

তেরো :—লুঠ, ঘেরাও, অগ্নিসংযোগ বা নাশকতা বরদাস্ত করা হবে না। আইনরক্ষা ও প্রয়োগের দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারও সহ্য করা হবে না।

চৌদ্দ :—ফৌজী লোকেরা যে কোন বাড়ী, যে কোন জায়গা, দোকান তল্লাসী চালাতে পারবে।

পনের :—সমস্ত সাইক্লোস্টাইল বা রিপ্রোডাকসান মেসিন সামরিক শাসকদের হাতে জমা দিতে হবে।

ইয়াহিয়া খাঁ আর টিক্কা খাঁর বেতার ভাষণ ও সামরিক শাসন জারীর আদেশের জবাব দিল স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র। ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়।

বেতার কেন্দ্রের ঘোষক বললেন—"স্বাধীন বাংলার ভাই বোনেরা, আস্সালাম আলেকুম। মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করছেন। সারা বাংলাদেশে আজ যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান। চিরাচরিত প্রথায় বাংলার ধনসম্পদ লুণ্ঠন করবার ঘৃণ্য মানসিকতা বর্জন করতে না পেরে ওরা এখনও শোষণ অব্যাহত রাখতে চায়। ওরা তাই সকল ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে পৈশাচিক ভাবে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে বদ্ধপরিকর। সমগ্র বাংলাদেশ সহ সমগ্র পৃথিবী আজ স্তম্ভিত। সামরিক শক্তির এহেন জঘন্য প্রয়োগের নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। আজ সারা দেশ সামরিক শক্তির দাপটে এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ক্ষত-বিক্ষত। স্বাধীন বাংলার বিপ্লবী জনসাধারণ তাদের উপরে আঘাত হেনে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।...ক্যানটনমেণ্ট এলাকায় স্বাধীন বাংলার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণে হানাদার শক্রদের দল প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

এই অবস্থায় শক্রবাহিনী শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে অনবরত হেলিকপটার ব্যবহার করছে। কুমিল্লা থেকে সৈন্য এনে তারা তাদের শক্তিকে মজবুত করতে চাইছে। ই পি আর ও অন্যান্য শক্তি তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রচণ্ড ভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই আজ মুক্তিপাগল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র জনতার নিকট আহ্বান জানাই শক্রসেনাদের মোকাবিলায় তুমুল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। হানাদারদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিন। শক্রসেনা

শহরে প্রবেশ করতে চাইলে সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে মরিচের গুঁড়া, সোডা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ছুঁড়ে দিন। হাতবোমা নিক্ষেপ করুন। গ্রামের ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন—দলে দলে শহর অভিমুখে অগ্রসর হোন এবং ক্যান্টনমেণ্ট দখল করার কাজে লিপ্ত মুক্তিসেনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। শহরের ভাইদের কাছে আবেদন, আপনারা দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মুক্তিসেনাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সর্বপ্রকারে সাহায্য চালিয়ে আমাদের এই দুর্বার আন্দোলনকে সফলকাম করে তুলুন।

বন্ধুগণ, আজকে সারা দেশের মানুষ উৎকণ্ঠায় পাগলের মত হয়ে উঠেছে। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিরপরাধ, নিরীহ, নিরস্ত্র জনগণের উপর ওরা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। দেখামাত্র গুলি করছে, হাজার হাজার মানুষ আজ মৃত্যু বরণ করছে। এর নজির বিশ্বের ইতিহাসে নেই। তাই আমি সারা বিশ্ববাসীর কাছে আহ্বান জানাব, বিশেষ ভাবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিকট আহ্বান জানাব,—আপনারা এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখেও চুপ থাকবেন না। এগিয়ে আসুন এই সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের বাঁচাবার জন্য। আপনারা আমাদের সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হোন। বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানাই, আপনারা মানবতার খাতিরে, মানুষকে বাঁচাবার তাগিদে, বাংলার জনগণের মুক্তির জন্য অগ্রসর হোন। হে বিশ্বের অধিবাসী, তোমরা শোন, তোমরা দেখো, কী ভাবে এই গণবিরোধী শক্তি, এই শোষক শ্রেণীর প্রতিভূ, এই সাম্রাজ্যবাদীদের দালালরা পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করবার উদ্দেশ্যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে আহ্বান জানাই, আপনারা চুপ করে থাকবেন না, আসুন, আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন। বন্ধুগণ, আমি সারা বাংলার, স্বাধীন বাংলার জনগণের কাছে আহ্বান

জানাব, বাঙালী ভাইয়েরা, আপনারা তুমুল সংগ্রামে নিজেদের শরিক করুন এবং হানাদার দুশমনদের খতম করুন। যে যেখানে যে অবস্থায় আছেন, যাঁর হাতে যে অস্ত্র আছে সেই অস্ত্র তুলে নিন। মা, বোন, বাপ, ভাইয়েরা বসে থাকবেন না। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ুন এবং সুবিধামত স্থানে অবস্থান করে শত্রু-সেনাদের ঘায়েল করুন। মারাত্মকভাবে আঘাত হানুন, আঘাতের পর আঘাত হেনে বাংলাকে মুক্ত করুন। স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়বে—এ দিন আর সুদূরপরাহত নয়। পরিশেষে আমি জনগণকে আহ্বান জানাব—এই দেশ, এই দেশের মহামান্য জননেতা, বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেবতা, বাংলার নয়নের মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নির্দেশে পরিচালিত হতে। অন্য কারো নির্দেশ বাঙালী কোনদিন বরদাস্ত করবে না এবং কোন 'মার্শাল ল' বাঙালীরা মানে না। আমি আহ্বান জানাব বাংলার প্রতিটি নরনারী সকলের কাছে, আপনারা 'মার্শাল ল' মানবেন না। মার্শালের কোন আইনই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা স্বাধীন বাংলার নাগরিক, স্বাধীন বাংলার মহান জননায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নির্দেশ আমাদের শিরোধার্য। জয় বাংলা। স্বাধীন বাংলা। জয় বাংলা।

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭৫। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানে আজ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হয়। ভোটাররা জাতীয় পরিষদের ৩০০ জন সদস্য নির্বাচন করবেন। এক নতুন সংবিধান রচনা করাই হবে পরিষদের প্রধান কাজ। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের কাছ থেকে ১৯১৯ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ ক্ষমতাগ্রহণের পর আগের জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেন। সেই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান একটামাত্র ইউনিট হিসেবে গণ্য হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে তার আসন সংখ্যা ছিল সমান। বরাবরের জন্য পূর্ব পাকিস্তানকে পদানত রাখবার জন্যে আইয়ুব খাঁর এই এক-ইউনিট পরিকল্পনা চালু হয়েছিল। এই এক-ইউনিট পরিকল্পনার ফলে পূর্ব পাকিস্তান পাঞ্জাবীদের প্রভুত্বাধীন হয়ে পড়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের এক অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। স্বায়ত্তশাসন ও পৃথক রাষ্ট্রগঠনের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে—যার মুখ্য প্রবক্তা হলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান। পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ের বিপর্যয়ের পর পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের ত্রাণকার্যে অবহেলাও পূর্ব পাকিস্তানের পৃথক হবার দাবিকে জোরদার করে তোলে। শেখ মুজিবর রহমান বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে এসে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে বলেন, "স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্খাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দশ লাখেরও বেশী লোক মারা গেছেন। শাসকদের মধ্যে যাঁরা ভাবছেন জনগণের দাবিকে অবহেলা করা চলে—তাঁদের সাবধান হবার সময় এসেছে। বাংলা দেশ জেগে উঠেছে। নির্বাচন যদি বানচাল করে না দেওয়া হয় তবে বাংলাদেশ নির্বাচনে তার যোগ্য রায় দেবে। আর নির্বাচন যদি বানচাল করে দেওয়া হয়—তবে

স্বাধীনভাবে বসবাস করবার জন্য বাংলাদেশ যাতে নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে—তার জন্য দরকার হলে আরো দশ লাখ লোক প্রাণ দেবে। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রভূত গম উৎপন্ন হয়েছে ও ভাগ্যের পরিহাসে পূর্ব পাকিস্তানকে এই প্রথম বিদেশীদের কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়েছে।" মুজিবর প্রশ্ন করেন—"ইসলাম ও জাতীয় সংহতির স্বয়ম্ভু প্রভুর দল—মৌলানা মাস্থদী খান, কোয়ায়ুম খান, মিঞা মমতাজ দৌলতানা, নবাবজাদা নাসরুল্লা খান এবং অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা আজ কোথায়? তাঁরা কি একটা দিনের জন্যও এসে যারা বেঁচে রয়েছে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারতেন না? আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা একটা কথাই হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিচ্ছে। কথাটা হল, বাংলাদেশকে উপনিবেশ ও বাজার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিকের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় সরকারের এবং তার আমলাদের হাতেই সব ক্ষমতা একচেটিয়া করে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে চরম অবহেলা ও বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য আমি তাদেরই দায়ী করছি। ইসলামাবাদে বিলাসবহুল স্মৃতিস্তম্ভ গড়বার জন্য ছুশো কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে। অথচ দশ বছরেও সাইক্লোন নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুড়ি কোটি টাকাও জোটেনা। তাই আমরা স্থির নিশ্চিত বাংলাদেশকে যদি রক্ষা করতে হয় তবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আর্থিক উন্নয়ন, বন্যানিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ পুনর্গঠন করা সম্ভব হবে। আমাদের আমরাই শাসন করব। যেসব সিদ্ধান্ত আমাদের প্রভাবিত করে, সে সব সিদ্ধান্ত আমরাই নেব। আমাদের টাকা আমরাই খরচ করব। আমরা আর পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা, পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুদের স্বার্থে কষ্টস্বীকার করব না। শক্তিশালী কেন্দ্র ঢের দেখলাম। জাতীয় সংহতির নামে আমরা অনেক অপরাধ করেছি।"

মুজিবর্ তাঁর এই বক্তৃতায় একবারও নিজের দেশকে পূর্ব পাকিস্তান বলে উল্লেখ করেননি, উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ বলে। মুজিবরের ছ'দফা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচন শেষ হল। নির্বাচনে জয়জয়কার হল মুজিবরের। ঢাকায় শতকরা পঁচানব্বই জন ভোট দিলেন। একত্রিশ হাজারের বেশী কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হল। মুজিবর রহমান দুটি কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন।

পাক জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দলীয় অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ :— আওয়ামী লীগ—১৫১, পিপল্‌স্ পার্টি—৮১, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম গোষ্ঠী)—৯, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)—৭, জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-পাকিস্তান—৭, জমিয়ত-উল-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজরভি গোষ্ঠী) —৭, জাতীয় আওয়ামী-পার্টি (ওয়ালি খাঁ গোষ্ঠী)—৫, জমায়েত ইসলামি—৪, মুসলিম লীগ (কনভেনশন)—২, ডেমোক্রেটিক পার্টি —১ নির্দল—১৬। মোট ঘোষিত আসন—২৯০। বন্যাবিধ্বস্ত ৯টি আসনের নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হয় এবং সবকটি আসনেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেন

৯ই ডিসেম্বর নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর মুজিবর রহমান এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন, তাঁর দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তানের নূতন জাতীয় পরিষদের সংবিধান তৈরী করতে হবে। তাঁর দলের বিরাট সাফল্যের অর্থ ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি জনসাধারণের প্রবল সমর্থন। মুজিবর রহমান বলেন দেশবাসীর কাছে তাঁর বাণী হল—"একদিন না একদিন যাতে আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারি তার জন্যে সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়ে এগিয়ে যেতে হবে।"

মুজিবর রহমানের বিখ্যাত ছয়দফা কর্মসূচী হল :—

(১) সংবিধানে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্র

হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ভিত্তি। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত আইনসভাই হবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে ২টি বিষয় থাকবে। প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র। অঙ্গরাজ্যগুলি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে।

(৩) আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সংবিধান রক্ষার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলিকে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাদল গঠন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে।

• আওয়ামী লীগ মনে করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মেটাবার জন্য মূল ও ভারী শিল্প, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, সকল প্রকার পরিবহন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা দরকার।

(৪) সকল দেশের প্রতি মৈত্রীর মনোভাব নিয়ে পাকিস্তানকে জোটনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে হবে।

(৫) পাকিস্তানে হয় অবাধে বিনিময়যোগ্য ২টি মুদ্রা প্রচলন করতে হবে না হয় সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রা চালু করা যেতে পারে। সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রা চালু করা হলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকরী সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক রিজার্ভ রাখতে হবে।

সকল প্রকার কর ধার্যের একমাত্র অধিকার থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কোনপ্রকার কর ধার্য করতে পারবেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের খরচ মেটাবার জন্য রাজ্যের সংগৃহীত করের একটা অংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্যের সকল করের উপর একটা নির্দিষ্ট শতাংশ ধার্য করে ঐ টাকা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মজুত তহবিল গড়ে তোলা হবে।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি করে পৃথক হিসাব রাখতে হবে। বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে যে বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হবে রাজ্যগুলি তার মালিক হবে। রাজ্যগুলি সমান হারে বা একটা নির্দিষ্ট হারে বিদেশী মুদ্রার একটা অংশ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন মেটাবে। কোনরূপ কর ছাড়াই দেশে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে চলাচল করবে। অঙ্গরাজ্যগুলি যাতে বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগ করে অঙ্গরাজ্যের স্বার্থে বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা চালাতে পারে সংবিধানে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৯ই ডিসেম্বর। অনেকদিন পরে মুখ খুললেন ৮৯ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী। মৌলানা ভাসানী নির্বাচনকে তামাসা মনে করেন। মৌলানা ভাসানী বললেন, "নির্বাচনে শেখ মুজিবুরের আওয়ামী লীগ দলের এই প্রচণ্ড জয়লাভ স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলেই রায়।" মৌলানা ভাসানী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অথবা রাজ্যগুলির সার্বভৌম অধিকার সহ শিথিল ফেডারেশানের প্রস্তাব করেন তিনি বলেন, "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান ইরাণ, তুরস্ক ও আরবের ন্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবে। পশ্চিমবঙ্গ যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দিতে চায় তবে তাকেও স্বাগত জানানো হবে।"

মুজিবুর রহমান দাবী জানালেন, ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসাতে হবে। ২৯শে ডিসেম্বর জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ সেই দাবি মেনে নিলেন। পর্বত এলো মহম্মদের কাছে। ইয়াহিয়া খাঁ বসলেন মুজিবুরের সঙ্গে বৈঠকে। ঘোষণা করলেন, "মুজিবুর

রহমানই পাকিস্তানের ভাবী প্রধান মন্ত্রী।" ঢাকায় এলেন ভুট্টোসাহেবও। মুজিবুরকে ছয় দফা দাবি থেকে টলাবার অনেক চেষ্টা করলেন। হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন ভুট্টো সাহেব।

শুরু হল চক্র চক্রান্ত। কাশ্মীরে ধরা পড়ল 'অলফাতা' নামে গুপ্ত সংস্থা। সেই গুপ্তসংস্থার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার অভিযোগে ভারত সরকার পাকিস্তান হাই-কমিশনের প্রথম সচিব জনাব ইকবাল রাঠোরকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেন। 'অলফাতা'—যার অর্থ হল জয়। এই সংস্থা কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী জি এম সাদিক ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কাশ্মীর পুলিশ বেশ কিছুদিন আগেই এই 'অলফাতা'র সন্ধান পায়। ৮ই জানুয়ারী এই সূত্রে গণফ্রন্ট নেতা আফজল বেগের এবং ৯ই জানুয়ারী শেখ আবদুল্লার জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ নিষেধ জারী করে আদেশ দেওয়া হয়। গণভোট ফ্রন্টের চারশত কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ই জানুয়ারী গণভোট ফ্রন্টকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ১৮ই জানুয়ারী 'অলফাতা'র ২২ জন গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপরই ১৪শে জানুয়ারী এই 'অলফাতা' সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে জাফর ইকবাল রাঠোরকে বহিষ্কার করা হয়।

২৫শে জানুয়ারী। পশ্চিমে যখন 'অলফাতা' চক্র ধরা পড়েছে, পশ্চিমে যখন ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশের দু'জন দূতাবাসের প্রধানকে বহিষ্কার করা হয়েছে—সেইদিন ২৫শে জানুয়ারী যশোরের কপোতাক্ষ নদী তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে বসল 'মধুমেলা'। সাড়ম্বরে পালিত হল মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৪৭তম জন্মোৎসব। পঞ্চাশ হাজার মানুষ এসেছিল সেই উৎসবে। সাগরদাঁড়িতে এসে সাহিত্যসাগর মধুসূদনের জন্মভূমিকে প্রণাম জানালেন ঢাকা-রাজশাহী-রংপুর-পাবনা-কুষ্টিয়া-খুলনা থেকে মানুষের দল। পূর্ব বাংলার মানুষ নব-ঈদ পালন করল সেদিন সাগরদাঁড়িতে। ভাষণ দিলেন ডক্টর

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ডক্টর মণিরুজ্জমান। সভাপতিত্ব করলেন কবি জসীমুদ্দীন। সকলের শ্রদ্ধানিবেদনের ভাষা এক—"মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যের দিক্‌পাল—মধুসূদন বাঙালীর মধুসূদন, পূর্ব বাংলার এক অতি আদরের নাম। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের মত মধুসূদন বাংলার জাতীয় কবি।"

ভুট্টোসাহেব এসেছেন ঢাকায়। তিন্‌দিন শেখ মুজিবুরের সঙ্গে আলোচনা করে ফিরে গেলেন ভুট্টো সাহেব। সেদিন ৩০শে জানুয়ারী। আর সেইদিনই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একটি ফকার ফ্রেণ্ডশিপ বিমানকে দুজন বিমান-দস্যু পিস্তলের মুখে বিমানের গতি পরিবর্তন করিয়ে জম্মু থেকে লাহোর নিয়ে যায়। বিমানে ছিল আটাশ জন যাত্রী, চারজন বিমানকর্মী। পাকিস্তান সরকার বিমান-দস্যুদ্বয়কে পাকিস্তানে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়। বিমান-দস্যুদ্বয় হুমকি দেয়, "হয় কাশ্মীরে আটক ৩৬ জন মুক্তিফ্রণ্টের সদস্যকে মুক্তি দিতে হবে, অন্যথায় লাহোর বিমান ঘাঁটিতে তারা বিমানটি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবে।" জুলফিকার আলি ভুট্টো এখানেও হাজির! ১লা ফেব্রুয়ারী মিঃ ভুট্টো বিমানবন্দরে গিয়ে একজন বিমান-দস্যু হাশিম কুরেশীর সঙ্গে কথা বললেন। হাশিম কুরেশী ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলে সাংবাদিকদের বললেন, "আমরা যা করার পরিকল্পনামত করেছি এবং এটি তার অতি অল্পই।" বিমানবন্দরে এক বিরাট জনতা ধ্বনি তোলে, "বিমান-দস্যুদ্বয় দীর্ঘজীবি হোক, কাশ্মীর আমাদের, বিমানটি ভারতকে ফেরত দেওয়া হবে না।" এইদিন আলাদা একটি বিমানে বিমানযাত্রী ও বিমানকর্মীদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। ভুট্টো সাহেব এই লাহোরেই ঘোষণা করেন, "আওয়ামী লীগের কর্মসূচীর ভিত্তিতে রচিত কোন সংবিধান তিনি গ্রহণ করতে পারেন না। এইরকম সংবিধানের অর্থ হবে বাঙালী জাতির জন্য স্বায়ত্তশাসিত একটা অঞ্চল।"

২রা ফেব্রুয়ারী ভারতের ছিনতাই বিমানখানি লাহোর বিমান বন্দরে বোমা ফাটিয়ে ধ্বংস করে দিল বিমান-দস্যু দুজন। বোমা দিয়ে বিমানটি ধ্বংস করে আরও দুটি বোমা হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে—যারা আগুন নেভাতে আসবে তাদেরও তারা বোমা মারবে। (ভারত সরকার যখন ছিনতাই বিমানখানি ফেরত দেবার জন্য এবং বিমান-দস্যুদ্বয়কে ভারতে ফেরত পাঠাবার জন্য দাবি জানাচ্ছিলেন এবং পাকিস্তান সরকার যখন বিমানখানি ফেরত দেবার প্রশ্নে টাল-বাহানা করছিল, তখন বিমান-দস্যুরা ভারতের বিমানখানা পুড়িয়ে দিয়ে ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের মধ্যে অনভিপ্রেত তিক্ততার সৃষ্টি করল। ভারত সরকার ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানের জন্য পাকিস্তানের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করলেন এবং এক আদেশে ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করে দিলেন।) বিমান-দস্যুদের অন্যতম মহম্মদ হাসিম কোরেশীর বাবা মহম্মদ খালিব কোরেশী শ্রীনগরে বলেন, "আমার ছেলেকে আমার সামনে এনে গুলি করে হত্যা করা হোক। মাতৃভূমির প্রতি তার এই বিশ্বাসঘাতকতার এটাই হল একমাত্র শাস্তি।" (কিন্তু ওদিকে পাকিস্তানে বিমান-দস্যুদ্বয়কে ভারতে ফেরত পাঠানো নয়, ক্ষতিগ্রস্থ ভারতকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া নয়, বিমান-দস্যুদের নিয়ে পালটা বিজয় মিছিল বেরোলো লাহোরে। এক বিধ্বস্ত ভারতীয় বিমানের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিবর্তে পালটা ভারতের কাছেই ক্ষতিপূরণ দাবি করা হল।)

লাহোরে যখন পাকিস্তানী রাজনীতির এই ন্যক্কারজনক অভিনয় চলছে তখন ৫ই ফেব্রুয়ারী পূর্ববাংলার জননায়ক শেখ মুজিবুর রহমান ভারতীয় বিমান ধ্বংসের তীব্র নিন্দা করে বললেন, "এই ঘটনার পশ্চাতে রয়েছে পাকিস্তানের শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকে সাবোটাজ করার বিশেষ মতলব।"

"ইত্তেফাক" পত্রিকা এক দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বিমান ধ্বংসের

ঘটনাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করল। ইত্তেফাক বলল, এই অপরিনাম-দর্শী হঠকারিতার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপনের ভাষা আমাদের নাই। আমাদের বিশ্বাস কোন সুস্থবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষই ইহার নিন্দা না করিয়া পারিবে না।

শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে ছিনতাই করা বিমানটি উড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মুজিবুর বলেন, "শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকে সাবোটাজ করার মতলব নিয়ে কায়েমী স্বার্থবাদীরা চক্রান্ত করছে। এই ঘটনা প্রতিরোধের জন্য কর্তৃপক্ষ ত্বরিত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। জাতীয় জীবনের এই সংকট সন্ধিক্ষণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির দ্বারা ষড়যন্ত্রকারী ও অন্তর্ঘাতীদের স্বার্থ সিদ্ধি হতে পারে।"

ভুট্টো কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ফরমান দিলেন। ভুট্টো বললেন, "এ ব্যাপারে পাকিস্তানের কোন দায়িত্বই নেই, কারণ ছিনতাই-কারীরা কাশ্মীরের লোক, তারা ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। কাশ্মীরীরা আশ্রয়ের জন্য আবেদন না জানিয়েও পাকিস্তানে থাকতে পারে।"

১০ই ফেব্রুয়ারী ইসলামাবাদে একদল পাকিস্তানী দুষ্কৃতকারী ভারতীয় দূতাবাসের বাইরে পুলিশ পাহারা এড়িয়ে দূতাবাসের ভিতরে ঢুকে পড়ে। দূতাবাসের জানলা দরজা ভেঙে ফেলে আসবাব-পত্র পুড়িয়ে দেয়। বিমান ধ্বংসের ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা একটু থিতিয়ে আসতেই জনাব ভুট্টো তাঁর তূণ থেকে নতুন শর নিক্ষেপ করলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করলেন—"৩রা মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে।" ১৪ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসল। এই বৈঠকে ঘোষণা করা হয় যে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করতে হবে।

পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষ এই দাবির পিছনে আছে। মুজিবুর রহমান বলেন, তাঁরা ইতিমধ্যে একটা খসড়া সংবিধান রচনা করেছেন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই খসড়ার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে। তিনি কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, "অসামরিক প্রশাসন চালু করার পথে বাধা দানের চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা আগুন নিয়ে খেলা করার সামিল।"

সেই আগুন নিয়ে খেলাই শুরু করলেন জনাব ভুট্টো। পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুজিবের দাবির জবাব দিয়ে ভুট্টো বললেন, মুজিবুর ৬ দফা দাবির ব্যাপারে আপোস না করলে জনাব ভুট্টো জাতীয় পরিষদের বৈঠকে বসবেন না। ভুট্টো সাহেবকে জাতীয় পরিষদের বৈঠকের মূল্য হিসাবে আওয়ামী লীগকে ৬ দফা দাবী ছাড়তে হবে। ১৬ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের এক সভায় শ্রীমুজিবুর রহমানকে দলের নেতা নির্বাচন করা হয়। আড়াই ঘণ্টার বৈঠকে শ্রীনজরুল ইসলাম আইন সভায় দলের সহকারী নেতা, শ্রীকামারুজ্জমান সম্পাদক এবং শ্রীইউনুস খাঁ মুখ্য সচেতক নির্বাচিত হন।

৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। তার জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে পাকিস্তান আইন সভা ভবন নবরূপায়ণের কাজ চলছে। তিনশত লোক দিবারাত্র খাটছে। ৩রা মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন করবেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী আবার এক বিবৃতি দিলেন মুজিবুর রহমান। মুজিবুর রহমান বললেন, "পশ্চিম পাকিস্তান বাংলা দেশের ৭ কোটি মানুষের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ চালাচ্ছে। কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের ক্ষমতা থাকায় এখানকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থের সেবায় লাগানো হচ্ছে। এর ফলে ওখানে পুঁজিপতি গড়ে তুলছেন মুনাফার পাহাড় আর

বাঙালীরা ভিখারীতে পরিণত হচ্ছেন।" ২০শে ফেব্রুয়ারী মুজিবুরের নেতৃত্বে একটা মিছিল বেরুলো ঢাকা শহরে। জিন্না অ্যাভিন্যুতে মিছিল থেমে গেল। মিছিল থেকে দাবি উঠল—জিন্না অ্যাভিন্যু নয়, 'সূর্য সেন' অ্যাভিন্যু চাই।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার মাত্র ৩ দিন বাকী। ১লা মার্চ ভুট্টোর কাছে নতিস্বীকার করলেন ইয়াহিয়া খাঁ। করাচী থেকে এক বিবৃতিতে ইয়াহিয়া খাঁ বললেন, পাকিস্তানের দুই অংশের নেতাদের মধ্যে রাজনীতিগত বিরোধ দেখা দিয়েছে। এই বিরোধ অবসানের অবকাশ সৃষ্টির জন্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখা হল। এইদিন আর একটি ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর অ্যাডমিরাল এস এম আহসানকে গদীচ্যুত করা হয়। অ্যাডমিরাল আহসান কয়েক দিন আগে মুজিবুরের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

১লা মার্চ সোমবার ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণা ঢাকায় পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঢাকা শহর, সারা পূর্ববঙ্গ। ৩রা মার্চ দেওয়া হয় বাংলা বন্ধের ডাক। মুজিবুর রহমান সংগ্রামে প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আগামী রবিবার এক জনসভায় ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।" প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার ছাত্র হাতে লাঠি সোঁটা অস্ত্র নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে আসে। বিক্ষোভকারীদের দমন করতে পুলিশ কয়েক বার লাঠি চালনা করে। পূর্ববাংলার পথে পথে ধ্বনি উঠল—জয় বাংলার জয়। ২রা মার্চ মঙ্গলবার ঢাকায় সর্বাত্মক ধর্মঘট। ঢাকা শহরে বিক্ষোভ মিছিলে দশ হাজার ছাত্র রাজপথে বেরিয়ে পড়ল। রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে শ্রমিক, আইনজীবি, সরকারী কর্মচারীরা। বিক্ষোভকারীদের হাতের প্ল্যাকার্ডে লেখা "জয় বাংলা" "স্বাধীন বাংলা"। ঢাকা বিমান বন্দরের কাছে জনতার উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে ১ জন নিহত হয়।

*সোমবার ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী ঘোষণার আগেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী আসতে শুরু করে। মুজিবুর ঘোষণা করলেন, "ষড়যন্ত্রকারীরা যদি মনে করেন তাঁরা আবার তাঁদের ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করতে পারবেন তা হলে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন।" ঢাকা শহরের ছাত্ররা রাস্তার উপর বালি দিয়ে একটা স্তূপ তৈরী করে সেই স্তূপের উপর সাদা খড়ি দিয়ে লিখে দেয়—এই হল ভুট্টোর কবর। ঢাকায় প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। মুজিবুর রহমান সেই গোলটেবিলে যোগদানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন। কারফিউ জারী করা হয়েছে ঢাকা, রংপুর, শ্রীহট্টে। হাজার হাজার মানুষ কার-ফিউর নির্দেশ অমান্য করে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীরা ফৌজী শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ফৌজী শাসন। তাদের হাতে বন্দুক। ক্রুদ্ধ বিক্ষোভকারীদের দমনের নামে নির্মম হত্যা শুরু হয়েছে রাস্তায় রাস্তায়। মুজিবুর রহমান রবিবার ৭ই মার্চ পর্যন্ত লাগাতার ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন। ১০ই মার্চ ঢাকায় রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছেন—"বন্দুক উঁচিয়ে এই গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান জানান হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র মানুষকে নির্মম ও নির্দয়ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। এই হত্যাকারীদের সঙ্গে কোন বৈঠক হতে পারে না।

৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার ঢাকা শহরে ছুটি বৃহৎ জনসভা অনুষ্ঠিত হল—একটি শহিদ মিনারে, অপরটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে। কারফিউর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। খুলনা, রংপুর এবং অন্যান্য শহরেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা কয়েক শতে পৌঁছেছে। বি বি সি খবর দিচ্ছেন সাধারণ ধর্মঘটে পূর্ব পাকিস্তান অচল। মুজিবুর জানিয়েছেন—গণ বিক্ষোভে উদ্বেলিত ঢাকা ও তার

আশেপাশে মিলিটারীর গুলিতে মারা গেছেন ৩০০ জন। আর একটি খবরে বলা হয়েছে, পাক বর্বর সেনাবাহিনী মেসিনগান চালিয়ে দু হাজার মানুষকে খুন করেছে। মুজিবুর রহমান বুধবার বললেন, সেনাবাহিনী দখলকারী সৈন্যদের মত নিরস্ত্র মানুষের উপর মেসিনগানের গুলি চালাচ্ছে। বুধবার বিক্ষোভ প্রদর্শন কালে বিক্ষোভকারীরা পাকিস্তানের একটি জাতীয় পতাকা ও জিন্নার একটি প্রতিকৃতি পুড়িয়ে দেয়। বুধবার প্রথমেই পাকিস্তানী জাতীয় পতাকার পরিবর্তে 'জয় বাংলা' পতাকা ওড়ে। সেনা চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে ঢাকার রাজপথে ব্যারিকেড রচনা শুরু হয়। ২০০ গজ অন্তর রাবিশ ও ইঁট-পাটকেল ফেলে রাজপথ অবরোধ করা হয়।

পূর্ব বাংলায় নতুন ধ্বনি উঠেছে—'জয় বাংলা'। কভারে মুজিবুরের ছবি দিয়ে জয় বাংলা গান বেরিয়েছে। গানটি পরিচালনা করেছেন আজাদ রহমান। এক বৃহত্তর সংগ্রামে বাঙালীকে উজ্জীবিত করা, দেশাত্মবোধের মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করাই এই গানের উদ্দেশ্য।

"পুবের আকাশে সূর্য উঠেছে
আলোকে আলোকময়
জয় জয় জয় জয়—জয় বাংলা!
ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী
বেরিয়ে এস বলে
বর্গী যদি আসে তাদের
তাড়িয়ে দিতে হবেই!
তাড়িয়ে দেব, তাড়িয়ে দেব—
বুলবুলিকে ধান দেব
আদর সোহাগ করে
সেই তো আমার খাজনা দেওয়া
ভালবাসায় ভরে।

দস্যুগুলো পালিয়ে গেছে
আঁধার হয়েছে ক্ষয়
জয় বাংলা, জয় জয় জয় জয়।"

জয় বাংলা! জয় বাংলা! গত ২৩শে মার্চ মুজিবুর রহমান নিজের বাড়িতে জয় বাংলা পতাকা তুলেছেন। সেই পতাকা ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে। জয় বাংলার নাম বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মুখে।

মুজিবুরের ঐতিহাসিক ঘোষণার মাত্র একদিন বাকী। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ এক পা পিছু হটলেন। ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করলেন ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবে। ইয়াহিয়া খাঁ তাঁর ঘোষণায় সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ৫টি মৌলিক নীতির উল্লেখ করলেন। তার মধ্যে ১টি হল পাকিস্তানের আঞ্চলিক সংহতি অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুরের উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়ে বলেন, মুজিবুর তাঁর আচরণ সংযত না করলে পরিণাম খারাপ হবে। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার জন্য তিনি আওয়ামী লীগের নেতাকে দায়ী করেন। তিনি মনে করেছেন, রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান হিসাবে তিনি দেশের সংহতি বিপর্যস্ত হতে দেবেন না।

১৩ মিনিট বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া খাঁ যখন পাক জাতীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করলেন, সেই সঙ্গে অনেক হুমকি, ধমক ও সতর্কবাণী শোনালেন মুজিবুরকে, তখন বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত দল ও নেতারা এসে সমবেত হয়েছেন মুজিবের পিছনে। গত ৬ দিনের ফৌজী বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও হত্যালীলা এক করে দিয়েছে সকলকে। মৌলানা ভাসানী এসে দাঁড়িয়েছেন মুজিবের পাশে। বি ডি পি নেতা নুরুল আমীন—যিনি নির্বাচনের আগে মুজিবের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন—তিনিও মুজিবের পাশে। সারা পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের

৭ কোটি মানুষ আজ এককাট্টা। পূর্ব পাকিস্তানের রেডিওর সুর ও আওয়াজ বদলে গেছে। পাকিস্তান রেডিওতে ভারতকে আর হিন্দুস্থান বলে উল্লেখ করা হচ্ছে না—ভারতকে ভারত বলেই উল্লেখ করা হচ্ছে। বেতার কেন্দ্রগুলিতে আর তত বেশী ধর্মীয় ও ইসলামীয় সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে না। বেতার কেন্দ্রে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত অথবা নব জাগরণের সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে। এখন আর রেডিও পাকিস্তান ঢাকা নয়, এখন "ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি"। গতানুগতিক অনুষ্ঠান-সূচী নয়, বেতারে শোনা গেল দেশাত্মবোধক ও সামরিক সঙ্গীত। শেষ গান সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।" গান আরও গান।

"সাত আকাশের আলো দিয়ে মোরা
সূর্যতোরণ গড়েছি।"

অথবা "স্বপ্ন রঙিন ভোরের আকাশে
নবীন সূর্য জেগেছে
দীপ্ত প্রাণের দখিণ দুয়ারে
তোমার তূর্য বেজেছে।"

কখনও—"নব জীবনের দীপ্ত আকাশ তলে।"

কখনও—"আঁধার যখন আকাশ ছেয়ে এল
বাজল গুরু গুরু—
তখন আমার যাত্রা হল শুরু।"

কখনও—"আঁধারের পথ পার হয়ে
আমরা এলেম নতুন দিনের প্রান্তে"

কখনও—"মায়াময় আমার দেশ"

কখনও—"চল সম্মুখে হব আগুয়ান
হাতে আছে হাতিয়ার

আজ মানবো না কোন বাধা
সংশয় সব গুরুভার।"
কখনও—"এক রাশ নীলাকাশ দিগন্তে ঘূর্ণি
একটি কপোত সেথা উড়ছে—।"
কখনও—"ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে দাও আঁধারের কারা")

মুজিবুর বৈঠকে বসলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও সংগ্রাম সাথীদের নিয়ে। মাত্র একদিন পরে (৭ই মার্চ) মুজিবুর তাঁর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। বৈঠক বসল মুজিবুর রহমানের বাড়ীতে। বৈঠকে বসলেন খোন্দকার মুস্তাক আমেদ, তাজউদ্দিন আমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলি, আল হজ জাহিরউদ্দিন। বৈঠক চলাকালেই খবর এল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের নূতন গভর্নর নিযুক্ত করেছেন।

টিক্কা খান। ১৯১৩ সাল। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিরা আর একবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। জোয়ারের রুটি আর দিশী বন্দুক সম্বল করে রুখে দাঁড়ালো আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে। আয়ুব খাঁ বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ৭ হাজার বর্গমাইল জুড়ে 'সারভনদ্ রোড' তৈরী করতে। সারভনদ্ রোড তৈরী না হলে দুর্ধর্ষ বেলুচিদের আয়ুব খান কোনক্রমেই বাগে আনতে পারছিলেন না। গ্রামে যদি মিলিটারী ঢুকতে না পারে তাহলে মিলিটারী শাসন কায়েম হবে কি করে? তাই 'সারভনদ্ রোড' তৈরীতে আয়ুব খাঁর বড্ড বেশী গরজ। কিন্তু বাধা দিল বেলুচিরা। তারপর বেলুচিস্থানের গেরুয়া রঙের পাহাড়ী মাটি বেলুচিদের রক্তে লাল হয়ে গেল। আর এই রক্তের বন্যা যিনি বইয়েছিলেন তিনি হলেন টিক্কা খান। বিদ্রোহী বেলুচিরা ঘোষণা করল—"আমাদের বুকের এক ফোঁটা রক্ত থাকতে 'সারভনদ্ রোড' তৈরী করতে দেব না।"

সেদিন নভেম্বর মাস ১৯১৩ সাল। যে সরকারী ইঞ্জিনিয়াররা 'সারভনদ্ রোড' তৈরী করতে এসেছিল তাদের ছাউনি আক্রমণ করল বিক্ষুব্ধ বেলুচিরা। বেলুচিদের নেতা গ্রাম্য যুবক 'সানঝের খেল'। যন্ত্রপাতি ফেলে ইঞ্জিনিয়াররা পালিয়ে গেল ছাউনি থেকে। আয়ুব সরকার অনেক আগেই বেলুচি নেতা আতাউল্লাহ খান মোঙ্গল, আবদুল বাকি, আবদুস সামাদ খাঁকে কারাগারে আটক করেছিল। ইঞ্জিনিয়ারদের তাঁবু আক্রান্ত হবার পরদিন পুলিশ শুরু করল অত্যাচার। নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে গেল, মেয়েদের চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে আছড়ে ফেলল, ঘর দরজা ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। কিন্তু সেইদিন রাত্রেই পালটা আক্রমণ শুরু হল গ্রামবাসীর। এবার আক্রমণের লক্ষ্য হল থানা পুলিশ ফাঁড়ি।

থানা পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে দখল করে নিল বন্দুক গোলা বারুদ। শুরু হয়ে গেল গ্রামে গ্রামে লড়াই। ক্ষিপ্ত আয়ুব বেলুচিদের ঠাণ্ডা করতে সৈন্য বাহিনী পাঠাতে শুরু করলেন।

১৯৬৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঈদের দিন 'কানরানট্' উপত্যকায় ঈদের জমায়েতে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে বুড়ো উৎসবের পোশাকে এসেছে। নামাজ শুরু হয়েছে। হঠাৎ আকাশে শোনা গেল বিমানের গর্জন। তারপর প্লেনগুলো ডাইভ দিয়ে নেমে এল সেখানে যেখানে নামাজ পড়ছিল ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। তারপরেই বুম্ বুম্ আওয়াজ, আর্ত চিৎকার, মৃতদেহ আর মৃতদেহ। কতজনের হাত, পা, মাথা উড়ে গেছে। রক্তের স্রোত বইছে। সেই উৎসব শেষ হল না; উৎসব শেষে যে আহারের আয়োজন করা হয়েছিল সে সব খাদ্য রক্তে ভেসে গেছে। সেই মৃতদেহ সামনে নিয়ে বেলুচিরা প্রতিজ্ঞা নিল—এর বদলা তারা নেবেই।

আবার বোমা বর্ষণ ২৩শে ফেব্রুয়ারী 'সারুনায়' একটা কাফেলার উপর। নিরীহ নিরস্ত্র কাফেলার মানুষগুলোকে বোমা ফেলে মারা হল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী একই ঘটনা ঘটল দারামূলাতে। কিন্তু আর নয়, বন্দুক হাতে রুখে দাঁড়ালো। পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে স্বেচ্ছাযোদ্ধাদের ঘাঁটি তৈরী হল। হালজিতে বোমা ফেলতে এসেছিল দুটো স্যাবার জেট। সানঝের খেল পাহাড়ের আড়াল থেকে গুলি করল সেই বিমান লক্ষ্য করে, আগুন ধরে গেল বিমানে। তারপর মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল বিমানখানি।

পরদিন আরও একখানা বিমান ও হেলিকপটার গুলিবিদ্ধ হয়ে ধ্বংস হল। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল আয়ুবশাহী। ১৫ লক্ষ বালুচকে শায়েস্তা করতে এগিয়ে এল পাকিস্তান সেনা বাহিনীর অষ্টম ডিভিসনের সৈন্যরা। তাদের হাতে আমেরিকান স্টেনগান. রাইফেল, এম এন গান, লাইট মেসিন গান। রেশন বন্ধ করে দেওয়া হল।

বেলুচিদের উপর আক্রমণ শুরু হল আকাশ পথে। আক্রমণ শুরু হল পথে পথে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এই অষ্টম ডিভিসনের পরিচালনা ভার নিয়ে যিনি বেলুচি নিধনে নেতৃত্ব করলেন তিনি হলেন মেজর জেনোরেল টিক্কা খান। আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত টিক্কা খাঁ লড়াই করে চলল। বেলুচ স্বাধীনতা সংগ্রামী—অগণিত বালক, যুবক, শত শহিদের রক্তে লাল হল বেলুচিস্থানের ভূমি। এই অত্যাচারের বর্ণনা রয়েছে কল্‌হন লিখিত "বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান" গ্রন্থে। জনৈক বেলুচি সাংবাদিকের বিবরণ তুলে ধরছি।

"ওয়াদ-এ বৃদ্ধ সানাউল্লাহ খান সৈন্যদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন, বলে চোখের সামনে তার ১৩ বছরের মেয়ে গুলনারের উপর ৫ জন সৈন্য একের পর এক পাশবিক অত্যাচার করেছে। একজন দাঁত দিয়ে কেটে দিয়েছে গালের মাংস, নখের আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত করেছে বুক। আর বুকে পিঠে বেয়নেট ধরে বৃদ্ধ সানাউল্লাহ খান মোঙ্গলকে তাই দেখতে বাধ্য করেছে তারা। বাপ হয়ে মেয়ের উপর সেই পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্য আর সে দেখতে পারে নি। মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেছে। জ্ঞান হয়ে দেখেছে তাঁরই পাশে পড়ে আছে তাঁর প্রাণপুত্তলি গুলনারের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহ।

আমাদের গ্রামের মোহাম্মদ খানের নববিবাহিতা তরুণী বধূ সুফিয়ার উপর সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বলাৎকার করেছে। স্তন থেকে মাংস খুবলে নিয়েছে হিংস্র কামাবেগে। এতেও বর্বর সৈনিকদের তৃপ্তি হয় নি, যাবার সময় পৈশাচিক হাসি হাসতে হাসতে বেয়নেট দিয়ে নারীদেহের গুহ্যস্থান খুঁচিয়ে দিয়ে গেছে—পাশবিক উল্লাসে রক্তাক্ত করেছে সেই দেহ। অভাগী মরে বেঁচেছে।

অজ্ঞাতেই আমার মুখ দিয়ে বেরুলো, হরিবল্। উঃ। এরকম নির্যাতন যে এ যুগের কোন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের হতে পারে ভাবতেই পারি না।

দেখলাম, রাগে উত্তেজনায় আহম্মদ জাই-এর চোখ থেকে আগুনের হাল্কা বেরুচ্ছে। দৃঢ় আঙ্গুলের চাপে গুঁড়িয়ে ফেলল হাতের সিগারেটটা। বলল, এ আর কি হরিব্‌ল্? আরও কত রোমহর্ষক পৈশাচিক নির্যাতন হয়েছে। বলে চুপ করল একটু, তাকালো বাইরে। মাথার উপর ট্রাইডেন্ট্‌ ১-ই ঘুরপাক খাচ্ছে ল্যানডিং-এর জন্য। বোধ হয় কনট্রোল টাওয়ারের অনুমতি পেয়ে গেছে। নামবে এক্ষুনি। আহম্মদ জাই সম্ভবত কিছু বলতে চেষ্টা করল। ট্রাইডেন্টের প্রচণ্ড গর্জনে ভালো শুনতে পেলাম না।

মুহূর্তে বিমানটি চলে গেল রানওয়ের উত্তর সীমার শেষ প্রান্তে। ক্রমশ নিচু হতে হতে ল্যান্ড করল সেটি। দ্রুত এগিয়ে আসছে টারমিনাল বিল্ডিং-এর দিকে। নিচে সিঁড়ি নিয়ে তৈরী হয়েছে বিমানঘাটির কর্মীরা। চেকিং-এর পর এটাই আবার পাড়ি দেবে করাচী। এ প্লেনেই আহম্মদ জাই যাবে। কী বিস্ময়কর উন্নতি। কতো দ্রুত কনভেয়ার আর ডাকোটার যুগ ছেড়ে পাকিস্তান ট্রাইডেনট্‌ আর বোয়িংএর যুগে পৌঁছে গেছে। অথচ পাখতুন, বেলুচ ও বাংলার অবস্থার কোন উন্নতিই হয় নি। বরং স্বাধীনতা লাভের পূর্ব অবস্থা থেকে আরও খারাপ হয়েছে, হচ্ছে। দিন দিন কোটি কোটি দেশবাসীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

আহম্মদ জাই আবার শুরু করল, গ্রাম ছেঁকে সব যুবকদের এনে হাজির করল সৈন্যরা। ছেলে, বুড়ো, মেয়েদের ভিড় থেকে গায়ে গতরে বাড়ন্ত কয়েকজন কিশোরকেও রাইফেলের কুঁদোর ঘা মেরে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করাল, বুড়োদেরও অধিকাংশ বাদ গেল না। ভেড়ার পালের মত গায়ে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে খোলা প্রান্তরে। মাথার উপর সূর্যটা আগুন ছড়াচ্ছে। আমাদের একজন পানি চাইতে গেল, পেল রাইফেলের কুঁদোর ঘা।

সানঝের খেলকে যখন নিয়ে এল, পরীবানুও উদ্‌ভ্রান্তের মতো

ছুটে আসছিল পিছু পিছু। একজন মিলিটারী অফিসার তার চুলের গোছা মুঠিতে ধরে টেনে হেঁচড়ে ফেলে দিয়ে এল বাড়ীর দরজায়। অফিসারটি ফিরে এলে জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে একমুখ থুথু ছিটিয়ে দিল সানঝের খেল তার গায়ে। পর মুহূর্তে রাইফেলের ঘায়ে মুখ থুবড়ে পড়ল সে মাটিতে। মিলিটারী অফিসারটি থুথু মুছে বুটসুদ্ধ পা দিয়ে সানঝের খেলের মাথাটা পিষে দিল ভয়ঙ্কর আক্রোশে। চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে সানঝের খেলকে দাঁড় করালো আমাদের সঙ্গে—ফাইলে।

তারপর নিয়ে চলল কুইলি ক্যাম্পে। দীর্ঘ ফাইল। হেঁটে চলেছি উত্তপ্ত পাহাড়ী পথে, সূর্যের প্রচণ্ড তাপে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ঝলসে গেছে। পানি পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই বলার উপায় নেই। 'কুইলি'তে হাজার হাজার ছেলে বুড়ো যুবককে গোরু বাছুরের মতো গাদাগাদি করে অভুক্ত রেখে দিল। বেছে বেছে শ খানেক যুবককে সেখান থেকে নিয়ে গেল মিলিটারী কনসেন-ট্রেশন ক্যাম্পে।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালাবার জন্য কতকগুলো ঘর তৈরী করা হয়েছিল। সেই অমানুষিক নির্যাতনের কথা শুনলে তোমরা শিউরে উঠবে, শিউরে উঠবে সারা বিশ্বের মানুষ। সে নৃশংস নির্যাতন আলজেরিয়ার ঘটনাকেও বুঝি হার মানায়।

আহম্মদ ভাই একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগল, শত্রু দেশের সঙ্গে আমাদের যোগসাজস রয়েছে—এই মিথ্যা স্টেটমেন্ট আদায়ের জন্য দিনের পর দিন আমাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে সেখানে। হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে পায়ের নীচে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায় চিৎকারটুকু পর্যন্ত করবার উপায় ছিল না। মুখে কাপড় ঠাসা।

একদিন একজন মিলিটারী অফিসার এসে আমার সামনেই সানঝের খেলের গালে একটা প্রচণ্ড চড় কষিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বল তোরা কোথা থেকে অস্ত্র পেয়েছিস ?' সানঝের খেলের জবাব : 'কোনখান থেকেই অস্ত্র পাই নি। নিরস্ত্র বলেই তোমরা আমাদের কাবু করতে পেরেছ। কতো আর অত্যাচার করবে আমাদের উপর। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন থামবে না, থামবে না।' সানঝের খেলের হাত পা বাঁধা ছিল, বসে ছিল সে। একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে অফিসারটি বুটের লাথিতে তাকে শুইয়ে দিল মাটিতে। তারপর বলল, 'দেখি শায়েস্তা হয় কিনা।' একজন সৈনিককে ডেকে নির্দেশ দিল, 'একে হট ওয়াটারে চাপাও।' আমার সামনে দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে অদূরের 'টর্চার চেম্বার'-এর দিকে নিয়ে গেল তাকে। আমাকে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে সানঝের খেলকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পা উপরে মাথা নিচে দিয়ে সানঝের খেলকে ঝুলানো হলো। একটু বাদেই একটা [illegible] বালতি করে গরমজল নিয়ে এল দুজন সৈনিক। বালতির ভিতর লাঠি ঢুকিয়ে দুজনে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে বালতিটা। ধোঁয়া উঠছে বালতি থেকে। সানঝের খেলের মাথার ঠিক নিচেই বালতিটা রাখল। ইঞ্চি চার পাঁচ নিচেই রয়েছে বালতিটা। সেই অফিসারটি ক্রুর স্বরে ফের বলল, 'এখনো বল্ তোরা কোন দেশ থেকে অস্ত্র পেয়েছিস্ ? আফগানিস্থান ? ভারত ?'

সানঝের খেল চুপ করে রইল। অফিসারটি ক্ষিপ্ত হয়ে এক মগ গরম জল ছিটিয়ে দিল তার মুখে। একটা বিকট আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠল সানঝের খেল অসহ্য যন্ত্রণায়। সারা মুখ তার ঝলসে গেছে। 'এখনো বলবি না !' অফিসারটির দাঁতে দাঁত চাপা ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল। উত্তরে সানঝের খেলের মুখ থেকে কোন মতে বেরুলো : 'কোথাও থেকে নয়।'

'তবে রে। মজা দেখাচ্ছি, গ্যাখ।' বলে অফিসারটি একটি সৈন্যকে কী নির্দেশ দিল। সৈন্যটি উপরে উঠে পায়ের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা ছেড়ে দিল অনেকখানি। প্রচণ্ড তপ্ত জলে সানঝের খেলের মাথাটা ডুবে গেল। চোখের মণি ছুটো গলে বেরিয়ে এসেছে। জ্ঞান হারালাম আমি।

পরদিন আর সানঝের খেলকে দেখতে পেলাম না। দেখতে পাব না জানি। তার মৃতদেহটি কোথাও টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছে হয়তো। সানঝের খেলের মতো এমনি কত দেশপ্রেমিক যুবক যে প্রাণ হারিয়েছে তারও সংখ্যা পরিসংখ্যা নেই। কতো সুফিয়া, গুলনার যে ইজ্জত হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সানঝের খেলের জায়গাটা আজ ফাঁকা। কালও ছিল সে। আজ নেই। পরীবানু কি জানে সে কথা! ওদের বিয়ে হল না। এ জীবনে ওরা আর ঘর বাঁধতে পারল না। এমনি কত পরীবানুর ঘর বাঁধার স্বপ্ন যে ভেঙেছে জালিম আয়ুব, তোমরা তার কতটুকুই বা জানো।

রোজ রোজ যে নির্যাতনের আরো কত নৃশংস উপায় বের করত! বেয়নেট দিয়ে উপড়ে নিয়েছে কারও চোখ, খুবলে নিয়েছে কারও শরীরের মাংস। দিনের পর দিন সেই সব হতভাগ্যদের আর্ত চীৎকারে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠত। রাতের নৈঃশব্দ সেই চিৎকারে খান খান হয়ে যেত। সানউল্লাহ খান মোঙ্গল নামে এক যুবকের অণ্ডকোষ ছুই রাইফেলের মাঝে চেপে পিষে দিল একদিন। পরে শুনেছি, গাঁয়ে ফিরে সে বেচারী আত্ম-হত্যা করেছে। এ ছাড়া তার যে আর কোন উপায় ছিল না। সানঝের খেল-পরীবানুর মতো ওরও বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ভাবী পত্নী রওশনের কাছে সে কোন্ লজ্জায় মুখ দেখাবে। কী বলবে তাকে! তাই আত্মহত্যা করে সেই ছুঃসহ লজ্জা আর গ্লানির হাত থেকে মুক্তি নিয়েছে সে।

কিন্তু এই বর্বরদের কাহিনী শুধুই কি মাত্র বেলুচিস্থানের দেওয়ালে পাহাড়ের গায়ে রক্ততে রক্ততে লেখা আছে। না, এর চেয়ে অনেক মর্মান্তিক করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের শহরে গ্রামে, নগরে। অগণিত মানুষের উপর বর্বর অত্যাচারের কাহিনী। যে কাহিনী ম্লান করে দেয় বিশ্বের যে কোন নৃশংস অত্যাচারের কাহিনীকে। এই অত্যাচার শুরু হয়েছিল পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই।

১৯৫০ সালে ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলে পুলিশের নির্মম গুলি বর্ষণে যাঁদের বুক বুলেটে বুলেটে ঝাঝরা হয়ে গেল তাঁরা ছিলেন কৃষক নেতা কম্পরাঙ সিং, তরুণ ছাত্র আনোয়ার হোসেন, শ্রমিক নেতা দেলওয়ার হোসেন, প্রখ্যাত দেশভক্ত সুধীন ধর, সুখেন ভট্টাচার্য, হানিফ শেখ ও বিজন সেন। কিন্তু পরীবানু—সে কি শুধু বেলুচি-স্থানে? বাংলাদেশের অনেক মা বোন পরীবানুর চেয়ে মর্মান্তিক নির্যাতন অত্যাচারের স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৯৫০ সালের শুরুতেই ময়মনসিং জেলার হাজং এলাকায় "টঙ্ক" প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল কৃষকরা। জনপ্রিয় জননেতা মণি সিং-এর নেতৃত্বে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ল হাজং-এর কৃষকরা। মণি সিং-এর পাশে এসে দাঁড়ালেন সিলেটের খোকা রায়, অনিল মুখার্জি, চিত্ত দাশগুপ্ত, খুলনার বিষ্ণু চ্যাটার্জি, বরিশালের অমিয় দাশগুপ্ত, রংপুরের মণিবিষ্ণু সেন, দিনাজপুরের হাজি মহম্মদ দানেশ। মুসলিম লীগ সরকার নিষ্ঠুর নির্মম অত্যাচারে দমন করল এই কৃষক বিদ্রোহকে।

একই বিদ্রোহ দেখা দিল রাজশাহী জেলায়। সাঁওতালদের নিয়ে কৃষক সংগঠন করেছিলেন শ্রীমতী ইলা মিত্র। ১৯৫০ সালের ৭ই

জানুয়ারী রাজশাহী জেলার রাহানপুরের কাছে পুলিশ গ্রেপ্তার করল শ্রীমতী মিত্রকে। সাঁওতালী রমণীর পোশাকে আত্মগোপন করেছিলেন শ্রীমতী মিত্র। পুলিশ শ্রীমতী মিত্রকে গ্রেপ্তার করে চাপাই নবাবগঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। তারপর সেই থানার অভ্যন্তরে শ্রীমতী মিত্রর উপর কি ভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল তার বর্ণনা আছে অমিতা গুপ্তের 'পাকিস্তান' নামক গ্রন্থে। গ্রন্থের লেখককে ডি আই জি বলেছিলেন নাচোলের নিকট বত্তিচাপাই নবাবগঞ্জ থানায় গিয়ে এক সন্ধ্যায় থানার হাজত কক্ষে রক্তাপ্লুত অবস্থায় নগ্ন দেহে শ্রীমতী ইলা মিত্রের যে হাল তিনি দেখেছিলেন তাতে তিনি শিউরে উঠেছিলেন। শোনিত স্রোতের মধ্যে শায়িত শ্রীমতী ইলা মিত্রকে দেখে তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল হয় তিনি মৃত না হয় মৃত্যু আসন্ন। ডি আই জি সাহেব তাঁকে হাসপাতালে পাঠাবার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। নাচোলের গ্রামে যখন জীপ নিয়ে ঢুকলেন তখন নাকি গাছের নীচে স্তূপীকৃত যন্ত্রণা-কাতর গুরুতর আহত সাঁওতালদের রক্তাক্ত দেহগুলি দেখে আতকে উঠেছিলেন তিনি।

এরপর শ্রীমতী ইলা মিত্র নিজের বর্ণনা নিজে দিয়েছেন কোর্টে। সেই বর্ণনা একদা লিফ্‌লেট আকারে ছাপিয়ে বিলি করা হয়েছিল পূর্ববঙ্গে। কারণ শ্রীমতী মিত্রের সেই বিবৃতি কোন সংবাদপত্র ছাপেনি। ছাপতে পারেনি।

শ্রীমতী মিত্র বলেন, "কেসটির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। গত ৭. ১. ৫০ তারিখে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়, পরদিন নাচোলে নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়ার পথে পুলিশ আমাকে মার-ধোর করে, তারপর আমাকে একটা সেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সব কিছু স্বীকার না করলে আমাকে উলঙ্গ করে দেওয়া হবে এই বলে এস আই আমাকে হুমকি দেখায়। আমার

যেহেতু বলার মত কিছু ছিল না কাজেই তারা আমার সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভাবে সেলের মধ্যে আমাকে বন্দী রাখে। আমাকে কোন খাবার দাবার দেওয়া হয়নি, একবিন্দু জল পর্যন্ত না। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এস আই-এর উপস্থিতিতে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার কাপড় চোপড় আমাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং রাত্রি ১২টার সময় সেল থেকে আমাকে বের করে সম্ভবত এস আই-এর কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। যে কামরাটিতে আমায় নিয়ে যাওয়া হল সেখানে • স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তারা নানারকম অমানুষিক পদ্ধতিতে চেষ্টা চালাল। দুটো লাঠির মধ্যে আমার পা দুটো ঢুকিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। সে সময় চারিধারে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা বলছিল যে আমাকে পাকিস্তানী ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। এই নির্যাতন চলার সময়ে তারা আমার মুখ রুমাল দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। জোর করে আমায় কিছু বলাতে না পেরে তারা আমার চুল উপড়ে ফেলছিল। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে নিয়ে গেল। কারণ সেই নির্যাতনের পর আমার পক্ষে আর হাঁটা সম্ভব ছিল না। সেলের মধ্যে আবার এস আই ৪টে গরম গরম সেদ্ধ ডিম আনার হুকুম দিল এবং বলল এবার সে কথা বলবে। তারপর ৪-৫ জন সিপাই আমাকে জোরপূর্বক ঘরে চিৎ করে শুইয়ে রাখল এবং ১ জন আমার যৌন অঙ্গের মধ্যে ১টা গরম সিদ্ধ ডিম ঢুকিয়ে দিল। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন আগুনে পুড়ে যাচ্ছি। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

৯. ১. ৫০ তারিখে সকালে যখন আমার জ্ঞান হল তখন উপরোক্ত এস আই এবং কয়েকজন সিপাই আমার সেলে এসে তাদের বুট করে আমার পেটে লাথি মারতে থাকে। এরপর আমার ডান পায়ের গোড়ালীতে একটা পেরেক ফুটিয়ে দেওয়া হল। সে সময় আধা অচেতন অবস্থায় পড়ে থেকে আমি এস আই-কে বিড়বিড় করে বলতে

শুনলাম, আমরা আবার রাত্রিতে আসছি এবং তুমি যদি স্বীকার না কর তাহলে সিপাইরা একে একে তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাত্রিতে এস আই এবং তার সিপাইরা ফিরে এল এবং তারা আবার সেই হুমকী দিল যেহেতু তখনও আমি কিছু বলতে রাজী হলাম না, তিন চার জন আমাকে ধরে রাখল এবং ১জন সিপাই সত্যি আমাকে ধর্ষণ করতে শুরু করল। এর অল্প কিছুক্ষণ পরে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

পরদিন ১০. ১. ৫০ তারিখে যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন আমি দেখলাম যে আমার দেহ থেকে দারুণভাবে রক্ত ঝরছে আর আমার কাপড় চোপড় রক্তে সম্পূর্ণ ভাবে ভিজে গেছে। সেই অবস্থাতেই আমাকে নাচোল থেকে নবাবগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো। নবাবগঞ্জ জেলে গেটের সিপাইরা জোরে ঘুসি মেরে আমাকে অভ্যার্থনা জানালো। সে সময় আমি একেবারে শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলাম। কাজেই কোর্ট ইনসপেক্টার এবং কয়েক জন সিপাই আমাকে একটি সেলের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেলো। তখনও আমার রক্তপাত হচ্ছিল এবং খুব বেশী জ্বর ছিলো। সম্ভবত নবাবগঞ্জ সরকারী হাসপাতালের একজন ডাক্তার সেই সময় আমার জ্বর দেখেছিলেন ১০৫ ডিগ্রি। যখন তিনি আমার আছে আমার দারুণ রক্তপাতের খবর শুনলেন তখন তিনি আমাদের আশ্বাস দিলেন যে একজন মহিলা নার্সের সাহায্যে আমার চিকিৎসা করা হবে। আমাকে কিছু ওষুধ এবং কয়েক টুকরো কম্বলও দেওয়া হলো।

১১. ১. ৫০ তারিখে সরকারী হাসপাতালের নার্স আমাকে পরীক্ষা করলেন। তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেটা আমি জানি না। তিনি আসার পর আমার পরণে যে রক্তমাখা কাপড় ছিল সেটা পরিবর্তন করে একটা পরিষ্কার কাপড় দেওয়া হল। এই পুরো সময়টা আমি নবাবগঞ্জের জেলের একটি সেলে একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিলাম। আমার

শরীরে খুব বেশী জ্বর ছিল, তখনো আমার দারুণ রক্তপাত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম।

১৬. ১. ৫০ তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আমার সেলে একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসা হল এবং আমাকে বলা হল যে পরীক্ষার জন্য আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। খুব বেশী শরীর খারাপ থাকার জন্যে আমার পক্ষে নড়াচড়া সম্ভব নয়—একথা বলায় লাঠি দিয়ে আমাকে একটা বাড়ি মারা হল এবং স্ট্রেচারে উঠতে আমি বাধ্য হলাম। এরপর আমাকে অন্য এক বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল। আমি সেখানে কিছুই বলিনি কিন্তু সেপাইরা জোর করে একটা সাদা কাগজে সই আদায় করল। তখন আমি আধা অচেতন অবস্থায় খুব বেশী জ্বরের মধ্যে ছিলাম। যেহেতু আমার অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছিল সেজন্য পরদিন আমাকে নবাবগঞ্জের সরকারী হাসপাতালে পাঠানো হল। এর পর যখন আমার শরীরের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হল তখন আমাকে ২১. ১. ৫০ তারিখে নবাবগঞ্জ থেকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে এসে সেখানে জেলের হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কোন অবস্থাতেই আমি পুলিশকে কিছু বলিনি এবং উপরে যা বলেছি তার বেশী আমার আর বলার কিছু নেই।

(এই ইলা মিত্র। এর পরেই কবি গুলাম কুদ্দুস তাঁর বিখ্যাত কবিতায় লিখলেন—"ইলা মিত্র, ইলা মিত্র ফুচিকের বোন, তুমি স্টালিন নন্দিনী।" বেলুচিস্থানের পরীবানু আর রাজশাহীর ইলা মিত্র এক হয়ে গেলেন পাকিস্তানী শাসনের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারে। রাজনীতি এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে পাকিস্তান কোনদিনই ঐক্য-বদ্ধ নয়, কিন্তু ঐক্য ছিল এবং আছে একটি ক্ষেত্রে—সে হল নির্মম ও নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্যে।)

বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন অধীর আগ্রহে নিজেদের অধিকার কায়েম করার প্রত্যাশায়, জাতির স্মরণীয় দিন ৩রা মার্চ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ভাবছিলেন, সেই সময় অর্থাৎ ১লা মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খানের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা সারা বাংলাদেশে এক অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রেসিডেণ্টের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ ধিক্কারে ফেটে পড়ে। মিছিলে মিছিলে, স্লোগানে স্লোগানে বাংলার অলি-গলি ভরে যায়। শুরু হয় দমননীতি সেই দুর্বার আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য। শুরু হয় গুলি, বেয়নেট চালনা। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুমিল্লা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন স্থানে সরকার মানুষের বজ্র কঠিন আওয়াজকে স্তব্ধ করার জন্য হত্যা করে হাজার হাজার শান্তিকামী ছাত্র-জনতা মজুর কৃষককে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অত্যাচার

(চট্টগ্রামের সিটি কলেজ সহ ঢাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেনাবাহিনী ছাত্র-ছাত্রীদের নির্মম ভাবে মারধর শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে সান্ধ্য আইন জারী করে। জনসাধারণ সান্ধ্য আইন ভেঙ্গে রাস্তায় নেমে এলে শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে খণ্ডযুদ্ধ। সরকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জোর করে ছাত্রাবাস ত্যাগ করতে বাধ্য করে। রাজশাহীতে ৩রা মার্চেই সান্ধ্য আইন জারী করা হয়েছিল, কিন্তু রেডিও পাকিস্তান তা প্রচার করে ৫ই মার্চ।) ঐ দিন রাজশাহীর সঙ্গে যোগাযোগে অসুবিধার জন্য রাজশাহীর আসল ঘটনা বেশ কিছুদিন চাপা ছিল। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পরে জানা গিয়েছে, সৈন্যরা ঐ দিনই রাজশাহীর বেতার কেন্দ্র এবং টেলিভিশন স্টেশন দখল করে। সারা রাজশাহীতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। রাত্রে সৈন্যরা জোর করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাঙ্গণ কলঙ্কিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জোহা হলের ছাত্রদের ১২ ঘণ্টার ভিতর হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়ে ওই হলেই সৈন্যরা ক্যাম্প করে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ওই সৈন্যবাহিনীর অফিসারকে এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে উপাচার্য অপসারিত হন। উপাচার্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মহিলা আবাসিক হল মন্নুজান হলের ব্যাপারে অনুরোধ করেন—সৈন্যরা যেন ওদিকে না যায়, কিন্তু সেই অফিসার তাও প্রত্যাখ্যান করলে তিনি মেয়েদের সম্ভাব্য নিরাপত্তার জন্য নিজেদেরকেই ব্যবস্থা নিতে বলেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তখন বেশ কয়েক মাইল দূরের রেল স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে এক-একদিকে চলে যায়। বিভিন্ন স্টেশনের লোকজন ঐ সব অনাহারী ছাত্র-ছাত্রীদের স্টেশনে স্টেশনে খাবার দেয়। মেয়েরা মালগাড়ীতে গাদাগাদি করে বাড়ী ফিরে যায়। রাজশাহীতে ওই সময় এক প্রতিবাদ সভায় বর্বর সৈন্যরা অহেতুক গুলিবর্ষণ করে ২৮ জনকে হত্যা করে!

ফৌজি বাহিনীর তাণ্ডব

ঠিক সেই সময়ে রংপুরে ফৌজি বাহিনীর অহেতুক গুলিবর্ষণে নিহত হয় বেশ কিছু ছাত্র। জানা গিয়েছে ১৪৪ ধারা থাকায় আওয়ামী লীগের একদল স্বেচ্ছাসেবক ২-৩ জন করে যখন রাস্তা পার হচ্ছিলেন তখন হঠাৎ সশস্ত্র বাহিনীর হামলায় ১জন স্বেচ্ছাসেবক নিহত হলে জঙ্গী বাহিনীর সাথে জনগণের দারুণ লড়াই শুরু হয়। সেই লড়াইয়ে নিহতের সঠিক সংখ্যা কেউই দিতে পারেন নি।

অনেকের মতে শতাধিক নিরস্ত্র ছাত্র জনতা রংপুরে নিহত হয়েছেন।

ঢাকার রাজপথ মজুর, শ্রমিক, ছাত্র, জনতার রক্তে রাঙা হয়েছে। বহু দোকান-পাট লুঠ করেছে পাক সৈন্যরা। ঘর থেকে বের করে রাস্তায় এনে যাকে তাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। প্রতিবাদে সারা বাংলায় হরতাল পালিত হয়েছে। রাস্তায় সৈন্যদের চলাচল বন্ধ করার জন্য জনতা বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড সৃষ্টি করেছে।

মুজিবুরের আহ্বান

৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রমনা রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী আন্দোলনের আহ্বান জানালে সারা দেশব্যাপী আন্দোলনকে সার্থক করে তোলবার জন্য জনগণ সচেষ্ট হন। (গণশক্তি—৬ই এপ্রিল)

উত্তাল উদ্দাম জলধিতরঙ্গ

৭ই মার্চ একটি অবিস্মরণীয় দিন। অনন্যসাধারণ ওই দিনের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান। অবিস্মরণীয় এই অনন্য দিনে রেসকোর্সে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলনের মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর নির্দেশকামী স্বাধীকার সৈনিকদের সংগ্রামী সম্মেলন।

"সংগ্রামী বাংলা দুর্জয় দুর্বিনীত। কাহারও অন্যায় প্রভুত্ব মানিয়া নেওয়ার জন্য, কাহারও কলোনী হইয়া, কাহারও বাজার হইয়া থাকার জন্য বাংলার মানুষের জন্ম হয় নাই।" বঙ্গবন্ধুর এই তেজোদৃপ্ত ঘোষণারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বাংলার অপরাজেয় গণশক্তি গতকাল (রবিবার) রেসকোর্স ময়দানে সার্বিক মুক্তি আদায়ের

ইস্পাত কঠিন শপথের দীপ্তিতে প্রিয় নেতাকে যেন দুর্লঙ্ঘ্য নির্দেশ প্রদান করে, 'বঙ্গবন্ধু আগাইয়া চলো, আমরা আছি পিছনে।' আর ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে আবহমান বাংলার বাসন্তী সূর্য আর উদার আকাশকে সাক্ষী রাখিয়া গতকাল নির্ভীক নেতা এবং বীর জনতার কণ্ঠস্বর একই সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠে যুগ যুগান্তর, দেশ দেশান্তরের সকল মুক্তিপিপাসু সভ্য জাতির হৃদয়-বাসনার অমোঘ মন্ত্র 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' ধ্বনিত হইয়া উঠে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে দিগন্ত কাঁপাইয়া 'জয় বাংলা'। ৭ই মার্চ তাই বাংলার সার্বিক স্বাধীকার আন্দোলনের দুর্গম, দুস্তর পথের প্রান্তে একটি অতুলনীয় স্মৃতি ফলক :

গতকাল (রবিবার) রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীকারকামী বাঙালীর ঢল নামিয়াছিল। আকারের বিশালতা, অভিনবত্বের অনন্য মহিমা, আর সংগ্রামী চেতনার অতুল বৈভবে এই জনসমুদ্র ছিল নজির বিহীন। আর সেই বিশাল জনসমুদ্রের আর একটি লক্ষণীয় দিক ছিল হাতে বাঁশের লাঠি—কণ্ঠে প্রলয় রাত্রির বিদ্রোহী বঙ্গোপসাগরের সঘন গর্জন। শতাব্দীর ইতিহাসের বক্ষে বিলীন স্বাধীনতা সংগ্রামী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা দেখি নাই, কিন্তু গতকাল রেসকোর্সে বাংলার স্বাধীকারকামী জনতার হাতে দেখিয়াছি বাঁশের লাঠি আর সেই লাঠির সমবেত গর্জন যেন কামানের গর্জনের জবাব হইয়া গতকাল ঢাকার আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইয়াছে বহুক্ষণ। একের লাঠি অন্যের লাঠিতে ঠোকাঠুকি করিয়া আর সেই সঙ্গে বজ্রের নিকট হইতে ধ্বনি কাড়িয়া স্লোগান দিয়া বাংলার মানুষ যেন একে অপরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে চাহিয়াছে—"বন্ধু তোমরা ছাড়ো উদ্বেগ/সুতীক্ষ্ণ কারো চিত্ত/বাংলার মাটি দুর্জয় খাঁটি/চিনে যাক দুর্বৃত্ত।"

গতকাল রেসকোর্সে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটিয়াছিল

সার্বিক স্বাধীকার আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর পথনির্দেশ লাভের জন্য। আসিয়াছিল পুরুষ নারী, অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কবি, কিশোর, তরুণ যুবক, পরিণত শ্রমিক জনতা। তাদের চোখে মুখে ছিল প্রতিরোধের অগ্নিশিখা, বুকে বুকে মুক্তি পিপাসার জ্বলন্ত চিতা, কিন্তু তবু তারা শান্ত ছিল, সংযত ছিল—ছিল বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা। নিরীহ, অথচ সেই জনতাই আবার সংগ্রামী শপথ ঘোষণায় উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছে মহা-প্রলয়ের জলধির মত। তাইতো আশ্চর্য এই দেশ, আশ্চর্য বাঙালীর মন ও মানস। বেলা দুটোয় শেখ মুজিবুরের সভা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তিনি মঞ্চে আসেন ৩টা ১৫ মিনিটে, কিন্তু তবু জনতার মধ্যে কোন অধৈর্য অসহিষ্ণুতার লক্ষণ দেখা যায় নাই। নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে জনতার স্রোত আসিয়া উপচাইয়া পড়িতে থাকে রেসকোর্সের উপলখণ্ডে। আর তা জনস্রোতে সয়লাব হইয়া যায় অচিরেই। বয়স, পেশা, সামাজিক মর্যাদা, পোশাক পরিচ্ছদে যতই অমিল থাকুক, সে জনতার মধ্যে আশ্চর্য মিল হাতের বাঁশের লাঠি, কণ্ঠের স্লোগান আর অন্তরের অন্তরতম প্রকোষ্ঠে স্বাধীকারের লক্ষ্যে। বেলা ঠিক সোয়া তিনটায় সাদা পাজামা-পাঞ্জাবির উপর হাতকাটা কোট (মুজিবকোট) পরিহিত বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলে বাংলার বীর জনতা বজ্র নির্ঘোষে করতালি ও স্লোগানের মধ্যে তাঁকে অভিনন্দন জানায়। নেতা মৃদু হস্ত আন্দোলনের দ্বারা জনতাকে অভিনন্দন জানান। তাঁর চোখেমুখে সুযোগ্য সিপাই-সালারের দুর্লভ তেজ দৃপ্ত আর সংগ্রামী শপথের দীপ্তি খেলা করিতে থাকে। রেসকোর্স বাংলার মানুষকে প্রাণের টানে ডাকে। সে ডাকে সাড়া দিয়া ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারীতে রেসকোর্সে বাংলার মানুষ শুনিয়াছে এক ইউনিট আর প্যারিটির মৃত্যুঘণ্টা; ১৯৭০ সালের ৭ই জুন

শুনিয়াছে ৬ দফার জয়নাদ; ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী শুনিয়াছে ৬ দফা, ১১ দফা বাস্তবায়নের দ্ব্যর্থহীন শপথ; আর গতকালও রেসকোর্স ময়দান বাংলার মানুষকে নিরাশ করে নাই। গতকাল রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়াইয়া শেখ মুজিবুর বাংলার মানুষকে ডাকিয়া বলিয়াছেন: পরিষদে যাওয়ার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে পারি, যদি—(ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হয়; (খ) সমস্ত সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া লওয়া হয়; (গ) নিরস্ত্র গণহত্যার তদন্ত করা হয়; (ঘ) নির্বাচিত গণ •প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়।

বাংলার স্বাধীকার আন্দোলনের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রবিবার ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লক্ষ লক্ষ মুক্তি সেনানীর বজ্র নির্ঘোষ সংগ্রামী ধ্বনির তূর্যনাদের মধ্যে জলদ গম্ভীর স্বরে উপরোক্ত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব বলেন, আপনি ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকিয়াছেন. আগে আমার এই সব দাবি মানিতে হইবে তারপর বিবেচনা করিব অধিবেশনে যোগদান করিব কিনা। এই দাবি পূরণ ছাড়া পরিষদে যাওয়ার অধিকার বাংলার জনগণ আমাকে দেয় নাই। বাংলার সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণাকল্পে ইতিপূর্বেই শেখ সাহেব ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সেই অনুযায়ী স্বাধীকারকামী লক্ষ লক্ষ লোক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ লাভের জন্য এই সমাবেশে যোগদান করেন। শ্লোগান মুখর সেই স্বাধীকারকামী জনসমুদ্র লক্ষ্য করিয়া শেখ মুজিবুর শপথদৃপ্ত কণ্ঠে বলেন—"ভাইয়েরা আমার, প্রস্তুত হও। এবারের সংগ্রাম বাঙালীর মুক্তি সংগ্রাম। রক্ত দিতে আমি প্রস্তুত। যদি আমি ও আমার সহকর্মীরা ডাক দিতে না পারে মুক্তি সংগ্রামের পতাকা হাতে তোমরাই আগাইয়া যাও। এবারের

সংগ্রামে ঘরে ঘরে সংগ্রামের দুর্গ, সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়িয়া তোল, মুক্তি আসিবেই।") জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের তারিখ সম্পর্কিত প্রেসিডেন্টের ঘোষণার উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি এ ব্যাপারে সৃষ্ট সংগ্রামের জন্য জনাব ভুট্টো ও প্রেসিডেন্টকেই দায়ী করেন। (তিনি অভিযোগ করেন, "গোলমালের সৃষ্টি করিলেন ভুট্টো, গুলি চলিল বাংলার নিরীহ নিরস্ত্র জনতার উপর। যখনি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অর্থাৎ বাংলার মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছে, যখনি তাহাদের হাতে নিজেদের সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তখনি তাহাদের উপর শক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়া হইয়াছে। কিন্তু কেন? কতকাল এই নির্যাতন চলিবে? ভাইয়েরা আমার, দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হইয়াছি। আপনারা সবই জানেন, সবই বোঝেন। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, মানুষের মত বাঁচিতে চায়, আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার চায়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে বাংলার মাটি সয়লাব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেন? কি অন্যায় আমরা করিয়াছিলাম? কত আশা লইয়া এদেশের মানুষ আমাকে, আমার দলকে ভোট দিয়াছে। তাহারা আশা করিয়াছিল জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিবে, আমরা শাসনতন্ত্র তৈয়ারী করিব, দেশকে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিব, মানুষ রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক স্বাধীকার পাইবে। সে আশা পূরণের জন্য আমার ত্রুটি ছিল না। ত্রুটি নাই। কিন্তু আবার ষড়যন্ত্র। গত তেইশ বছরের ইতিহাস ষড়যন্ত্রের ইতিহাস; বাংলার মানুষের বঞ্চনা, আত্মদান, রক্তদান, আর মুমুর্ষুর আর্তনাদের ইতিহাস। বাঙালীর রক্তাক্ত আন্দোলন, '৫৪ সালের নির্বাচন বিজয় নস্যাতের ষড়যন্ত্র, '৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি, '৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, '৬৯ সালের গণ আন্দোলন এবং এবার স্বাধীকারের আন্দোলন।

আয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া খান শাসনতন্ত্র গণতন্ত্র প্রবর্তনের ওয়াদা করিয়াছিলেন, কিন্তু তারপর কি হইয়াছে ? মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে আমি ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার সুপারিশ করি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর কথামত ৩রা মার্চ পরিষদের অধিবেশন ডাকিলেন। আমি বলিলাম, ঠিক আছে, জাতীয় পরিষদে আলাপ আলোচনা হইবে। আমি এমনও বলিয়াছি যে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ১জন সদস্যও যদি যুক্তিসম্মত প্রস্তাব লইয়া আসেন উহা গ্রহণ করা হইবে, তবু তাঁহাদের মন ভরে নাই। ভুট্টো ঢাকায় আলোচনার শেষে বলিয়া গিয়াছিল, দরজা বন্ধ হয় নাই, আরও আলোচনা হইবে। তারপর আমি মৌলানা নূরানী, মৌলানা মুফতী মামুদ প্রমুখের সহিত আলোচনা করিয়াছি। তাদের আমি বলিয়া দিয়াছি বাংলার জনগণ ৬ দফা ও ১১ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছে, উহা পরিবর্তনের ক্ষমতা আমার নাই। এদিকে ভুট্টো বাংলার মানুষকে চরম ভাবে অপমান করিয়া জাতীয় পরিষদকে কসাইখানা বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন। বাংলায় আসিলে 'ডবল জিম্মি' হওয়ার মত মন্তব্য করিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসিলে পেশোয়ার হইতে করাচী পর্যন্ত হরতালের ভয় দেখাইলেন। শুধু তাই নয় তিনি হুমকি দিলেন কোন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য ঢাকায় গেলে তাহার মুণ্ডপাত করা হইবে। ৩৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আসিলেন, কিন্তু তবু ভুট্টোর জেদের দাম দিতে গিয়া অধিবেশন মুলতুবী করা হইল। দোষী ভুট্টো, অথচ দোষারোপ করা হইল আমার উপর, বাংলার মানুষের উপর। আমি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ডাক দিলাম। সংগ্রাম শুরু হইল। শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে কি পাইলাম ? পাইলাম গুলি, নির্যাতন, মৃত্যুর পরোয়ানা। বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষ অনাহারে থাকিয়া দেশরক্ষার অস্ত্র কেনার জন্য যে পয়সা দিয়াছে সেই পয়সায় কেনা

অস্ত্র প্রয়োগ করা হইতেছে সেই বাংলার মানুষেরই বিরুদ্ধে তাদের নির্বিচারে পাখি শিকারের মত হত্যা করার জন্য। সামরিক বাহিনীর উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব দেশরক্ষা ও শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা। বাংলার মানুষের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাইবার কোন অধিকার আপনাদের নাই। আপনারা ব্যারাকে থাকুন, প্রয়োজনবোধে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন, বাংলার মানুষের বুকে আর ১টিও গুলি চালাইবেন না।

প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে আমি তাঁকে ঢাকায় আসিতে বলি। আমি বলিয়াছিলাম, আপনি প্রেসিডেণ্ট, আপনি আসুন,—আপনি দেখুন কিভাবে মানুষের রক্ত লইয়া হোলি খেলা চলিতেছে। দেখিয়া বিচার করুন।"

গোল টেবিল বৈঠকের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিলেন, "কিসের গোলটেবিল, কার সঙ্গে বসিব? যারা বাংলার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে গোলটেবিলে বসিব? কিন্তু কেন?"

শেখ মুজিব বলেন, "আমি প্রেসিডেণ্টকে বলিয়া দিয়াছি শহিদের রক্তের দাগ রাজপথ হইতে এখনও শুকায় নাই। সেই রক্তের উপর দিয়া হাঁটিয়া আমি গোলটেবিলে যাইতে পারি না। বাংলার মুক্তি আন্দোলনে যারা জীবন দিয়াছে, যারা রক্ত দিয়া আমাকে মুক্ত করিয়াছে, তাদের সঙ্গে আমি বেইমানী করিতে পারি না, বেইমানী করিব না, রক্ত দিয়াই আমি রক্তের ঋণ শোধ করিব। যদি আঘাত আসে, যদি আমি নির্দেশ নাও দিতে পারি, যদি আমার সহকর্মীদের পথ-নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নাও হয়, বাংলার মানুষ তোমরা নিজেরাই নিজের কর্মপন্থা ঠিক করিয়া লইও। হাতের কাছে যা পাও তাই লইয়া শত্রুর মোকাবিলা করিও। রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া দিও, চাকা বন্ধ করিয়া দিও। বাংলার ঘরে ঘরে দুর্গ গড়িয়া মুক্তি সৈনিক হইয়া সর্বশক্তি লইয়া দুষমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াও।"

সভা শুরু হওয়ার আগে মঞ্চ হইতে সংগ্রামী শ্লোগান দান করেন

ছাত্র লীগ নেতা নুরে-আলম্-সিদ্দিকী, শেখ শহীদুল ইসলাম, আবদুর রব, আবদুল কুদ্দুস। শেখসাহেব মঞ্চ আসিয়া পৌছিলে তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তোফায়েল আমেদ মঞ্চ হইতে স্লোগান পরিচালনা করেন। সভার শুরুতে কোরান পাঠ করেন মৌলানা আবদুল রসিদ তর্কবাগীশ।

রক্তের ঋণ শোধ করবো

"ভাইয়েরা আমার উপর বিশ্বাস আছে?" লাখো লাখো জনতা হাত উঠিয়ে হ্যা বলে। "আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, মানুষের অধিকার চাই। প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারে নি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে আমাকে নিতে পারে নি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করব। মনে আছে? আজো আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।"

রবিবার রমনা রেসকোর্স ময়দানের উদ্বেলিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে জননায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ দানের আগে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতা ও বর্তমানে নির্বাচিত এম এল এ জনাব তোফায়েল আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সভাপতি নুরে-আলম-সিদ্দিকি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি আ. শ. ম, আবদুর রব,—সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন মঞ্চ থেকে স্লোগানের নেতৃত্ব দান করেন। সভা শুরুর বহু পূর্ব থেকেই লাঠি, বল্লম, তলোয়ার, তীর-ধনুক, লোহার রড নিয়ে ছোট বড় অসংখ্য শোভাযাত্রা রমনার জনসমুদ্রে এসে মেশে। বহু সংখ্যক

মহিলাও লাঠি হাতে মিছিল করে ফাল্গুনের মধ্যাহ্নের খরতাপ উপেক্ষা করে সভায় যোগদান করেন। বোরখা পরা ও সন্তান কোলে কয়েকজন মহিলাও সভায় আসেন। কিন্তু তাঁদের হাতেও বাঁশের লাঠি ছিল। (উদ্বেলিত জনসমুদ্রে বক্তৃতা শুরুর আগে সমগ্র এলাকা কাঁপিয়ে স্লোগান তোলেন—২৫ তারিখের পরিষদে জাতির পিতা যাবে না; ষড়যন্ত্রের পরিষদে শেখ মুজিব যাবে না; ইয়াহিয়া ঘোষণা—মানি না মানি না; পরিষদ না রাজপথ—রাজপথ-রাজপথ; গ্রামে গ্রামে দুর্গ গড়ো, বাংলাদেশ মুক্ত করো; রক্তরাঙা পরিষদে—বাঙালী যাবে না। সংহতির পরিষদে—বাংলাদেশ যাবে না; আপোস না স্বাধীনতা—স্বাধীনতা; নতুন মাটি নতুন দেশ—বাংলাদেশ, বাংলাদেশ। মা-বোনেরা ধ্বনি তোলেন:—প্রীতিলতার পথ ধরো —সালোয়ার কামিজ ছুঁড়ে ফেলো; আমাদের সন্তানের রক্ত—বৃথা যেতে দেব না। সভায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত শত শত পতাকা উত্তোলন করা হয়। মৌলানা আবদুর রসিদ তর্কবাগীশ সভায় কোরান পাঠ করেন এবং শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন। রবিবার জনসভায় প্রায় ৪০ জন বিদেশী সাংবাদিকও ছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁরা সংগ্রামী বাংলার খবর সংগ্রহে এসেছিলেন।)

[পূর্বদেশ—৮ই এপ্রিল]

আজ থেকে আমার নির্দেশ

(১) বাংলার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ রাখুন।

(২) সমগ্র বাংলাদেশের সেক্রেটারিয়েট, সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কোর্টে হরতাল করুন। (কোথাও শিথিল করা হইলে জানানো হইবে।)

(৩) রিকসা, বেবী, বাস-ট্যাক্সী প্রভৃতি এবং রেলগাড়ী ও বন্দরসমূহ চালু রাখুন; কিন্তু জনগণের উপর জুলুম চালাইবার

উদ্দেশ্যে সশস্ত্রবাহিনীর চলাচলের কাজে রেলওয়ে ও বন্দর কর্মচারীগণ সহযোগিতা করিবেন না এবং সেক্ষেত্রে তাহাদের চলাচলের ব্যাপারে কোন কিছু ঘটিলে আমি দায়ী হইব না।

(৪) বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসেবীরা আমাদের বিবৃতি-বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিবেন এবং গণ আন্দোলনের কোন খবর গায়েব করিবেন না। যদি তাহাতে বাধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাঙালীরা কাজে যোগ দিবেন না।

(৫) শুধু লোকাল এবং আন্তঃ জেলা ট্রাঙ্ক-টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন।

(৬) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখুন।

(৭) সকল গৃহশীর্ষে কালো পতাকা উড্ডীন রাখুন।

(৮) ব্যাঙ্কসমূহ প্রতিদিন ২ ঘণ্টা খোলা রাখুন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও যেন পাচার না হয়।

(৯) অন্যান্য ক্ষেত্রে আজ হইতে হরতাল প্রত্যাহৃত হইল। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোন সময় আবার আংশিক বা সর্বাত্মক হরতাল ঘোষণা করা হইতে পারে, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকুন।

(১০) স্থানীয় আওয়ামী লীগ শাখার নেতৃত্বে অবিলম্বে বাংলার প্রত্যেকটি ইউনিয়ান, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করুন।)

রবিবার রমনা রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রকে সাক্ষী রাখিয়া তুমুল করতালির মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান প্রসঙ্গে শনিবার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত বেতার ভাষণের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান রবিবারে আরও একটি লিখিত বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে

তিনি প্রেসিডেণ্টের বক্তব্যের জবাবে বিস্তারিতভাবে নিজ দলের বক্তব্য পেশ করেন।

প্রেসিডেণ্টের বেতার ভাষণের জবাবে শেখ মুজিবুর

১লা মার্চ তারিখে আকস্মিক ভাবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়। সেই দিন হইতে ৬ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসাধারণ সামরিক মোকাবিলার অধীনে রহিয়াছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিক ও অবাঞ্ছিত ভাবে স্থগিত ঘোষণা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নিরস্ত্র বেসামরিক অধিবাসীদের (শ্রমিক কৃষক ও ছাত্র) উপর ব্যাপকভাবে গুলি চালানো হইয়াছে। যাহারা প্রাণ দিয়াছেন তাঁহারা শহিদ হইয়াছেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন খামখেয়ালী ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ফলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ করিতে যাইয়া তাঁহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই শহিদদের 'ধ্বংসকারী শক্তি' আখ্যা দান নিঃসন্দেহে সত্যের অপলাপ। প্রকৃত পক্ষে তাহারাই সত্যিকার ধ্বংসকারী শক্তি যাহারা বাংলাদেশের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টির জন্য দায়ী। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বিভীষিকা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা দেখার জন্য প্রেসিডেণ্ট ঢাকায় আসার সময় করিতে পারিলেন না।

প্রেসিডেণ্ট যাহাকে সর্বনিম্ন শক্তি প্রয়োগ বলিয়াছেন তাহাতেই যদি হাজার হাজার লোক হতাহত হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার পর্যাপ্ত শক্তি প্রয়োগের অর্থ কি আমরা সম্পূর্ণ নির্মূল করাই বুঝিব ? আমি বাংলাদেশের নিরস্ত্র বেসামরিক অধিবাসীদের প্রতি এই ধরনের নগ্ন হুমকি দানের নিন্দা করিতেছি। বিদেশী হানাদারদের প্রতিহত করার জন্যই জাতি বিপুল অর্থব্যয়ে সেনাবাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিত

করিয়াছে। বেসামরিক জনসাধারণকে কচুকাটা করার জন্য তাঁহাদের অস্ত্রসজ্জিত করা হয় নাই। অপর অংশের উর্দিধারী ব্যক্তিদের বাড়াবাড়ি হইতে আজ বাংলার জনসাধারণের নিরাপত্তা প্রয়োজন। তাহারা খিলজীর বাহিনীর মতই আচরণ করিতেছে। বলা হইয়াছে যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখাকে 'ভুল বুঝা' হইয়াছে। আমি প্রেসিডেন্টকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, শুধুমাত্র একটি দলের কারসাজিতে সাড়া দিয়াই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয় নাই কি? এই দলটি পরিষদে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ। অথচ ইহা করা হইয়াছে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এবং পশ্চিমাঞ্চলেরও বহু সদস্যের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমরা প্রথম অধিবেশনের তারিখ হিসাবে ১৫ই ফেব্রুয়ারী সুপারিশ করিয়াছিলাম। অপরদিকে উক্ত সংখ্যালঘু দলটি মার্চের প্রথম সপ্তাহে অধিবেশন অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী বলিয়া জানাইয়াছিলেন। সংখ্যালঘু দলের মতামতই গ্রহণ করা হইল এবং ৩রা মার্চ তারিখে অধিবেশন ডাকা হইল। কিন্তু ইহার পরও সেই সংখ্যালঘু দলই আবার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে আপত্তি জানাইল। প্রথমেই এই দলটি অত্যন্ত আপত্তিকর মনোভাব প্রদর্শন করে। তাঁহারা বলেন যে ঢাকায় গেলে তাঁহাদের সদস্যরা বিপদাপন্ন হইবেন, এবং তাঁহারা "ডবল জিম্মি" হইয়া পড়িবেন। ইহার পর এই দল এই মনোভাব গ্রহণ করে যে তাঁহারা শুধু নিজেদের শর্তেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিবেন। ইহার পর এই দলের সদস্যরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়া অপর একটি ভেল্কি প্রদর্শন করেন। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হইল এই যে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আইনগত কাঠামো আদেশ সংশোধন করিয়া তাঁহাদের অধিবেশনে বসার পূর্বেই পদত্যাগের সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহার পর তাঁহারা পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নেন। ২৭শে

ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহাদের এই আপোসহীন মনোভাব চরমে উঠে। দলের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, উক্ত দলের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহারা গণ-আন্দোলন শুরু করিবেন। তাঁহারা এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, তাঁহারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিলে জনসাধারণ তাঁহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। আরও বলা হয় যে জনসাধারণ প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, পার্টি তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ইহার পরও হুমকি দেওয়া হয় যে উক্ত দলের কোন সদস্য অধিবেশনে উপস্থিত হইলে, 'দলীয় কর্মীরা তাঁহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে।' এই সময়ে আমাদের পার্লামেণ্টারী পার্টি ঢাকায় মিলিত হন। পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও সদস্যরা আসিতে থাকেন। প্রধান নিবাচনী কমিশনার ঢাকায় উপনীত হন এবং ২রা মার্চ মহিলা সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেণ্ট নিজেই ১লা মার্চ ঢাকা আসিবেন বলিয়া আশা করা হইতেছিল। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে আমরা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে আমাদের সহিত সহযোগিতা পালনের জন্য আমরা পাকিস্তানের সকল অংশের প্রতিটি সদস্যকে পুনরায় আমন্ত্রণ জানাই।

২৭শে ফেব্রুয়ারী আমরা এতদূর পর্যন্ত বলি যে কোন সদস্য পরিষদে ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত কিছু পেশ করিলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব। কিন্তু এমনকি ইহাও উপেক্ষা করা হয় সম্ভবত ইচ্ছাকৃত ভাবে ও একটা উদ্দেশ্য নিয়া। ১লা মার্চ বেতারে এক বিবৃতির মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিক ও অবাঞ্ছিত ভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। এজন্য যে কারণ দেখানো

হয়, তাহাতে বলা হয় যে ইহার ফলে 'সমঝোতা' প্রতিষ্ঠার জন্য আরও সময় পাওয়া যাইবে। উক্ত বিবৃতিতে বলা হয় যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক 'মোকাবিলা' চলিতেছে। বাংলা দেশের জনগণের কি একথা মনে করার মত যথেষ্ট কারণ নাই যে, এক অগণতান্ত্রিক সংখ্যালঘু দলের অঙ্গুলি হেলনেই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারে অন্যায় ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে? তাদের কি একথা মনে করার মত যথেষ্ট কারণ নাই যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে বাধাসৃষ্টি এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে জোট পাকাইয়াছে? ক্রমান্বয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের এই আশঙ্কা বরং বদ্ধমূল হয়। ইহার ফলে বোঝা যায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী, সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠীর কাছে মাথা নত না করিলে 'রাজনৈতিক মোকাবিলার' পরবর্তী পর্যায়ে 'সামরিক মোকাবিলা' চালানো হইবে। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রদত্ত আমাদের বিবৃতিতে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম যে যখনই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে গিয়াছে, তখনই অশুভ ও কুচক্রী শক্তি সর্বদা হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের প্রতিভূ এক অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী গণতন্ত্র বানচাল করিয়া দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বাংলা দেশের সাড়ে ৭ কোটি অধিবাসীকেও মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। পাঞ্জাবী ক্ষমতাসীন চক্রের চক্রান্তের দরুণ ১৯৫৩ সালে বাঙ্গালী প্রধানমন্ত্রী বরখাস্ত হন। একই চক্র ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত এবং খোদ গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেয়। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে দেশব্যাপী যখন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ঠিক সেই সময়ে

পাঞ্জাবী কায়েমী স্বার্থবাদী মহল আর একবার আঘাত হানে এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করে।) আজ পাঞ্জাবী ক্ষমতাসীন চক্র এই ন্যক্কারজনক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাদের জানা উচিত যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মত বাংলা দেশের জাগ্রত জনসাধারণও সকল সম্ভবপর উপায়ে তাদের এই হীন চক্রান্ত প্রতিরোধ করিবে।

কখনও গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেই নাই

আমি সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিতে চাই যে আমি কখনও গোল টেবিল বৈঠক ধরনের কোন সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে আভাস বা ইঙ্গিত দেই নাই। আমি শুধু প্রেসিডেন্টকে জানাইয়াছিলাম যে, বাংলা দেশের গুরুতর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং বেপরোয়াভাবে নিরপরাধ নিরস্ত্র লোকজনকে হত্যা করা বন্ধের জন্য তাঁর ঢাকা আসা উচিত। প্রেসিডেন্ট ইতিপূর্বে যে বৈঠকের প্রস্তাব করেন সে সম্পর্কে আমরা জানাই যে, কয়েক সপ্তাহ আগে ভাগেই আমাদের দলের কার্য নির্বাহক কমিটি এবং পার্লামেণ্টারী পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্য করা হইয়াছে। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের ব্যস্ত থাকিতে হইবে বলিয়া ঐ সময় রাওয়ালপিণ্ডি যাওয়া সম্ভব হইবে না। উপরন্তু আমরা জানাই যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের বিষয়াদি গোপন আলাপ আলোচনার পরিবর্তে জাতীয় পরিষদের অভ্যন্তরে বা কমিটি পর্যায়ে মীমাংসা করাই উত্তম। তাছাড়া জাতীয় পরিষদ যখন গঠিত হইয়াছে তখন কোন গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠান বা গোপন শলাপরামর্শের মানে হয় না।

(আওয়ামী লীগ ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধাসৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া যে দোষারোপ করা হইয়াছে উহা খণ্ডনের জন্যই আমি এই সব বাস্তব ঘটনা তুলিয়া ধরিয়াছি। এই ধরনের বাধাসৃষ্টিতে যদি কোন দল

.লাভবান হয় তাহা হইলে সে অন্য দল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিশ্চয়ই নয়। দেশবাসী তথা গোটা বিশ্ববাসীর কাছে একথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। মনে হইতেছে যে, এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর হুকুমের নিকট নতি স্বীকার করা তাঁর 'নৈতিক কর্তব্য' বলিয়া প্রেসিডেন্ট মনে করিতেছেন। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বানচাল করার জন্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের সঙ্গে চক্রান্ত করিতে থাকিলে গণতন্ত্র কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় না বা শাসনক্ষমতাও জনসাধারণের নিকট হস্তান্তরিত হইতে পারে না। গণতন্ত্র যদি চরম শিকারে পরিণত হয় এবং প্রস্তাবিত ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যর্থ হয় তাহা হইলে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং যারা এদের সঙ্গে যোগসাজস করিতেছে, তারা দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেনা। এই 'মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই' কি তারা নয়—যাদের কার্যকলাপ সহাবস্থানের একটি ভিত্তি উদ্ভাবনের ব্যাপারে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টায় চরম আঘাত হানিয়াছে? আজ বিবেকবান প্রতিটি মানুষ এই প্রশ্ন করিবে:— বাংলা দেশের সর্বত্র নিরস্ত্র নিরপরাধ মানুষকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়া সশস্ত্র বাহিনী 'পাকিস্তানের সংহতির অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা' রক্ষার কোন্ দায়িত্ব পালন করিতেছে? এইরূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা কি বিচ্ছিন্নতার প্রধান শক্তি হিসাবেই কাজ করিতেছে না? নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দেশে আজ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ক্ষমতার একমাত্র আইনানুগ উৎস। অন্য কোন ব্যক্তিই এই নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের চাইতে অধিক ক্ষমতা দাবি করিতে পারেন না।

আমরা, বাংলা দেশের জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মনে করি যে, আমরাই বাংলা দেশের ক্ষমতার

একমাত্র আইনানুগ উৎস। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়া আমরা সমগ্র দেশের ক্ষমতার আইনানুগ উৎসও বটে। সাত দিনের ঘটনাবলীতে দেখা গিয়াছে যে, সমগ্র বাংলা দেশে কার্যরত সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের শাখা সমূহ আমাদিগকে আইনানুগ কর্তৃত্বের উৎস হিসাবে মানিয়া লইয়াছে এবং আমাদের নির্দেশ সমূহ পালন করিয়া চলিয়াছে।)

আজ ইসলামাবাদস্থ সরকার এবং প্রেসিডেন্টকে এই মূল সত্যটি স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং বাংলা দেশের জনসাধারণের ঘোষিত ইচ্ছার সহিত ইহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।—বাংলার জনসাধারণের ইচ্ছা এই যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব প্রয়োগের ব্যাপারে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

এ ব্যাপারে আমাদের সামনে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান সংক্রান্ত ঘোষণার প্রশ্নটি আসিয়া পড়ে: তাড়াতাড়ি পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জরুরী প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা বারে বারে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু আজ মারাত্মক ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হইয়াছে। (বাংলা দেশের অসামরিক জনসাধারণের সহিত সামরিক মোকাবিলা নীতি অনুসরণ করিতে গিয়া কার্যত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে। হাজার হাজার লোক নিহত ও আহত হইতেছে বলিয়া খবর আসিয়া পৌঁছিতেছে। এবং চতুর্দিকে, তৎসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কণ্ঠে এবং সমগ্র বিশ্বের সঠিক চিন্তাধারার অধিকারীদের নিকট হইতে রব উঠিয়াছে গণহত্যা বন্ধ কর। সন্ত্রাসমূলক পরিবেশের মধ্যে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই মোকাবিলা নীতি অব্যাহত থাকিবে এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে সামরিক বাহিনীর লোকজন এবং অস্ত্রপাতি আনয়ন করা হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত দমননীতি চালিতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে

বেসামরিক লোকজনের উপর সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর আসিতে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাংলা দেশের সদস্যগণ বন্দুকের নলের মুখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের কথা চিন্তাও করিতে পারেন না।

প্রেসিডেন্ট যদি আন্তরিকভাবে মনে করেন যে, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে জাতীয় পরিষদকে কার্যকর করা উচিত তাহা হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইতে হইবে :—

(ক) সামরিক বাহিনীর সকল লোককে অবিলম্বে তাহাদের স্ব স্ব ছাউনিতে ফিরাইয়া লইতে হইবে।

(খ) বেসামরিক জনসাধারণের উপর অবিলম্বে গুলিবর্ষণ বন্ধ করিতে হইবে এবং এই মুহূর্ত হইতে একটি বুলেটও যাহাতে তাহাদের প্রতি বর্ষিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) সামরিক সমাবেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিপুল সংখ্যায় সামরিক বাহিনীর লোককে এখানে আনয়ন করা বন্ধ করিতে হইবে।

(ঘ) বাংলা দেশে সরকারী যন্ত্রের বিভিন্ন শাখা সমূহের কাজে সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করা চলিবে না এবং সরকারী অফিসার ও কর্মচারীদের ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে হইবে।

(ঙ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভার সম্পূর্ণ ভাবে পুলিশ এবং বাঙালী ই পি আর-এর উপর ন্যস্ত করিতে হইবে এবং যেখানে প্রয়োজন হইবে সেখানে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।

সামরিক মোকাবিলা নীতি যদি অব্যাহত থাকে এবং নিরস্ত্র জনসাধারণ যদি বুলেটের আঘাতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িতে থাকে

তাহা হইলে জাতীয় পরিষদ যে আর কখনই কাজ করিতে পারিবে না ইহাতে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আমাদের জনসাধারণ ইতিমধ্যেই বিশ্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে যে, তাহারা আর কলোনী অথবা বাজার হিসাবে শোষিত হইতে রাজী নহে। তাহারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিতে বদ্ধপরিকর; একথাও জানাইয়া দিয়াছে। ধ্বংসের হাত হইতে আমাদের অর্থনীতিকে অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের মেহনতী জনতাকে রক্ষা করিতে হইবে অনাহার ও বুভুক্ষা হইতে। রোগ মহামারী হইতে এবং বেকারিত্ব হইতে। ঘূর্ণি-দুর্গত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখনও করা হয় নাই। শাসক চক্র যদি জনসাধারণের এই আশা আকাঙ্ক্ষা বানচাল করিয়া দিতে চায় তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ও অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনার জন্যও প্রস্তুত। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং জনসাধারণের আকাঙ্খিত মুক্তি হাসিল করার জন্য যে বিপুল সংখ্যক শহিদ তাঁহাদের রক্ত দিয়াছেন তাঁহাদের রক্ত বৃথা যাইতে পারে না।

আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় শুরু হইয়াছে। আমাদের বীর জনসাধারণ অদম্য সাহস ও সংকল্পের পরিচয় দিয়াছেন। সুপরিকল্পিত ভাবে তাঁরা কারফিউ ভঙ্গ ও বুলেটের মোকাবিলা করিয়াছেন। আমি জনসাধারণ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকদেরও অভিনন্দন জানাই।

ভাড়াটিয়া উসকানিদাতা ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী গ্রুপের মধ্যে এবং বাঙালী ও তথাকথিত অবাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির যে মতলব আঁটিয়াছিল, তাঁহারাই উহা বানচাল করিয়া দিয়াছেন। আমি আরও একবার জানাইয়া দিতে চাই যে বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষই বাঙালী এবং

তাঁর জান-মাল ও মান-মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। যে কোন মূল্যেই হোক তাহা অবশ্যই রক্ষা করিতে হইবে। আমরা গর্বের সঙ্গে বলিতে চাই যে, আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সতর্কতা ও প্রহরার দায়িত্ব গ্রহণের পর কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে নাই।)

'আমাদের সংগ্রাম চলিতেছে ও চলিবে। সংগ্রামের বর্তমান পথের লক্ষ্য হইল :—অবিলম্বে সামরিক শাসনের অবসান এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন চলিতে থাকিবে।

ঢাকা বেতার বন্ধ

(ঢাকা বেতারে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা রীলে না করার প্রতিবাদে এবং বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রচণ্ড দাবির মুখে ঢাকা বেতারের কর্মরত সকল বাঙালী কর্মচারীর সহযোগিতা না করার দরুণ রবিবার (৭ই মার্চ) বিকাল হইতে ঢাকা কেন্দ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঢাকা বেতার কেন্দ্র বন্ধ হওয়ার ৩ ঘণ্টা পর অর্থাৎ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বেতার ভবনের আঙ্গিনায় একটি হাত-বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। একটি চলমান জীপ হইতে উক্ত হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হয়।) বোমা বিস্ফোরণের ফলে কোন জান-মালের ক্ষতি হয় নাই বলিয়া সংশ্লিষ্ট মহল হইতে জানা গিয়াছে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ রীলে করার জন্য কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন মহল হইতে জোর দাবি ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ রীলে করার সিদ্ধান্ত বেতার মারফত ঘোষণা করিলেও শেষ মুহূর্তে উহা করা হয় নাই। ঢাকা বেতারে শেখ মুজিবুর রহমানের এমনা রেসকোর্স ময়দানের ভাষণ রীলে করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর

প্রদেশব্যাপী শ্রোতাগণ অধীর আগ্রহে রেডিও সেট লইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। বেলা ২টা ১০ মিনিট হইতে ৩টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ঢাকা বেতারে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ রীলে শুরু করার পূর্বক্ষণে বিশেষ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে 'জাতীয় সঙ্গীত' পরিবেশন ব্যতীতই আকস্মিক ভাবে ঢাকা বেতারে ৩য় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। বিশেষ কর্তৃপক্ষের উক্ত নির্দেশের প্রতিবাদে ও শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ রীলে করিতে না দেওয়ায় ঢাকা বেতারের কর্মচারী-গণ সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করায় রবিবার বৈকাল হইতে ঢাকা বেতার কেন্দ্রটি অচল হইয়া পড়িয়াছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা বেতারের শিল্পীগণ ২রা মার্চ হইতে ঢাকা বেতারের সহিত অসহযোগিতা করিয়া জনতার সংগ্রামের সহিত একাত্মতা ঘোষণা করিয়াছেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঢাকা বেতার কর্মচারীদের কাজে যোগদানের জন্য আলাপ আলোচনা চালাইলেও অধিক রাত্রি পর্যন্ত কোন বেতার-কর্মচারী কাজে যোগদান করেন নাই এবং বেতার কেন্দ্র চালু করা সম্ভব হয় নাই। শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণ ভাষণ ঢাকা বেতারে প্রচার করা না হইলে তাঁহারা কাজে যোগদান করিতে সম্মত নন বলিয়া জানা গিয়াছে।

টিক্কা খাঁ ঢাকায় এলেন ৭ই মার্চ অপরাহ্নে। বিমান বন্দরে সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ সাহেবজাদা ইয়াকুব খান এবং অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ সামরিক অফিসারগণ টিক্কা খাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। ৭ই মার্চ রবিবার সন্ধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং অনতিবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। আসগর খান বলেন যে, 'যখনই দেশের

জনসাধারণ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সুযোগ উদ্ধার করেন তখনই কায়েমী স্বার্থবাদীরা জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে তৎপর হয়।' তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসন করিবার অধিকার আছে। আমি বুঝিতে পারি না কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা দেওয়া হইবে না।'

এইদিন গভীর রাত্রিতে এক সরকারী প্রেসনোট প্রকাশ করে জানানো হয় গত কয়েকদিন প্রদেশব্যাপী হাঙ্গামায় ১৭২ জন নিহত ও ৩৫৮ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে চট্টগ্রাম পাহাড়তলী ফিরোজ শাহ কলোনী ও ওয়ারলেস কলোনীতে ৭৮ জন নিহত ও ২০৫ জন আহত হয়েছে।) [ইত্তেফাক—৮ই মার্চ]

(৮ই মার্চ সোমবার অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল ঢাকায়। লেঃ জেঃ টিক্কা খানকে হাইকোর্টের কোন বিচারপতি আনুগত্যের শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করলেন। শুধু বিচারপতিরা নয়, গভর্নমেণ্ট হাউস থেকে বাবুর্চি বেয়ারাও চলে গেছেন। রান্না-বান্নার কাজ করতে হচ্ছে সিপাই সান্ত্রীদের। পূর্ববাংলায় বা বাংলা দেশে সামরিক প্রশাসন ঝড়ের মুখে পড়ে কদলী বৃক্ষের মত দুলছে। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্ব নিঃশেষিত। হাজার মাইল দূরে 'রাওলপিণ্ডি' অথবা 'ইসলামাবাদে'র কোন নির্দেশই আজ বাংলা দেশে কার্যকর নয়। প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নিজেদের হাতে গ্রহণ করেছে। সরকারের পদস্থ কর্মচারীরা নির্দেশ নিচ্ছেন মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের কর্মীদের কাছ থেকে। দুই পাকিস্তানের মধ্যে ডাক, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অচল। প্রদেশের সর্বত্র সকল ভবনের শীর্ষে উড়ছে কালো পতাকা, সর্বত্র তৈরী হয়েছে নিহত বাঙালীদের জন্য শহিদ বেদী।)

ঢাকায় এলেন মৌলানা ভাসানী

মঙ্গলবার ঢাকার পল্টন ময়দানে ভাষণ দিলেন মৌলানা। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন আতাউর রহমান খান। এর পরে বৈঠক বসল মুজিবুর ও ভাসানীর মধ্যে। ১৯৬৮ সালে আয়ুব খাঁকে গদীচ্যুত করার আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মৌলানা ভাসানী, পাশে ছিলেন মুজিবুর রহমান। এবার পুরোভাগে মুজিবুর আর পাশে আছেন মৌলানা ভাসানী। ইতিমধ্যে পাকিস্তান রেডিও সংবাদ দিল, প্রেসিডেণ্ট ঢাকায় আসছেন। সোমবার থেকেই রাজ্য-ব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। (এইদিন ঢাকা রেডিও থেকে মুজিবুরের বক্তৃতা রীলে করা হয়।

মুজিবুর তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, "আর যদি একটি গুলি চলে, যদি আমার লোকেদের হত্যা করা হয়, তাহলে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেক পাড়ায় দুর্গ গড়ে তুলুন। যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।

আমরা ওদের ভাতে মারব, পানিতে মারব। সৈন্যদের বলি, তোমরা আমাদের ভাই, তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আমাদের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করলে ভাল হবে না। সাত কোটি মানুষকে চাপা রাখতে পারব না। আমরা মরতে শিখেছি, কেউ আমাদের রুখতে পারে না। মালিকদের কাছে আমার অনুরোধ রইল এই হরতালে যে সব শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন তাদের যেন বেতন পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। সব কর্মচারীরা যেন ২৮ তারিখে বেতন নিয়ে আসেন। (জনতার হর্ষধ্বনি)

সরকারী কর্মচারীদের বলি—আমি যা বলি তা মানতে হবে। আন্দোলন কিভাবে করতে হয় তাও আমরা জানি। মুক্তি না আসা পর্যন্ত ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। হিন্দু মুসলমান, বাঙালী অবাঙালী সবাই আমার ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের সকলের। দেখবেন আমাদের যেন বদনাম না হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আমি আবার জানিয়ে দিতে চাই—দেশকে একেবারে জাহান্নমে নিয়ে যাবেন না। যদি আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে ফয়সালা করতে পারি তবে জানবেন যে বাচার সম্ভাবনা আছে। এই জন্য অনুরোধ—মিলিটারী শাসন চালাবার আর চেষ্টা করবেন না।

এখন প্রোগ্রামটা বলছি শুনুন :—

যদি রেডিও আমাদের কথা না শোনে তবে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না। টেলিভিশনে যাবেন না (জনতার হাততালি)। কেউ যদি আমাদের নিউজ না দেয় তবে ওদের কাছে যাবেন না। ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে ২ ঘণ্টা যাতে মানুষ মাহিনাপত্র নিতে পারে।

আর পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও যাবে না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে প্রত্যেক মহল্লায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। আপনাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।

আমরা রক্ত দিয়েছি, আরও রক্ত দেব। এই সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। প্রস্তুত থাকুন, ডিসিপ্লিন রাখুন। মনে রাখবেন, আমি কোনদিন বেইমানী করি নাই। আমি রক্ত দিবার জন্য প্রস্তুত। জয় বাংলা।" (জনতার চিৎকার—জয় বাংলা)

ভাসানী জনসভার প্রস্তাবাবলী

৯ই মার্চ মঙ্গলবার বিকালে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত মৌলানা ভাসানীর জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে পশ্চিমা শোষকগোষ্ঠীর আজ্ঞাবহ সামরিক সরকার কর্তৃক নিরীহ নিরস্ত্র স্বাধীনতাকামী বাঙালীর উপর সৈন্যদের গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ এবং গুলিবর্ষণে নিহত ও আহত স্বাধীনতা সৈনিকদের প্রতি গভীর সংগ্রামী সমবেদনা জ্ঞাপন এবং ক্ষতিপূরণ দাবি ও প্রদেশের সর্বত্র গায়েবানা জানাবার আয়োজন করিবার আহ্বান জানানো হয়।

এক প্রস্তাবে ৯ই জানুয়ারী সন্তোষ সম্মেলনে গৃহীত এবং ১০ই জানুয়ারী পল্টনের জনসভায় ঘোষিত স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি পুনরায় দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানানো হয়। এক প্রস্তাবে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও সুষম বণ্টন এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েম এবং ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়।

এক প্রস্তাবে পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের সকল বিদেশী বিকল্প বর্জনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এক প্রস্তাবে উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য দলমত নির্বিশেষে সাত কোটি বাঙালীর প্রতি সংগ্রামী আহ্বান জানানো হয়। এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবুর রহমান খাজনা, ট্যাক্স বন্ধের যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তজ্জন্য সংগ্রাম পরিষদ গঠনের মাধ্যমে লবন ট্যাক্স, নগরশুল্ক, হাট বাজারের তোলা, খাজনা, ইনকাম ট্যাক্স, এগ্রিকালচারাল ট্যাক্স সহ সমুদয় ট্যাক্স সংগঠিত ভাবে বন্ধ করিবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এক প্রস্তাবে নিরস্ত্র, নিরপরাধ জনগণকে গুলি করিয়া হত্যা করিবার অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সামরিক কর্মচারী ও সরকারী কর্মচারীদের নিকট নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী (চাল ইত্যাদি) বিক্রি বন্ধ করিবার জন্য সংগ্রামী জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এক প্রস্তাবে দেশের বর্তমান খাদ্য ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়ে যাহাতে কোন দ্রব্য সীমান্তের অপর পারে চোরা চালান না হয় তজ্জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

দেশের ৩০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য জনগণ, বিশেষ করিয়া কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পতিত জমি বিলি করার জন্য সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এক প্রস্তাবে পূর্ব বাংলায় অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী সমূহের শাখায় কোন টাকা জমা না করার আহ্বান জানানো হয়।

কালোবাজারী ও আড়তদারদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত করিবার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করিবার জন্য এক প্রস্তাবে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় বাঙালী-অবাঙালী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাঁধানোর মাধ্যমে গণসংগ্রামকে বিপথে পরিচালিত করিবার জন্য কোন কোন মহল হইতে যে প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল এবং হইতেছে, তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য সাত কোটি বাঙালীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এক প্রস্তাবে বাঙালী জাতির মুক্তি আন্দোলনের নামে এক শ্রেণীর টাউট, প্রবঞ্চক সর্বত্র যে চাঁদা তুলিয়া বেড়াইতেছে তাহা প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

এক প্রস্তাবে বিদেশী সৈন্য, বিশেষ করিয়া পাকিস্তানী ও মার্কিন সৈন্য যাহাতে পূর্ব বাংলায় অবতরণ করিতে না পারে তজ্জন্য চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিবার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় গণবিরোধী শাসন আমলের তনখা, খেতাব সহ বিভিন্ন উপঢৌকন বর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশ দান করা হয়।

সর্বশেষ প্রস্তাবে বলা হয় যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এই কর্মসূচি প্রয়োজন মত সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে।

পল্টনের জনসভায় মৌলানা ভাসানীর ঘোষণা

(মঙ্গলবার পল্টনের এক বিরাট জনসভায় তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধ ন্যাপ নেতা মৌলানা ভাসানী ঘোষণা করেন :—

"শেখ মুজিবুরের নির্দেশিত ২৫শে মার্চের মধ্যে কোন কিছু না করা হইলে আমি শেখ মুজিবুরের সহিত মিলিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল গণ আন্দোলন শুরু করিব।"

ন্যাপ নেতা মৌলানা ভাসানী দেশের সর্বশেষ অবস্থার পটভূমিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন : "একদিন ভারতের বুকে নির্বিচারে গণহত্যা করিয়া, জালিয়ানওয়ালাবাগের

মর্মান্তিক ইতিহাস রচনা করিয়া, অত্যাচার অবিচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াও প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকার শেষ রক্ষায় সক্ষম হয় নাই। শেষ পর্যন্ত তাহাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। পাক ভারত উপ মহাদেশকে শত্রুতে পরিণত না করিয়া সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্যে সরিয়া যাওয়াই তাঁহারা মঙ্গলকর মনে করিয়াছেন। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একদিন সূর্য অস্ত যাইত না, রূঢ় বাস্তবের কষাঘাতে সে সাম্রাজ্যেরও সূর্য আজ অস্তমিত।…প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেও তাই বলি : অনেক হইয়াছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। 'লা-কুম—দ্বীনুকুম অলইয়া দ্বীন'-এর (তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার) নিয়মে পূর্ববাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লও।")

দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতির পটভূমিতে স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় মৌলানা ভাসানীর বক্তব্য শ্রবণের জন্য প্রচুর লোক সমাগম হয়। সভায় মৌলানা সাহেব ছাড়া আর কেবল জনাব আতাউর রহমান খান বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-মঞ্চে অন্যদের মধ্যে জনাব শাহ আজিজুর রহমানকেও দেখা যায়। সভার পক্ষ হইতে প্রস্তাব পাঠ করেন ন্যাপ নেতা জনাব মশিহুর রহমান। সভার স্থলে মৌলানা ভাসানীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রচারপত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত জনসাধারণের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ার আহ্বান জানানো হয়। (মৌলানা সাহেবের ভাষণের বিভিন্ন পর্যায়ে লাল টুপি পরিহিত ন্যাপ কর্মীগণ 'স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা —মৌলানা ভাসানী' 'স্বাধীন বাংলার নয়ন মণি—মৌলানা ভাসানী' প্রভৃতি ধ্বনি উত্তোলন করেন।)

ন্যাপ-প্রধান মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মঙ্গলবার পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দান কালে

অবিলম্বে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

(এক পর্যায়ে তুমুল করতালির মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন "মুজিবের নির্দেশ মত ২৫ তারিখের মধ্যে কোন কিছু করা না হইলে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত মিলিয়া ১৯৫২ সালের ন্যায় তুমুল আন্দোলন শুরু করিব।" ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান যে ঘোষণা করিয়াছেন সে ব্যাপারে শেখ সাহেব আপোস করিতে পারেন বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া মৌলানা সাহেব বলেন, 'থামকা কেহ মুজিবুরকে অবিশ্বাস করিবেন না। মুজিবকে আমি ভাল করিয়া চিনি, তাঁহাকে আমি রাজনীতিতে হাতেখড়ি দিয়াছি।")

(মৌলানা সাহেব মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে আরও বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমানকে আমার তিন পুত্রের চেয়েও ভালবাসি। আমার রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে আমি ৩১ জন সেক্রেটারীর সহিত কাজ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান শ্রেষ্ঠ সেক্রেটারী ছিল।" মৌলানা সাহেব বলেন, "সেদিন এত লালটুপি ছিল না। সেদিন আমার হাতে এক টাকা বা বার আনা পয়সাও সম্বল ছিল না। সেই বিপদের দিনে আমরা একত্রে কাজ করিয়াছি।"

স্বভাব সুলভ কণ্ঠে গর্জিয়া মৌলানা সাহেব বলেন, "আপোস? আপোস করিলে মুজিব বল, ভাসানী বল, কাহারও আর নিস্তার থাকিবেনা।" মৌলানা সাহেব তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হইবে। পাকিস্তান অখণ্ড থাকিবে না। অখণ্ড রাখিব না। ইয়াহিয়ার বাপেরও ক্ষমতা নাই ইহা ঠেকায়। কামানের গুলিকে বাঙালী ভয় করে না। বাঙালীর হাতে তীর ধনুক, খন্তা, দা, কুড়াল, বল্লম আছে।" মৌলানা বলেন, "অহিংসায়

আমি বিশ্বাস করি না, আল্লাহ এবং রসুল (দঃ)-ও এই শিক্ষা দেয় নাই। যে জুলুম করে সে যেমন পাপী যে তাহা সহ্য করে সেও তেমন পাপী। জালামের সাথে কোন সহযোগিতা নাই।")

মৌলানা সাহেব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে আরও বলেন, "যদি পশ্চিম পাকিস্তানের পৌণে পাঁচ কোটি মানুষের ভাল চান তবে কালই বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লউন। ইংরাজের গোলাম ছিলেন, ইংরাজের আদর্শ নিশ্চয় জানা আছে। ইংরাজও যেদিন বুঝিয়াছিল যে, ভারতে সাম্রাজ্য আর টিকিবে না তখন শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া দুই বৎসর আগেই ভারত ত্যাগ করিয়াছিল।" তিনি আরও বলেন, "ব্রিটিশ ভারতে নির্যাতন চালাইয়া জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি করিয়া নিজেরই পতন ডাকিয়া আনিয়াছিল। গুলি চালাইয়া কোন দেশকে যে দাবাইয়া রাখা যায় না এ তাহারই প্রমাণ।" তিনি বলেন, "ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ব্যবসায়িক সম্পর্ক যাতে তিক্ত না হয় তার জন্য ব্রিটিশ সরকার আগেভাগেই ভারতকে স্বাধীনতা দিয়া পালাইয়া বাঁচিয়াছিল।" তিনি বলেন, "আপনি দৌলতানা, ভুট্টো, খুরোর সহিত আলোচনা করিয়া দুই তিন দিন পরে আসুন। তাড়াহুড়ায় কাম নাই। তারপর এখানে আসিয়া বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লউন।" মৌলানা ভাসানী বাংলার নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে হত্যার তীব্র প্রতিবাদ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, "২৩ বৎসর ব্যাপী বাঙালীকে পশ্চিমা শাসক শোষক গোষ্ঠীর শোষণের কোন সুবিচার না করিয়া নিরস্ত্র নিরপরাধ বাঙালীকে হত্যা করা হইয়াছে।"

প্রেসিডেণ্টকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলেন, "বাহাদুর সৈন্য কাশ্মীর দখল করিতে পারে না। ভারত যখন দুনিয়ার রীতি বর্জন করিয়া কাশ্মীর দখল করিল, তখন তোমরা সৈন্য পাঠাইতে পার না আর আইন শৃঙ্খলার নামে বাংলা দেশে মানুষ খুন কর!"

(মৌলানা সাহেব তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে আরও বলেন, "ল অ্যাণ্ড অর্ডার আপনি ভঙ্গ করিয়াছেন। আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকিয়া তাহা বাতিল করিয়াছেন। আপনি যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা পানওয়ালারাও বিশ্বাস করে না।"

তিনি প্রকারান্তরে ভুট্টোকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "গণতন্ত্রের অর্থই আপনি জানেন না। পার্লামেণ্ট বর্জনের এ ধরনের নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে কোন আইন প্রণয়ন করিবেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের তাহাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া সম্মত করাইতে হয়।" তিনি বলেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক শ্রমিকের গ্রাস কাড়িতে চাহিত, তাহা হইলে বাংলার মানুষ, দুনিয়ার মানুষ তোমাদিগকে সমর্থন করিত।"

প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়াকে উদ্দেশ করিয়া মৌলানা সাহেব বলেন, "আপনার হাতে 'লিগ্যাল ফ্রেম' আছে। ইহার নাম কি গণতন্ত্র? কোন গণতান্ত্রিক দেশে কি এই নিয়ম আছে? আমেরিকা, বৃটেন, দুনিয়ার কোথাও এই নিয়ম নাই। গণতন্ত্র সম্বন্ধে আপনার কোন আইডিয়া নাই।" রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গানারের উদ্ধৃতি দিয়া মৌলানা সাহেব বলেন, "গণতন্ত্র যদি সত্যিকার গণতন্ত্র না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের চেয়ে একনায়কত্ব ভাল। বৃটেনে পার্লামেণ্টে কি হয় রাণী তাহার খবর রাখেন, কিন্তু বাধা দেন না। আপনার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা গালগল্প ছাড়া কিছুই নয়।" নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার তীব্র সমালোচনা করিয়া মৌলানা সাহেব বলেন, "আমি প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়াকে দুনিয়ার ইতিহাস না জানিলে অন্তত পাক-ভারতের অতীত ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অত্যাচার, নিপীড়ন চালাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যেরও সূর্য অস্ত গিয়াছে। মুসলিম

লীগ, আইয়ুব সরকারেরও পতন ঘটিয়াছে। অত্যাচার নিপীড়ন চালাইয়া আজ যদি আপনার সন্তান বাংলায় গুলি খাইয়া মরিত তাহা হইলে আপনার স্ত্রী পাগলিনী হইয়া যাইত মায়ের অভিশাপ আপনার উপর ঘনাইয়া আসিতেছে।" তিনি বলেন, "নতুন করিয়া অর্ডার দিয়া হায়দরাবাদের নরম মানুষ ভদ্রলোক আহসানকে বিদায় দিয়া টিক্কা খানকে আনা হইয়াছে বাঙালীকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সাত কোটি বাঙালীকে হত্যা করা যাইবে না। হত্যা করিয়া বাঙালীর দাবি দাবাইয়া রাখা যাইবে না। এখনও সময় আছে। যাহাতে দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রক্ষা করার মত পরিবেশ থাকে, যাহাতে রাষ্ট্রদূত বিনিময় করা যায় এবং যাহাতে একে অপরের শত্রু না হই, এজন্য আগে ভাগাভাগি করিয়া ফেলেন। মেজরিটি-মাইনরিটির খেল যাহা দেখাইতে চান তাহা পশ্চিম-পাকিস্তানেই দেখান, আমাদের আপত্তি নাই।")

মৌলানা সাহেব বাংলা দেশে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদনের কথা উল্লেখ করিয়া কৃষকগণকে খাদ্য উৎপাদনের উপদেশ দেওয়ার জন্য কর্মীগণকে আহ্বান জানান। তিনি কর্মীগণকে চরিত্রবান হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইয়া বলেন, "চরিত্রবান না হইলে স্বাধীন বাংলা রক্ষা করা যাইবে না।" তিনি বলেন, "দোকানপাট লুঠতরাজ বন্ধ কর, জ্বালানো পোড়ানো বন্ধ কর। এইগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। স্বাধীন বাংলায় হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টানকে সমান অধিকার দিতে হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বাংলা দেশ হইতে সম্পদ পাচার না হয়।"

আতাউর রহমান খান

(জনসভায় ভাষণদান কালে জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান খান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশে বলেন, "এই মুহূর্তে আপনি স্বাধীন বাংলার জাতীয় সরকার ঘোষণা

করুন। বাংলার মানুষ আজ কাতারে কাতারে সারিবদ্ধ হইয়াছে। এই ক্রান্তিকাল আর আসিবে না। বাংলার সকলেই জাতীয় সরকারের হুকুম মানিয়া চলিবেন। আমাদের আর কোন দাবি নাই।" জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, "লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীনতার ওয়াদা ছিল। কিন্তু তাহা আজও পূরণ হয় নাই। গত ২৩ বৎসর যাবৎ বাঙালীরা রক্ত দিতেছে। এবার স্বাধীনতার জন্য রক্তদান শুরু হইয়াছে।"

জাতীয় লীগ প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উদ্দেশে বলেন, "বাঙ্গালী স্বাধীন হইয়া গিয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া নিন। আড়াই ডিভিশন সৈন্য আছে এখানে, সৈন্য সরাইয়া নিন। বাঙালী ইহাদের মোকাবিলা করিতে পারিবে। কিন্তু অনর্থক জীবন নষ্ট করিতে চাই না।"

সাম্প্রতিক আন্দোলনে গণহত্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "গত কয়েক দিনে পাঁচ শত লোক হত্যা করা হইয়াছে। যাহারা বাংলার মানুষকে হত্যা করিয়াছে সেই কসাইদের কাছে হত্যার বিচার চাই না।" জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, তাঁহার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" ১৯৫৪ সালে এবং '৫৮ সালেও এই ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "এইবারও একবার পরিষদ ডাকিয়া আবার বাতিল করা হইয়াছে।" তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, "পরিষদে কাজ হইবে না। পরিষদের কথা ভুলিয়া যান। সিপাহীরাজ এল এফ ও-এর মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ রক্ষার জাল বিস্তার করিতেছে। সিপাহীরাজ, স্বাধীন বাংলা ঘোষণা কর। তোমাদের এলাকায় স্বাধীন পরাধীন যাহা কিছু কর আমাদের আপত্তি নাই।"

ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব মশিহুর রহমান সভায় প্রস্তাব পেশ করেন।)

ছাত্র লীগ কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরী সভায় "স্বাধীন বাংলা দেশ' ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন—

মঙ্গলবার ৯ই মার্চ সার্জেন্ট জহুর (ইকবাল) হল ক্যানটিনে ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় সংসদের এক জরুরী সভা সংগঠনের সভাপতি নূরে-আলম-সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় গৃহীত এক শোক প্রস্তাবে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে উপনিবেশবাদী পাকিস্তানী সেনা কর্তৃক নিহত ছাত্র লীগ কর্মী, শহিদদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ, তাঁহাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শহিদদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে গত ২রা মার্চ বটতলায় অনুষ্ঠিত ছাত্র লীগ এবং ডাকসুর নেতৃত্বে গঠিত 'স্বাধান বাংলা দেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' সভায় গৃহীত 'স্বাধীন বাংলা দেশ' ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশে জাতীয় সরকার গঠনের জন্যে অনুরোধ করা হয়। সভায় বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ছাত্র লীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ সভাপতি আঃ সঃ মঃ আবদুর রব এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখনকে লইয়া গঠিত 'স্বাধীন বাংলা দেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সভায় ছাত্র লীগের প্রত্যেক জেলা এবং শহর হইতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখায় ছাত্র সভাপতিকে আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করিয়া এবং ৯ জন সদস্য লইয়া সর্ব মোট ১১ জনের সমন্বয়ে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করার নির্দেশ দান করা হয়। প্রস্তাবে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ব্যাপারে স্থানীয় কলেজ ছাত্র সংসদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের জন্যও নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইহা

ছাড়া, প্রত্যেক শাখাকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ গঠনেরও নির্দেশ দান করা হয়।

সাংগঠনিক প্রস্তাবে কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের পরিবর্তে শুধু ছাত্র লীগ নাম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে প্রত্যেক জেলা শাখাকে জরুরী কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করিয়া ছাত্র লীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় সংসদকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য দায়িত্ব পালনের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

[ইত্তেফাক—১০ই মার্চ]

(পূর্ব বাংলার বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রচারপত্র

পাকিস্তানী শাসক চক্র পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিকে দীর্ঘদিন যাবত বে-আইনী ঘোষণা করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি তাই গোপন অবস্থায় থেকেই সেখানে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গত ৯ মার্চ তারিখে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব বাংলায় এক প্রচারপত্র বিলি করে। তখন সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে ইয়াহিয়া চক্রের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। দেরীতে হলেও এই প্রচারপত্রের হুবহু আমরা ছেপে দিলাম। ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া চক্র বাংলাদেশের মানুষের সমস্ত দাবিকে অস্ত্রের জোরে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। পূর্ব বাংলার মানুষ তাই অস্ত্র নিয়েই ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে লড়ছেন। "স্বাধীন বাংলাদেশ" ঘোষণা করেছেন। মুক্তি বাহিনী গঠিত হয়েছে।

"ভাইসব,

বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এখানে একটি পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধ-

পরিকর হইয়াছেন ও এই জন্য এক গৌরবময় সংগ্রাম চালাইতেছেন। এই সংগ্রামে জনগণ অসীম সাহসিকতার সহিত সশস্ত্র সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করিতেছেন এবং নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বুকের রক্ত ঢালিতেও দ্বিধা করিতেছেন না। কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব বাংলার সংগ্রামী বীর জনগণের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছেন। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্টরা দীর্ঘকাল হইতেই বাঙালী সহ পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষী জাতির বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকার তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করিয়া আসিতেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ আজ অনেক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া পূর্ব বাংলায় একটি পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের যে দাবি উত্থাপন করিয়াছেন আমরা ইহাকে ন্যায্য মনে করি। তাই পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামে আমরা সর্বশক্তি লইয়া শরিক হইয়াছি।

জনগণের দুশমন কাহারা ?

বাংলাদেশে পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের এই সংগ্রামে জনগণের দুশমন হইল পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী ও বর্তমান সামরিক সরকার। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ—বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, বড় বড় জোতদার জায়গীরদার মহাজন ও একচেটিয়া পুঁজির মালিক ২২টি পরিবারের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য গত ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলা দেশের শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত ছাত্র প্রভৃতি জনগণকে শোষণ এবং নিপীড়ন করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণকে জাতীয় অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হইতে আগাগোড়া বঞ্চিত করিয়াছে। আজও উহাদের স্বার্থেই ইয়াহিয়া সরকার প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সমূহের নয়া নেতা ভূট্টোর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া জাতীয় পরিষদের

অধিবেশন নস্যাৎ করে ও গণতন্ত্র জাতীয় অধিকার এবং শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এই প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের বর্তমান সংগ্রামকে দমনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে এবং সেনাবাহিনীকে জনগণের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছে। সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই গণহত্যা ঘটাইয়াছে ও রক্তের বন্যায় পূর্ব বাংলায় জনতার সংগ্রাম স্তব্ধ করিবার জন্যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

তাই বাংলাদেশের জনগণের দুশমন হইল সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ও উহার সেনাবাহিনী। পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান-বেলুচ-সিন্ধি-পাঞ্জাবী জাতিসমূহের মেহনতী জনতা পূর্ব বাংলার শত্রু নয় বরং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের গণতন্ত্র ও বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর জাতীয় অধিকারকেও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী শোষণ ও নিপীড়ন করিতেছে। তাই ঐ দুশমনদের জব্দ করার জন্য আজ এখানে গড়িয়া তুলিতে হইবে বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু-মুসলমান জনগণের দুর্ভেদ্য একতা। ঐ দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাংলা দেশের জনগণকে বেলুচ-পাঠান-সিন্ধি-পাঞ্জাবী মেহনতী জনগণকে মিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং পূর্ব বাংলার সংগ্রামে তাঁহাদের সাহায্য পাইতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

এই সংগ্রামে এখানকার জনগণের সুদৃঢ় ঐক্য ও বেলুচ-পাঠান প্রভৃতির সমর্থন যত বেশী গড়িয়া উঠিবে গণ-দুশমনদের পরাজয়ও ততই নিশ্চিত হইবে।

প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে অবিচল থাকুন

ঐক্যবদ্ধ গণশক্তি ও জনতার সংগ্রামের জোরে গণ-দুশমনদের ও উহাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া এখানে জনগণের দাবি

মতে 'স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অগ্রসর করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের শৃঙ্খলে বাঁধা না পড়ে, স্বাধীন বাংলায় কৃষক সমাজের উপর যাহাতে জোতদার মহাজনের শোষণ না থাকে, স্বাধীন বাংলায় যাহাতে শ্রমিক ও জনসাধারণকে পুনরায় পুঁজিপতিদের শোষণ ও নিপীড়নে ধুঁকিয়া মরিতে না হয়, সেজন্যও সংগ্রামকে দৃঢ়ভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশে এখন একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াছে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ উৎখাত করিয়া ও পুঁজিবাদ বিকাশের পথ পরিহার করিয়া জনগণের স্বার্থে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করা ও সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী পথ উন্মুক্ত হইতে পারে।

বিভ্রান্ত হইবেন না

কতকগুলি তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টি জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য "ধর্মঘট, অসহযোগ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই", "গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব শুরু করুন", "জোতদারদের গলা কাট" প্রভৃতি আওয়াজ তুলিতেছে। কোন কোন নেতা "স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে" বলিয়া ধ্বনি তুলিয়া আজকার গণসংগ্রামের উদ্দীপনা, সংকল্প ও প্রস্তুতিতে ভাঁটা আনিয়া দিতে চাহিয়াছেন। মার্কিনী এজেন্টরা এই সংগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া সংগ্রামকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টা করিতে পারে। শাসকগোষ্ঠী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের উসকানিতে সমাজবিরোধী দুষ্কৃতকারীরা দাঙ্গা হাঙ্গামা লুঠতরাজ প্রভৃতি বাধাইয়া সংগ্রামকে বিনষ্ট করিতে তৎপর হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে হুঁশিয়ার ও সজাগ থাকার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি।

দৃঢ় সংকল্প বজায় রাখুন

বাংলাদেশের জনগণ আজ অভূতপূর্ব দৃঢ়তা ও একতার সঙ্গে অফিস-আদালতে হরতাল, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ প্রভৃতির যে সংগ্রাম চালাইতেছেন, সে সংগ্রাম ইতিমধ্যে ইতিহাসে এক নূতন নজির স্থাপন করিয়াছে। সামরিক সরকারের হুমকি, দমননীতি, অভাব অনটন প্রভৃতির মধ্যেও যে সংগ্রাম শিথিল বা দমিত হইবে না এবং শত্রুর নিকট আমরা কখনও নতি স্বীকার করিব না এই বজ্রদৃঢ় সংকল্প আজ বাংলার ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠুক।

ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করুন

নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রদান, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবিগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন সেগুলি আদায় করিতে পারিলে 'স্বাধীন বাংলা' কায়েমের সংগ্রামের অগ্রগতির সুবিধা হইবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া ওই দাবিগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ওই দাবিগুলি পূরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করাই হইল এই মুহূর্তে জরুরী কর্তব্য।

সেনাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করুন

বস্তুত হরতাল, লক্ষ লক্ষ জনতার সমাবেশ, মিছিল, সরকারী অফিস-আদালত ও সামরিক বাহিনীর সহিত অসহযোগ প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ পন্থায় বর্তমান পর্যায়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

কিন্তু জনগণকে আজ সংগ্রাম করিতে হইতেছে প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। তাই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত জনগণের সংগ্রাম বিজয়ী হইবে এইরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠীর আজ্ঞাবাহী সেনাবাহিনী জনগণের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করিতে পারে। তাই আত্মসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই। সংগ্রাম যে কোন সময়ে সুতীব্র রূপ ধারণ করিতে পারে। এই অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভর না করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবেলা ও উহা প্রতিরোধ করার জন্য শহর গ্রাম সর্বত্র জনগণকে সংগঠিত ভাবে প্রস্তুত হইবার জন্য আমরা জনগণের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। এই জন্য পাড়ায়, মহল্লায়, গ্রামে, কল-কারখানায় সর্বত্র দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শক্তি দিয়া গড়িয়া তুলুন স্থানীয় সংগ্রাম কমিটি ও গণবাহিনী। সেনাবাহিনী আক্রমণ করিলে উহা প্রতিরোধের জন্য ব্যারিকেড গঠন করুন, যার যাহা আছে তাহা দিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করুন।

শ্রমিক-কৃষক ভাইরা এগিয়ে আসুন

আজিকার সংগ্রাম জনগণের ন্যায় সংগ্রাম। পশুশক্তির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম বিজয়ের বজ্রকঠিন শপথ ও সংকল্প নিয়া আগুয়ান হওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি আজ নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলা দেশের সমস্ত জনগণকে, বিশেষত শ্রমিক, শহরের গরীব বস্তিবাসী, কৃষক ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে। সাহসের সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সংগ্রাম চালাইতে পারিলে আমাদের জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত।

কেন্দ্রীয় কমিটি

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি—ঢাকা)

"স্বদেশ অন্ততঃ এখনো আমি আছি
স্পর্ধিত নদী-নক্ষত্রের
যৌবন নিয়ে বাঁচি।
সূর্যকে ভেঙ্গে খান্ খান্ করে
কাঁকন পরেছি হাতে
আকাশের ঐ তারা গলিয়ে
কাজল এঁকেছি চোখে।"

প্রতিটি দেশবাসীর মনে আজ এ-কথা উচ্চারিত প্রতিটি মানুষ আজ এক অনাগত লড়াইয়ের মুখে এমনি দুঃসাহস আর চেতনা বুকে রেখে ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। আজ দাবি দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে সাত কোটি বাঙালী এক দেহ, এক প্রাণ। গুটিকয় আপন গণশত্রু ব্যতীত সমস্ত জাতি ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। বাঙালীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এক অগ্নিপরীক্ষার পর্যায় এসেছে এবার।

গত রবিবার রেসকোর্সের বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এ-কথা মনে হয়েছে যে, সমুদ্রের জোয়ারকে যেমন আটকে রাখা যায় না তেমনি জনগণের প্রাণের দাবিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। একতার চেয়ে বড় শক্তি আর নেই। তাই গত ক'দিনে হাটে ঘাটে মাঠে ঐক্যের সর্বদিক প্রসারিত শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করা গেছে। বুলেটের মুখে নিরস্ত্র জনতা অকাতরে প্রাণ দিয়ে ঐক্যের জয়গান গেয়ে গেছেন।

তাঁদের আত্মদান আমাদের সংগ্রামের পথে প্রেরণা হয়েছে, আমাদের হৃদয়ে সংগ্রামী আগুনের শিখা আরও দীপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে প্রবঞ্চিত শোষিত নিপীড়িত আমাদের অসন্তোষ বিস্ফোরিত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে

যে, দেশ জনতার ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠস্বরের সামনে কোন শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।।

আজ রাজপথে হাটে মাঠে লোকালয়ে শহরে নগরে বন্দরে জনতার চোখে মুখে মুক্তির আগুনই জ্বলতে দেখা যায়। সামনে অনাগত কঠোর দিন। দুর্দশা বিপর্যস্ত সময় দেখেও জনতা ভীত নয়। দাবিদাওয়া আদায় করতে এদেশের মানুষ বাহান্ন থেকে অকাতরে রক্ত দিয়ে আসছে। রক্ত দিতে শিখেছে এই দেশের মানুষ প্রতি পদক্ষেপে। তাই আরও রক্ত দেয়ার প্রস্তুতি চলেছে ঘরে ঘরে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে প্রতি ঘর একটি করে দুর্জয় দুর্গে পরিণত হচ্ছে। আজ আমাদের অহংকারের দিন যেমন এসেছে তেমনি সদাসর্তক থাকার দিনও এসেছে। আমাদের চোখে জ্বলবে সূর্যের রোশনাই. হাতে থাকবে স্পর্ধার ভারী অস্ত্র. বুকের দরজা সন্ধ্যা-সকাল-রাত্রি খোলা থাকবে মৃত্যুকে অনায়াসে প্রবেশের পথ দেয়ার জন্যে। ঠিক তারই পাশাপাশি আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি আচরণে, প্রতিটি মুহূর্তে। সেদিনের বিশাল জন সমুদ্রকে বাংলার সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু সতর্ক করে দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যে ছদ্মবেশী শত্রু ঢুকে পড়ে আমাদের ক্ষতি করতে পারে। তাই আমাদের হতে হবে নিয়মতান্ত্রিক সতর্ক প্রহরী।

একথা সত্য যে, জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্যে পৌঁছুতে প্রচুর অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়। গণশত্রুরা আমাদের মধ্যে বিভেদ ও ত্রাস সৃষ্টি করে নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামকে বানচাল করে দিতে পারে। তাই আজ আমাদের দিন এসেছে নিজেদের প্রয়োজন বোধে সংশোধন করে নেয়ার।

আজ আমাদের জাতীয় চরিত্রে যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সংশোধন করে নেয়ার পথে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, প্রতিটি মানুষের ভালোমন্দ মিলিয়ে

একটি জাতির চরিত্র সৃষ্টি হয়। সে কারণে, আমাদের মনে রাখতে হবে আজ সাত কোটি বাঙালী এক দেহ এক প্রাণ। আমরা সবাই একটি গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমাদের আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক সতর্কতা না থাকলে নেতৃবৃন্দের পদক্ষেপ নিখুঁত ও নির্ভুল হলেও ব্যর্থতা আসতে পারে। কারণ, নেতার দায়িত্ব হলো সঠিক ভাবে পরিচালিত করা এবং জনতার দায়িত্ব হলো সঠিকভাবে সংগ্রাম চালানোর যোগ্যতা অর্জন করা। আমাদের মধ্যে এ গুণ বিদ্যমান থাকলে আমাদের নেতৃবৃন্দও ভুল করতে পারবেন না।

৯ই মার্চ পল্টনের বিরাট জনসভায় মজলুম জননেতা মৌলানা ভাসানীও আমাদের 'চরিত্র'কে নিখুঁত ও অনুপম করার প্রয়োজনীতার কথা উল্লেখ করেছেন।

'চরিত্র' বলতে তিনি সততা, নিষ্ঠা, সাহস এবং সংগ্রামী মনোভাবের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে ত্রুটি থাকলে আমরা সংগ্রাম শেষে গন্তব্যে পৌঁছেও তার ফল ভোগ করতে পারব না।

তাই প্রতি মুহূর্তে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে—নিজের ও দেশের জনতার কাছে আমি কতখানি সৎ ও সাহসী। আজমুত সমুদ্রে প্রচণ্ড জোয়ার এসেছে, যা কেউ বাধা দিতে পারবে না। আপন বেগে, আপন শক্তিতে, আপন মহিমায় গণচেতনার এক জোয়ার প্রবাহিত হবেই। কারণ দেশের মানুষের কণ্ঠে শোনা যায় :

"মৃত্যুকে করেছি তুচ্ছ
জীবনের নান্দীপাঠ সারা
জীবন জয়ের রণে,
দিকে দিকে সংগ্রামের তাড়া।"

সাত কোটি বাঙালী যেখান হইতে আজ নির্দেশ গ্রহণ করে

ইসলামাবাদের কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর না করিলেও বিশ্ববাসীর কাছে আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বাংলার শাসনক্ষমতা এখন আর সামরিক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারে নাই। বরং সাত কোটি মানুষের ভালবাসার শক্তিতে ধানমণ্ডির ৩২ নং সড়ক এখন বাংলার শাসন ক্ষমতার একমাত্র উৎস হইয়া পড়িয়াছে। হাজার চোখরাঙানী সত্ত্বেও এই সড়ক হইতে যে নির্দেশ জারী হয়, বাংলার সাত কোটি মানুষ এখন যে কোন মূল্যে তাহা বাস্তবায়িত করেই। আর যাহার নির্দেশ জনগণ পরম শ্রদ্ধায় ও চূড়ান্ত ত্যাগের বিনিময়ে কার্যকরী করে তিনি হইতেছেন বাংলার মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর এখন বাংলার মুক্তি সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক। এই জন্যই ধানমণ্ডিস্থ শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন এখন একটি অঘোষিত সরকারী সদর দপ্তরে পরিণত হইয়াছে। হোয়াইট হাউস বা ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটের মত এই বাড়ীটির কোন সরকারী মর্যাদা নাই বটে—কিন্তু বাংলার সাত কোটি মানুষের ভালবাসার রাজ্যে এই বাড়ী এক অনন্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

বাংলার শ্যামল প্রান্তর আজ বহ্নিমান
তবুও শোষক শ্রেণী দুঃস্বপ্নে বিভোর

শ্যামল বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে প্রায় একপক্ষ কাল যাবৎ যে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বলিতেছে কায়েমি স্বার্থবাদী মহলে এখনও তাহা কোন শুভ প্রতিক্রিয়ার সূচনা ঘটাইতে পারে নাই। পরিস্থিতি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, শোষক গোষ্ঠী শক্তির দাপটে বাংলা দেশকে সংরক্ষিত বাজার হিসাবে ব্যবহারের দুঃস্বপ্নে এখনও বিভোর আর সেই জন্যেই দেশব্যাপী গণপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের

দাবি উত্থিত হইলেও এই মহল যে কোন প্রকারে ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিতেছে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা : এই মনোভাবের আশু পরিবর্তন না হইলে পরিস্থিতি এমন গুরুতর মোড় নিতে পারে, যাহা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কোন গোলা বারুদের নাই। কেননা শত শহিদের তপ্ত রক্তে সিক্ত বাংলার চেতনা এখন আর কোন আপোসে রাজি নয়। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত বাংলার মানুষের এই সামান্য অধিকার প্রদান করিতে স্বার্থবাদী মহলের কেন এত অনীহা—বহ্নিমান অগ্নিগিরির উপর দাঁড়াইয়া আজ তাহা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

প্রথমত 'স্বাধীনতা'র ২৩ বৎসরে বাংলাদেশ কেবলই দিয়াছে, বিনিময়ে পাইয়াছে অবজ্ঞা আর বঞ্চনা। বাংলা দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শোষকের ভোগ বিলাসের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য। সাধারণ মানুষ এই সব প্রতিষ্ঠানে ক্রীতদাসের মত শ্রম দিয়াছে, আর শোষক গোষ্ঠি সেই শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করিয়াছে সাত কোটি মানুষের দেশ বাংলায়। বাংলাদেশের শিল্পের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করিয়া এখানে গড়িয়া তুলিয়াছে প্রতিযোগিতাহীন একটি সংরক্ষিত বাজার। তাহারা আরও বুঝিতে পারিয়াছে যে, সাত কোটি মানুষের এই নিরাপদ বাজার ছুটিয়া গেলে তাহাদের কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহারা কোন বিকল্প ব্যাপারেরও ব্যবস্থা করিতে পারে নাই।

সুতরাং এই কায়েমি স্বার্থবাদী মহল আজ যে কোন প্রকারে বাংলাদেশের বাজার অক্ষুন্ন রাখিতে চায়। আর সেই জন্যই ন্যূনতম অধিকার দানের পরিবর্তে চালায় দমননীতি।

দ্বিতীয়ত, শাসনতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হইলে তাহা কেবল বাংলাদেশের জন্যই প্রযোজ্য হইবে না ; পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত

অপরাপর প্রদেশও একই অধিকার পাইবে। এবং তাহা হইলে শোষক গোষ্ঠীর 'দোহন-নীতি'র অপমৃত্যু ঘটিবে।

পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, প্রধানত এই দুইটি কারণেই পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট দিন দিন জটিল আকার ধারণ করিতেছে। ক্ষমতাসীন মহল সমগ্র পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করিয়া আসল সমাধান এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু রাজনৈতিক ওয়াকেবহাল মহল দৃঢ়মত পোষণ করেন যে শাসক গোষ্ঠীর এই পলায়নী মনোবৃত্তি পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করিতে পারে। বিশেষত বিদ্রোহী বাংলার মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী যে অভূতপূর্ব জনতার ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ প্রতিষ্ঠায় যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহা নিস্ফল রাজনৈতিক প্রচারণায় পর্যবসিত হইবে না।

ইয়াহিয়া খাঁর একজন দূত এলেন ঢাকায়। তাঁর নাম এম খুরশিদ। জনাব খুরশিদ হলেন আওয়ামী লীগের পাঞ্জাব শাখার সভাপতি। পশ্চিম পাকিস্তানেও শেখ মুজিবুরের সমর্থনে সক্রিয় ভাবে জনমত গড়ে উঠছে। জাতীয় আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খাঁ), জমায়েত ইসলামী, জমায়েত উলেমা, মুসলিম লীগ (কনভেনসান), মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) প্রভৃতি দলগুলির নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে মুজিবুরকে পরোক্ষে সমর্থন করেন ও ভুট্টোর নীতির বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, জনাব ভুট্টো আগুন নিয়ে খেলা করছেন। তারা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুরের ৪ দফা দাবি মেনে নিতে বলেন। এদিকে জেঃ আসগর খানও মুজিবুরের

দাবি মেনে নেবার দাবি জানান। জনাব খুরশিদ ঢাকায় এসে শেখ মুজিবুরের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। ১১ই মার্চ সকালে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে শেখ মুজিবুরের একটি বিবৃতি প্রচার করা হয়। এই বিবৃতিতে মুজিবুর বলেন, সামরিক প্রশাসনের বিপর্যয়কর নীতি বাংলাদেশে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। বিদেশীদের চলে যেতে বাধ্য করছে। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, কোন রকম হুমকির কাছে বাংলা দেশের মানুষ নতি স্বীকার করবে না। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের মার্শাল ল শাসক বৃহস্পতিবার ১১ই মার্চ এক হুকুমনামা জারী করে হুঁশিয়ারী জানিয়েছেন যে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ফৌজ চলাচলে কোন বাধার সৃষ্টি করলে সামরিক আইনে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এই আদেশের পর বাংলাদেশে আশঙ্কা : শেখ মুজিবুরের অসহযোগ আন্দোলন বানচাল করার উদ্দেশ্যে সব রকমের ধর্মঘট কর্মবিরতি নিষিদ্ধ করার প্রস্তুতিতেই আর্মি হাইকমাণ্ডের এই ফতোয়া।

১১৫ নম্বর সামরিক আইন আদেশ। ঢাকা, ১৩ই মার্চ।—যে সকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা খাত হইতে বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহাদের সোমবার হইতে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যথায় তাঁহাদের চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হইতে পারে। পলাতক হিসাবে সামরিক বিভাগে বিচার হইতে পারে। যে সকল বেসামরিক কর্মচারী প্রতিরক্ষা খাত হইতে বেতন পাইয়া থাকেন তাঁহাদের ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ বেলা ১০টায় নিজ নিজ বিভাগের কাজে যোগদান করিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি উপরোক্ত সময়ে তাঁহাদের কর্মস্থলে যোগদান করিতে না পারে তবে তাঁহাকে চাকরী হইতে বরখাস্ত ও পলাতক বলিয়া গণ্য করা হইবে। সামরিক আইনে ২৫নং বিধি অনুসারে এই নির্দেশ অমান্যকারীদের ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে।

সামরিক আইন আদেশ উসকানিমূলক :

—মুজিব

শনিবার রাত্রে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক আইনের আর একটি নির্দেশ জারীতে গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, যে ক্ষেত্রে আমরা জনগণের পক্ষ হইতে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানাইতেছি সে ক্ষেত্রে এই ধরনের আদেশ জারী জনগণকে উসকানি দান ছাড়া আর কিছুই নহে। তিনি বলেন যে, যাঁহারা এই ধরনের আদেশ জারী করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হওয়া উচিত এবং স্মরণ রাখা উচিত যে, জনগণ আর এই ধরনের ভীতির নিকট নতি স্বীকার করিতে রাজী নহে।

তিনি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি এই ধরনের উসকানিমূলক তৎপরতা হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, জনগণ এই ধরনের ভীতির মুখেও তাহাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখায় দৃঢ় সংকল্প, কারণ তাহারা জানে যে, ঐক্যবদ্ধ জনতার মোকাবিলার শক্তি কাহারও নাই।

সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে ওয়ালী খান : শেখ মুজিবের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে

ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান শনিবার ঢাকায় বলেন যে, অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের দাবির প্রতি তাঁহার পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। শনিবার করাচী হইতে ঢাকা আগমনের পর বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট জনাব ওয়ালী খান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ

দলের নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সহিত আলোচনা করার ও বাংলাদেশের ক্রম অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য তিনি ঢাকা আগমন করিয়াছেন। তিনি জানান যে, রাজনৈতিক সংকট বর্তমানে যে স্তরে পৌঁছিয়াছে তাহাতে দেশের সংহতিই বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

মুজিব-ওয়ালী বৈঠক

রবিবার তিনি শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া সাংবাদিকদের আভাস দেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের পর হইতে শেখ মুজিবের সহিত তাঁহার কোন সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

জনাব ওয়ালী খান বলেন যে, দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার দল সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে এবং অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবির প্রশ্নে তাঁহার বিন্দুমাত্র দ্বিমত নাই।

তিনি জানান যে, লণ্ডনে অবস্থান কালে সেখানকার ডাক ধর্মঘটের দরুণ তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন কিছুই জানিতে পারেন নাই। তবে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের একটি জরুরী বার্তা পাইয়াছিলেন।

দেশের বর্তমান সঙ্কট নিরসনের উপায় সম্পর্কে জনাব ওয়ালী খানের মতামত জানিতে চাওয়া হইলে তিনি বলেন যে, ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়। তিনি জানান যে, শেখ মুজিবের সহিত আলোচনার জন্য তিনি খোলা মনে আগমন করিয়াছেন। জনাব ওয়ালী খানের সহিত পশ্চিম পাকিস্তান ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক ও নবনির্বাচিত এম এন এ জনাব গাউস বখশ বেজেঞ্জোও ঢাকা আগমন করিয়াছেন।

১৩ই মার্চ ১৯৭১ সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসকে (ই পি আর) নিরস্ত্র করার কাজ শুরু হয়। ই পি আর-এর অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশঙ্কাতেই পাক সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। ঢাকার সিভিল লাইন অঞ্চলে এক সংঘর্ষে সৈন্যদের গুলি চালনায় কয়েকজন ই পি আর বাহিনীর লোক নিহত হয়। আহতও হয় অনেকে। ই পি আর বাহিনীর অনেককে ক্যান্টনমেণ্টে এনে বন্দী করে রাখা হয়। বন্দী ই পি আর বাহিনীর লোকেরা ধ্বনি তোলেন "জয় বাংলা"। মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, যতদিন না বাংলাদেশের মানুষ তাঁদের স্বাধিকার অর্জন করছেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন চলবে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেকগুলি জাহাজ সৈন্য বোঝাই হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পথে রওনা হয়েছে। বঙ্গীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি এক আবেদন জানিয়ে বাঙালীদের পাকিস্তানী পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। এদিনের আর একটি সংবাদ ইয়াহিয়া খা করাচী থেকে ঢাকার পথে রওনা হয়েছেন

১৫ই মার্চ বাংলাদেশের বুক চিরে এক নূতন সূর্যের রক্তিম আভা দেখা দিল। সোমবার সকালে মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ প্রশাসনভার তিনি নিজের হাতে গ্রহণ করলেন। ৩৫টি নির্দেশনামা জারী করে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর স্বশাসন কায়েম করলেন। মুজিবুর ঘোষণা করলেন, তাঁর দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, জাতীয় পরিষদে তার দলের প্রধানতার ভিত্তিতে তিনি বাংলাদেশের ৭ কোটি ৫০ লক্ষ অধিবাসীর কল্যাণের জন্য দেশের শাসনভার হাতে নিলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করার অর্থ বাংলাদেশের মুক্তি। সকালে

মুজিবুরের ঘোষণা প্রচার হল, বৈকালে ইয়াহিয়া খাঁ করাচী থেকে ঢাকা পৌঁছলেন। কয়েক হাজার সামরিক বাহিনীর লোক ইয়াহিয়া খাঁকে বিমান বন্দর থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনে নিয়ে যান। ইয়াহিয়া খাঁ যে পথে যান, সে পথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল সামরিক বাহিনী। গুলি চলল জনতার উপর, একজন রিক্সাওয়ালা মারা গেল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁকে বিমান বন্দরে স্বাগত জানালেন টিক্কা খান। মুজিবুর রহমান তাঁর ৩৫ দফা নির্দেশ জারী করে বলেন, ইসলামাবাদ সরকারের এই অবস্থা মেনে নেওয়া উচিত। নির্বাচনের পর নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। আমরা এই সংখ্যাধিক্যের দরুণ সারা দেশের প্রকৃত ক্ষমতার সূত্র। পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা ৩৫টি নির্দেশনামা কার্যকরী করে স্বশাসন ব্যবস্থা নেবে। এই নির্দেশনামার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার ও আধা-সরকারী অফিস আদালতে ধর্মঘট চালাবার নির্দেশ জারী হয়েছে। অফিস না খুলে ডেপুটি জেলা কমিশনারদের, মহকুমা অফিসারদের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রে মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ কর্মীরা পুলিশকে সাহায্য করবেন।

(নির্দেশনামায় আরও বলা হয়েছে যে, বন্দর কর্তৃপক্ষরা বন্দরে জাহাজ আসা এবং বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার বিষয়ে কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কোন সামরিক বাহিনীর অবতরণ অথবা সামরিক দ্রব্যাদি উঠানো নামানো সম্পর্কে কোনপ্রকার সহযোগিতা করা চলবে না। ডাক ও তার বিভাগ কেবলমাত্র 'বাংলাদেশ'-এর অভ্যন্তরে চিঠি-পত্র, টেলিগ্রাফ এবং মনিঅর্ডার বিলি করার জন্য কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন। বিদেশে চিঠিপত্র ও তারবার্তা সরাসরি পাঠানো চলবে।)

তিনটি সামরিক ছাউনিকে মুজিবের ঘোষণার আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি ছাউনি হল ঢাকায়, কুমিল্লায় এবং যশোরে। যশোর ঢাকা থেকে ২৭০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে। শেখ মুজিবুর সকল পূর্ব পাকিস্তানীকে সর্বশক্তি দিয়ে সম্ভাব্য সকল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ও সর্বস্ব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানান।

যে ৩৫টি নির্দেশনামা জারী করা হয়েছে তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আয়কর আদায় স্থগিত। সকল কেন্দ্রীয় শুল্ক বাবদ অর্থ পাঠানো বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের রাজস্ব খাতে সকল প্রাদেশিক কর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের টেলিপ্রিণ্টার লাইন সোমবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বেলা ২৷৷টা থেকে ৩৷৷টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা খো রাখার জন্য আদেশ জারী করা হয়েছে। এই সময় ব্যাঙ্কগুলি তাদের বার্তা বিনিময় করতে পারবে।

রেডিও ও টেলিভিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকল বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ এবং জনগণের আন্দোলনের সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। অন্যথায় যাঁরা এই সব সংস্থায় কাজ করেন তাঁরা সহযোগিতা করবেন না। নির্দেশে বলা হয়েছে, খাদ্যশস্যের আমদানি, বণ্টন, গুদামজাত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানোর বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

সকল প্রাদেশিক ও স্থানীয় কর সংগ্রহ করে 'বাংলাদেশ' সরকারের রাজস্ব খাতে জমা দেবার নির্দেশ জারী করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সংগৃহীত পরোক্ষ কর প্রদেশের দুটি বাঙালী ব্যাঙ্ক—দি ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল এবং দি ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে জমা দিতে হবে। পুনরায় নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত

আয়কর আদায় স্থগিত থাকবে। ব্যাঙ্কগুলিকে প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা করে খোলা রাখতে বলা হয়েছে। সকল বেসরকারী বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থাগুলিতে স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম চালাতে বলা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষায়তনগুলি বন্ধ থাকবে। নির্দেশনামায় ভবনশীর্ষে কালো পতাকা ওড়াবার আদেশ বলবৎ রাখা হয়েছে। শেখ মুজিবুর সারা বিশ্বের স্বাধীনতা প্রেমিকদের কাছে এবং স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন বিশ্বের সেই সকল মানুষের সমর্থন কামনা করে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যারা ষড়যন্ত্র করে শক্তির দ্বারা আমাদের শাসন করতে চেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের জনগণ সংঘবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে কি ভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয় তার প্রমাণ রেখেছেন। বাংলাদেশের মানুষের এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা যাবে না।

আমাদের পদানত করা যাবে না, কারণ প্রয়োজন হলে আমরা মরণকে বরণ করতে প্রস্তুত। কারণ আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে আমাদের বংশধররা মর্যাদার সঙ্গে এক স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের জীবনযাপন করতে পারবে।

শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রতিটি নরনারী ও শিশু আজ উন্নত শিরে দাঁড়াতে পারছেন। যাঁরা ভেবেছিলেন চরম শক্তি প্রয়োগের দ্বারা আমাদের দাবিয়ে রাখা যাবে তাঁরা ভুল করছেন। আজ বাংলা দেশের সকল স্তরের মানুষ—অফিসের কর্মী, কারখানার শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র—সবাই নির্দ্বিধায় এটা প্রমাণ করেছেন যে, আত্মসমর্পণের পরিবর্তে তাঁরা মৃত্যুবরণে প্রস্তুত।

আজ সারা দেশবাসী তাঁদের সংকল্পে ঐক্যবদ্ধ। তাঁরা জানাচ্ছেন সামরিক শাসনের কাছে তাঁরা নতিস্বীকার করবেন না। অতএব আমি সকলের কাছে আবেদন জানাই, বিশেষ করে যাঁদের কাছে সর্বশেষ সামরিক হুকুম জারী করা হয়েছে, তাঁরা যেন ভীতি

প্রদর্শনের কাছে নত না হন। সারা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের পিছনে রয়েছেন। [ইউ. পি. আই]

(ঢাকায় এসেছেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। সঙ্গে এসেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেঃ আবদুল হামেদ, প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেঃ পীরজাদা, মেজর জেঃ ওমর, আরও ছয়জন ব্রিগেডিয়ার। টিক্কা খান তো আগে থেকেই আছেন। টিক্কা খান সেই ব্যক্তি যিনি ১৯৬৪ সালে বেলুচিদের নৃশংসভাবে দমন করেছিলেন এবং ১৯৬৫ সালে কচ্ছের লড়াইয়ের সময় বলেছিলেন, "আমি একাই বোম্বাই দখল করে নিতে পারি।" কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভবনকে ঘিরে যে সামরিক তৎপরতাই চলুক না কেন, সারা পূর্ববাংলায় নূতন তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে। ঢাকা বেতার কেন্দ্রে সোমবার সকালে শ্রোতাদের শোনানো হয় এক নতুন অনুষ্ঠান-সূচি। এই অনুষ্ঠান-সূচি হল দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। এই অনুষ্ঠান-সূচিতে বলা হয় আমরা এতদিন অন্ধকার যুগে ছিলাম, আমরা এগিয়ে চলেছি, আমরা বীর—মরণকে আমরা ভয় করি না।

বেতারে শ্রুত হল গান—"ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" সেই সঙ্গে শোনা গেল—

"জয় জয় জয় বাংলা
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
মুক্তিধারার সীমানা
জয় জয় জয় বাংলা।"

পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা আজ আর উড়ছে না পূর্ব পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে। প্রতি বাড়ীতে, প্রতি ঘরে জাতীয় পতাকার স্থান নিয়েছে কালো পতাকা। ঢাকার ১৬ হাজার

সাইকেল রিকসার উপরেও ঐ কালো পতাকা। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের সৈন্যবাহী ট্রাকগুলো উড়িয়েছে কালো পতাকা। ঢাকার বেতার কেন্দ্র থেকে আজ আর বলা হচ্ছে না—"রেডিও পাকিস্তান ঢাকা", সেখানে বলা হচ্ছে "ঢাকা বেতার কেন্দ্র"। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়েও আর অনুষ্ঠান শেষ হয় না। ১৬ই মার্চ প্রত্যুষে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে শোনা গেল গীতার একটি শ্লোক। পাকিস্তান বেতারে গীতার শ্লোক চমক লাগিয়ে দিল, সেই সঙ্গে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত।

"তোমার দেশ আমার জমি,
আমাদেরই মাটি,
একসাথে মোরা সবাই হাঁটি।"

আর একটি গান—

"দূর আকাশে সূর্যোদয়
আকাশ আলোয় ঝলমল
জয় জয় জয় বাংলা
জয় বাংলা জয়।"

আর একটি গান—

অন্ধকারের দিন পেরিয়ে
পৌঁছেছি আমরা নতুন দিনের
ভোরে।
একতাই মর্যাদা, একতাই শক্তি।
যাত্রা পথের ভয় হয়েছে শেষ।
আমরা এখন নির্ভয়ে, সব বাধা উপেক্ষা
করে এগিয়ে চলব।······আমরা
নতুন পথের দিশারী, আমরা নতুন
দিনকে আলিঙ্গন করি।"

(পাকিস্তানের ২৩ বৎসরের ইতিহাসে মঙ্গলবার সকালে সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট ভবনে কালো পতাকা প্রবেশ করে। এই পতাকাটি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গাড়ীতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেলা ১১টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে যখন যান তখন প্রহরারত পুলিশবাহিনী তাঁকে পূর্ণ মর্যাদায় অভিবাদন করে। প্রেসিডেন্ট ভবনের নিরাপত্তারক্ষায় ভবনের বাইরে পুলিশ এবং অভ্যন্তরে সেনা-বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। ১১টায় প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করিলে জেঃ ইয়াহিয়া খান বারান্দায় নামিয়া আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করেন কিন্তু আলোচনা শেষে বেলা ১॥টায় শেখ মুজিবুর রহমান যখন কক্ষের বাহিরে আসেন তখন প্রেসিডেন্টকে বিদায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে দেখা যায় নাই। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে আলোচনা শেষে দেশ বিদেশের সাংবাদিকদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি মাত্র তিনটি পূর্ণবাক্য উচ্চারণ করেন। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট ভবন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন তাহারা দেশের রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করিতেছেন, আলোচনা চলিতে থাকিবে। সমস্যা এমন নহে যে দু-তিন মিনিটের মধ্যেই সমাধান করা যায়। বেলা ১০টা ৫০ মিনিটে মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে নিজ বাসভবন ত্যাগ করেন। দেশী বিদেশী সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শেখ মুজিব স্মিত হাস্যে জবাব দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং "জয় বাংলা" ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া গাড়ীতে আরোহণ করেন। বেলা ১১টায় বঙ্গবন্ধু তাঁর সাদা 'মাজদা' গাড়ীতে কালো পতাকা উড়াইয়া প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন। গাড়ী হইতে নামিয়া শেখ মুজিব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে দলীয় নেতাদের সহিত মুজিবুরের বৈঠক

জেঃ ইয়াহিয়া খানের সহিত আলোচনায় যোগদানের পূর্বে মঙ্গলবার বেলা ৯টায় নিজ বাসভবনে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে এক বৈঠকে মিলিত হন।

প্রেসিডেণ্টের সহিত আলোচনার পরে দলীয় অপরাপর নেতাদের সহিত আওয়ামী লীগ প্রধান কয়েক দফা আলোচনায় মিলিত হন। রাত সাড়ে আটটায় আওয়ামী লীগ হাই কমাণ্ড রুদ্ধদ্বার কক্ষে পুনরায় আলোচনা শুরু করেন। অধিক রাত পর্যন্ত এই আলোচনা অব্যাহত থাকে।

(উক্ত আলোচনায় দলীয় প্রধানের সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোসতাক আহমেদ, ক্যাপটেন মনসুর আলি, জনাব তাজউদ্দিন আহম্মদ, জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জমান, ডক্টর কামাল হোসেন অংশ নেন বলে জানা যায়।

শেখ মুজিবুর রহমান চরম সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন এ দিন। বললেন, 'আমি যদি আপনাদের মধ্যে না থাকি তাহলেও আপনারা যেন নিজেদের স্বাধিকার অর্জনের এই আন্দোলনে আমার সহকর্মীদের নির্দেশ নিয়ে কাজ করেন।') সম্ভবত প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁর সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে যাবার আগে শেখ মুজিবের মনে পড়েছিল—আমি যদি না থাকি।

কিন্তু তাজউদ্দিন আহমেদ বুঝি শেখ মুজিবুরের এই প্রশ্নের জবাব দিতে এগিয়ে এলেন। তাজউদ্দিন আমেদের বক্তব্য ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হল। আমেদ বলেন, 'দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে। জনগণের এই অপূর্ব উৎসাহকে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগিয়ে আমরা জগৎকে দেখতে চাই যে বাঙালীরা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় বিপর্যয়ের মধ্যেই জয়ী হতে জানে।'

(পূর্ববঙ্গ ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্র পরিষদ ঘোষণা করেছেন, পূর্ববঙ্গ একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যার নাম 'বাংলাদেশ'। এই দিন অস্ত্র বোঝাই একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছলে ডক কর্মীরা জাহাজটি খালাস করতে অস্বীকার করে। অপর দিকে প্রায় ৮ শত বাঙালী সৈনিককে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।) ন্যাশানাল শিপিং কর্পোরেশন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালী সৈন্য বহন করতে অস্বীকার করে।

(বুধবার ১৭ই মার্চ—আজ মুজিবুরের ৫৩তম জন্মদিন। ঢাকা বেতার কেন্দ্রে তাঁকে মুক্তিদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।) দ্বিতীয় দিনে শেখ মুজিবুর যখন প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তখন হাজার হাজার ছাত্র ঢাকার রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিলে ঝড় তুলেছিল। তাদের মুখে ধ্বনি, ইয়াহিয়া ফিরে যাও। মুজিব—কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন আপোস নয়।

বাঙালী তরুণেরা হাজারে হাজারে এসে মুজিবের বাসভবনের সামনে সমবেত হন। এইদিন জেঃ টিক্কা খান এক ঘোষণায় জানান যে, ২রা থেকে ৯ই মার্চ যে পরিস্থিতিতে সামরিক বাহিনী তলব করা হয়েছিল তার তদন্ত করা হবে। এইদিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনা ১ ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল। আলোচনা বৈঠক থেকে ফিরে শেখ মুজিব বলেন, আলোচনা যখন চলছে তখন তিনি কিছু বলবেন না, তবে আওয়ামী লীগের ৪ দফা দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকবে। এই দিন ঢাকা বেতারে বলা হয় বাংলাদেশের জনগণ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নূতন প্রভাত-সূর্যালোকের স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাঁরাই আজ হলেন তাঁদের দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা। তাঁদের নেতা শের-ই-বঙ্গাল শেখ মুজিবুর সাফল্যের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ভাবে সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন।

(বৃহস্পতিবার—শেখ মুজিবুর রহমান টিক্কা খাঁর দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিশনকে অগ্রাহ্য করলেন। শেখ মুজিবুর রহমান এই দিন ঘোষণা করলেন, বাংলাদেশ গঠনের নতুন স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

শেখ মুজিবুর বলেছেন, ন্যায্য দাবির জন্য লড়াই চলবে, কোন আপোস নয়। মুজিবুর তদন্ত কমিশন অগ্রাহ্য করেছেন এই সংবাদে হাজার হাজার মানুষ বৃহস্পতিবার মুজিবুরের ধানমণ্ডী বাসভবনের সামনে জমায়েত হয়ে ধ্বনি তোলে, "পরিষদ না রাজপথ —রাজপথ রাজপথ।"

শেখ মুজিব সামরিক বাহিনীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আপনারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলে আগুন জ্বলতেই থাকবে। সেই অগ্নিশিখা থেকে আপনারাও রেহাই পাবেন না।'

শুক্রবার—ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে জয়দেবপুরে পাকিস্তানী ফৌজের গুলিতে ২৪ জন নিহত হল, আহত হল বহু ব্যক্তি। এই দিন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে মুজিবের ৩য় দফা বৈঠক হল। ৯০ মিনিট ধরে এই বৈঠক চলে। বৈঠক থেকে বেরিয়ে মুজিব বলেন, 'যে কোন পরিণামের জন্য আমি প্রস্তুত।' আজকের বৈঠকে ইয়াহিয়া ও মুজিবুর ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর দলের সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মনসুর আলী, ডঃ কামাল হোসেন, নজরুল ইসলাম, মুস্তাফা আমেদ ও জনাব তাজউদ্দিন।)

চট্টগ্রামে মৌলানা ভাসানী

জনগণ রাজনৈতিক দলগুলির চাইতে এগিয়ে আছে

চট্টগ্রাম ২০শে মার্চ—ন্যাপ প্রধান মৌলানা আবদুল হামিদ খান বলেন, স্বীয় দাবির জন্য ত্যাগ স্বীকার বোধের ব্যাপারে সকল রাজ-

নৈতিক দলের চাইতে জনসাধারণ অনেক বেশী এগিয়ে আছে। তাই সবগুলি রাজনৈতিক দলের উচিত জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরা।

মৌলানা ভাসানী শনিবার রাত্রে পাঁচ লাইশে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমাধানের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করার জন্যে আবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিয়েছেন। স্ব-স্বাধীন পূর্ব বাংলার দাবি জানিয়ে মৌলানা বলেন যে, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যে পাওনা তা নিষ্পত্তি করবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চালু রাখার চেষ্টা করবে।

মৌলানা বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি এই দাবি মেনে না নেন তবে তিনি পূর্ব বাংলায় ভিয়েতনামের চাইতেও বেশী জোরদার আন্দোলন শুরু করবেন।

তিনি আরও বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এতে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করবে।

(মৌলানা বলেন যে, শেখ মুজিব যদি বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তাহলে বিশ্বের সকল স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে স্বীকৃতি দেবে।)

গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং একসের খাদ্য শস্যও যাতে দেশের বাইরে পাচার হতে না পারে সেই ব্যবস্থা করার জন্য জনগণের প্রতি মৌলানা আবেদন জানিয়েছেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানিয়ে মৌলানা কঠোর পরিশ্রম, অধিক খাদ্য উৎপাদন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতা সাধন, খাদ্য উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে

ঘাটতি এলাকায় খাদ্য-শস্য চলাচলের ব্যবস্থা করার জন্যে আবেদন জানিয়েছেন।

জয়দেবপুরে অসামরিক লোকেদের গুলি করে হত্যা করার কথা উল্লেখ করে মৌলানা বলেন যে, নিরস্ত্র লোকেদের হত্যা করা কোরাণের শিক্ষার পরিপন্থী। পূর্ব বাংলার জনগণের উপর অস্ত্র ব্যবহার না করার জন্য তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেন যে, আমাদের জনগণের উপর ফের হামলা চালানো হলে তার চ্যালেঞ্জ করা হবেই। শাসকচক্র যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে তাহলে মুক্তি সংগ্রামরত জাতিগুলোর পথই তারা বেছে নিতে বাধ্য হবে।

মার্শাল ল তুলে নিতে হবে

পশ্চিম পাকিস্তানের তিনজন নেতা এখন ঢাকায় আছেন। আগে থেকেই আছেন সীমান্তের খান ওয়ালী খান। এখন এসেছেন মিয়া মমতাজ দওলতানা আর মুফতি মাহমুদ। মুফতি মামুদ সাহেব সম্প্রতি লাহোরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলোর এক যুক্ত বৈঠক করে এসেছেন। সে বৈঠকে ভুট্টো সাহেবের দল ও কাইয়ুম খানের দল যোগ দেয় নি। অন্য যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা বহু শলা পরামর্শ করে এসেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় এখন তাঁরা যুক্তভাবে বসবাসের শেষ চেষ্টা হিসাবে বঙ্গবন্ধুর ফর্মূলা প্রয়োজন হলে পুরোপুরি মেনে নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতিই গ্রহণ করেছেন।

এদিকে ওয়ালী খান সাহেব চার-পাঁচ দিন এখানে সরেজমিনে অবস্থাদি পর্যালোচনা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি অবশ্য চান যে সবাই মিলে সোজা হেঁটে জাতীয় পরিষদে হাজির হবেন, সেখানেই যা হয় ফয়সালা করা যাবে। এই গণহত্যা ও ষড়যন্ত্রের

পর বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড অসহযোগ চলছে তাতে যেখানে বাংলার অধিনায়ক সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিকে পূর্ব শর্ত দিয়েছেন সেখানে সোজা পথে জাতীয় পরিষদে হেঁটে যাওয়া আর সহজ নয়। তাই এখন পশ্চিম পাকিস্তানের এ তিন দলের মধ্যে গুরুত্ব সহকারে গোপন মত বিনিময় শুরু হয়েছে।

মিয়া দওলতানা শনিবার সকালে সাংবাদিকদের বলেছেন, দেশের ঐক্য রক্ষা আর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার—এ দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে সকলকে চলতে হবে। তিনি শেখ সাহেবকে প্রিয় বন্ধু, ভাই ও নেতা বলেও অভিহিত করেছেন। তিনি শেখ সাহেব ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার আগে শনিবার সকালে পশ্চিম পাকিস্তানী অন্যান্য নেতাদের নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে দীর্ঘক্ষণ ধরে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে ওয়ালী খান, জনাব গউস বখশ বেজেঞ্জো, মুফতি মাহমুদ এবং কাউন্সিল লীগের সর্দার শওকত হায়াৎ খান ও ক্যাম্বেলপুরের এম এন এ পীর সাইফুদ্দিন অংশ গ্রহণ করেন।

এ তিন দল যদি একমত হয়ে অবশেষে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রে আপন আপন সত্তা নিয়ে একসাথে থাকার স্বার্থে বাংলাদেশের একক বক্তব্যে শরিক হন তবে কাইয়ুম খান ভিন্ন পথ ধরতে পারবেন না বলে এঁদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গেছে। সীমান্তে ওয়ালী ন্যাপ ও মুফতি মাহমুদের দলের মধ্যে ঐক্যফ্রন্ট আপাতত নেই। ফলে কাইয়ুম খান সীমান্তে ক্ষমতাশীল হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে পারছেন। কিন্তু এখানে এই পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় ওয়ালী ন্যাপ ও হাজারভী জামায়াতে সমঝোতা হলে কাইয়ুম খান সে সুযোগও হারাবেন। তাই বাধ্য হয়েই হয়তো তিনি দলে ভিড়তে পারেন।

রাষ্ট্রীয় নীতির সব আলোচনার শেষ কথা হচ্ছে সামরিক আইন প্রত্যাহারের প্রশ্নে অর্থাৎ অন্য কথায় প্রধান সামরিক প্রশাসকের এল এফ ও। তাই সমাধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নিরূপণ।

পশ্চিম পাকিস্তানের এই তিন নেতার ভূমিকাও তাই লক্ষ্যণীয় ব্যাপার।

শান্তিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যান

—বঙ্গবন্ধুর বিবৃতি

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবুর রহমান শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি স্বাধীন দেশের মুক্ত নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য জনগণ যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তাই মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শনিবার এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন, এবারের সংগ্রামে প্রতিটি শহর, নগর, বন্দর ও গ্রামে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বাংলাদেশের দাবির পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ সারা বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করতে পেরেছে। তারা যে ঐক্যবদ্ধভাবে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে পারে বিশ্বের সামনে বাংলার মানুষ আজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি আওয়ামী লীগের নির্দেশের আওতায় থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার কাজে নিরলস পরিশ্রম করার জন্যে সর্বস্তরের জনগণকে—ক্ষেতের চাষী, কারখানার শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নির্দেশসমূহ যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর

মত কাজ করেছেন সেই সব ছাত্র, শ্রমিক এবং কর্মচারী সংগঠনগুলোর সদস্যদের আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের জনগণ প্রমাণ করেছেন তাঁরা সুচারুভাবেই তাঁদের নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

তিনি উসকানিমূলক তৎপরতা থেকে বিরত থাকার জন্য ধ্বংসাত্মক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, জনসাধারণের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটানো অব্যাহত রাখার স্বার্থেই অর্থনৈতিক তৎপরতা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের জনগণকে কঠোর শৃঙ্খলা পালন করতে হবে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, জনাব শাজাহান সিরাজ, জনাব আসফ আবদুর রব ও জনাব আবদুল কুদ্দুস মাখন শনিবার সংবাদপত্রে একটি যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম ঢাকায় বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের চারজন সদস্যের যে কোন একজনের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। আমরা বহুবার পত্রিকার মাধ্যমে, বিবৃতিতে বলেছি যে সংগ্রাম পরিষদের নামে যেন কোন চাঁদা দেওয়া না হয়। আমাদের কোন চাঁদার প্রয়োজন হলে সংগ্রাম পরিষদের চার সদস্য একত্রে চাঁদা সংগ্রহ করতে যাবো। একজনের নামে চাঁদা আদায় করতে গেলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট লোক প্রতারক এবং তাকে পুলিশে সোপর্দ করবেন।

অসহযোগ আন্দোলন
মুক্তি আন্দোলন লক্ষ্যে পৌঁছবেই

বীর বাঙালীর দৃপ্ত পদচারণায় রাজধানী ঢাকা টলমল হয়ে কাঁপছে। প্রতিদিন চলেছে অসংখ্য মানুষের দৃপ্ত মিছিল। সকলের মুখে একই ধ্বনি "শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না। স্বাধীন কর স্বাধীন কর, বাংলাদেশে স্বাধীন কর। আপোস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম।" দ্রুত পায়ে মিছিলের পর মিছিল এগিয়ে চলে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের দিকে, সেখান হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে। বাংলার মুক্তি সংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচণ্ড অসহযোগ আন্দোলনের ঊনবিংশতিতম দিবসে শনিবার হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। মিছিলের প্রতিটি মুখই ছিল সংগ্রামী চেতনায় ভাস্বর। তাদের চোখ থেকে আগুনের কণা ঠিকরে পড়ছে। মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তারা রাস্তায় নেমেছে। প্রতিটি মানুষ আজ সংগ্রামের এক একজন বীর সেনানী আর প্রতিটি গৃহ এক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে। যারা দুর্জয় শপথ নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কর্মচারী, সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের কর্মচারী, ঔষধ শিল্প কর্মচারী, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, প্রাক্তন সৈনিক ও নৌবাহিনীর কর্মচারী এবং টেলিভিশনের কর্মচারী-বৃন্দ। সকলেই এই গণ আন্দোলনকে সফল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে এবং এজন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের শপথ নেয়।

আওয়ামী লীগ প্রধানের বাসভবনের সামনে গতকাল বহু মিছিল যায়। এসব মিছিলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে তিনি বলেন যে, বাংলাদেশকে উপনিবেশ ও বাজার হিসাবে রাখার দিন শেষ হয়ে গেছে।

তিনি দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন যে, সাড়ে সাত কোটি বাঙালী বর্তমান যে মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত তারা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছবেই।

তিনি বলেন, যে জাতি রক্ত দিতে জানে তাদের কোন বাহিনীই দাবিয়ে রাখতে পারে না—সেনাবাহিনী যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমি শেষ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে থাকব। তিনি বলেন, আমাদের পেশ করা দাবি যদি গৃহীত না হয় তাহলে সংগ্রামের জন্য আপনাদের তৈরী থাকতে হবে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এক—জয় তাদের অনিবার্য।

২৩শে মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ ছুটি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শনিবার ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, ইতিমধ্যে ঘোষিত ব্যাখ্যাসহ সমস্ত নির্দেশ এবং নতুন কোন নির্দেশ সাপেক্ষে ১৪ই মার্চ ঘোষিত কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে এবং ২৩শে মার্চ (লাহোর প্রস্তাব দিবস উপলক্ষে) সারা বাংলাদেশে ছুটি পালিত হবে।

স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগামী ২৩শে মার্চ প্রতিরোধ দিবসে সকাল ছয়টায় বাংলা দেশের প্রতিটি সরকারী বেসরকারী অফিস আদালত ও বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ভাসানি ন্যাপ

মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক আহূত ২৩শে মার্চ স্বাধীন 'পূর্ব বাংলা দিবস' পালনের প্রস্তুতি হিসাবে শনিবার নর্থ সাউথ

রোড, বায়তুল মোকাররম গুলিস্তান, নওয়াবপুর রেলগেট, ঠাটারী বাজার রাস্তায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল পথসভায় জনাব আবদুল হামিদ সিরাজুল হক, আবদুল খালেক অ্যাডভোকেট, শেখ মনিরুজ্জমান, শাখাওয়াত মতিন, আবদুস সামাদ এবং নাজির আহম্মদ প্রমুখ ন্যাপ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

জাতীয় শ্রমিক লীগ

জাতীয় শ্রমিক লীগের স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ ২৩শে মার্চ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য বর্জনের সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।

[দৈনিক পাকিস্তান—২১শে মার্চ, ১৯৭১]

শনিবার ২০শে মার্চ—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবুরের চতুর্থ দফা আলোচনা হল। আলোচনা চলল দু ঘণ্টা ধরে। এই আলোচনায় মুজিবুরের সঙ্গে ছিলেন তাজউদ্দিন আমেদ, খালিকোজ্জামান, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, খোন্দকার মুস্তাফা আমেদ, মনসুর আলি ও ডঃ কামাল হোসেন, ইয়াহিয়া খাঁর পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এ আর করনেলিয়াস। এদিকে আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থীরা মঙ্গলবার দেশের সর্বত্র প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতি বাড়ীতে নূতন বাংলা দেশের পতাকা তুলতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ছাত্র নেতারা এক যুক্ত বিবৃতিতে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ না করার জন্য সমস্ত বিদেশী রাষ্ট্রগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছে। তাঁরা বলেছেন, অস্ত্র বিদেশী রাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য, আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ দমনের জন্য নয়।

জয়দেবপুরের গুলি চালনায় ৪০ জন নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা করায়

শেখ মুজিবুর রহমান এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, সরকার যদি মনে করে থাকেন যে এইভাবে গুলি করে মানুষ হত্যা করে জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারবেন তবে তাঁরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। তিনি বলেন, দেশ বর্তমানে যে রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন তার সমাধান শান্তিপূর্ণ ভাবে হতে পারে। কিন্তু ধৈর্য ও সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে। জয়দেবপুরের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঘটনার ঠিক পরেই কারফিউ জারী করে মৃত ও আহতদের সরিয়ে আনবার কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন সামরিক প্রশাসকেরা ঘোষণা করেছেন যে সৈন্যদের ব্যারাকে পাঠানো হয়েছে তখন সৈন্যরা কি করে বাজার ও অন্যান্য অঞ্চলে থাকতে পারে তা বোধের অগম্য। এই রকম পাশবিক শক্তির প্রয়োগে বাংলার জনগণকে দাবিয়ে রাখার দিন ফুরিয়ে গেছে। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছে। তারা তাদের অভীষ্ট স[illegible]ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

এইদিন করাচীর খবর—জনাব ভুট্টো ঢাকায় রওনা হচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন ১০ জনের একটি প্রতিনিধি দল।

(রবিবার ২১শে মার্চ—ভুট্টো ঢাকায় এলেন। কড়া নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে ভুট্টোকে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টো ঢাকা পৌছানো মাত্র হাজার হাজার যুবক ও ছাত্র ভুট্টোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। কয়েক হাজার ছাত্র ছোরা ও তরোয়াল নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে থাকে। তাদের মুখে ধ্বনি, 'ব্রেকফাস্টের জন্য ভুট্টোকে চাই।') ভুট্টো ঢাকা পৌছেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং উভয়ের মধ্যে নিভৃতে বৈঠক হয়। এইদিন শেখ মুজিবুরের সঙ্গেও প্রেসিডেন্টের এক বৈঠক হয়। 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার পর শেখ মুজিবুর সাংবাদিকদের বলেন, বাংলা[illegible]শের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলবে। বাংলা দেশের

মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছেন। আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচতে চাই। এদেশ আর কারও উপনিবেশ হিসেবে গণ্য হতে নারাজ।)

ভুট্টোর ঢাকায় আগমন

(২১শে মার্চ বিকেল ৫টায় দলের অন্য ১১ জন নেতা সহ ভুট্টো ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। ভুট্টোর ঢাকা আসার গোপন সংবাদ জানতে পেরে তেজগাঁ বিমান বন্দরের আশেপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড় হয়। এদের অনেকেরই হাতে ভুট্টো বিরোধী ফেস্টুন ছিল। জনসাধারণকে বিমান বন্দরের ধারে কাছেও আসতে দেওয়া হয়নি। কারণ এর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই সারা বিমান বন্দর এলাকা সশস্ত্র সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। কোন সংবাদদাতাকেও বিমান বন্দর এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হয় নি। বিশেষত গণহত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা যে কালো ব্যাজ ধারণ করে-ছিলেন তাঁদের কাউকেই বিমান বন্দরের সীমানায় এক কদমও আসতে দেওয়া হয়নি। বিমান থেকে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যবাহিনীর কঠোর পাহারায় একটি কালো মার্সিডিজ বেনজ গাড়ীতে ভুট্টোকে ওঠানো হয়। পিছনের সিটে ভুট্টোকে মাঝখানে বসিয়ে তার দুইপাশে দুই জন দেহরক্ষী ২টি স্টেনগানের নল গাড়ীর জানলার দিকে তাক্ করে রেখে দ্রুতগতিতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের দিকে চলে যায়।

ওইসময় আশেপাশে অপেক্ষমান মানুষ ভুট্টোবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন। হোটেলে পৌছনোর পর কঠোর পাহারায় ভুট্টোকে হোটেলের করিডোর দিয়ে লিফটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। লিফটে তোলার পর বেশ কিছু সময় লিফটের দরজা বন্ধ না হবার দরুন সবাই বিশেষ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঐ সময় ভুট্টোবিরোধী স্লোগান চরমে ওঠে। ক্ষিপ্ত জনতা চার পাশ হতে জুতো, স্যাণ্ডেল

ভুট্টোর মাথায় মারে। ঐ সময় ভুট্টোকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখ কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছিল। পাঁচ মিনিটের পর লিফটের দরজা বন্ধ হলে ভুট্টো উপরে চলে যান। এর পরও অনেকক্ষণ বিভিন্ন স্থান হতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী হোটেলের আশেপাশে দাঁড়িয়ে ভুট্টোবিরোধী স্লোগান দেয়। ওই দিন ইণ্টার-কন্টিনেন্টাল হোটেলের সমস্ত বাঙালী কর্মচারী স্বাধীন বাংলার প্রতীক ব্যবহার করেন। সামরিক কর্মচারীরা তা খুলে ফেলার জন্য পীড়াপীড়ি করলে সমস্ত কর্মচারী কাজ বয়কটের হুমকি দেন এবং ওই সব সামরিক কর্মচারী প্রতীক খুলে ফেলার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে।

পরদিন শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হলে জনগণের উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়। ঐ বৈঠক সম্বন্ধে শেখ মুজিবুর বলেন, 'আমিও ঢাকায় এবং প্রেসিডেণ্টও ঢাকায়, কাজেই আমরা যে কোন সময়েই একসঙ্গে মিলিত হতে পারি। এতে সন্দেহের কিছু নেই।'

ইতিমধ্যেই অন্য সব দলের নেতারাও প্রেসিডেণ্টের আমন্ত্রণে ঢাকায় এসে প্রেসিডেণ্ট এবং শেখ মুজিবুরের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। ইতিমধ্যে ঢাকা থেকে ২৭ মাইল উত্তরে জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনীর গুলিতে ৫ জন নিহত হওয়ার ফলে আলোচনায় কিছুটা গরম হাওয়ার সৃষ্টি হয়। প্রেসিডেণ্ট এই ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেন।

২৪ তারিখের মধ্যে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতারা (কেবল ভুট্টোর দলের পাঁচ জন ব্যতীত) করাচী চলে যান। ২৪ তারিখে ভুট্টো জানান, তিনি ও তাঁর দলের অন্যান্য নেতারা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে শেখ মুজিবের আলোচনার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করেছেন। ওই দিনই প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে আলোচনা শেষ হয়. বাংলার জনগণের তখনও ধারণা ছিল' যে, ২৫শেই

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করছেন। কিন্তু জনগণ এবারও প্রতারিত হন। ওই দিনই গভীর রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে হঠাৎ ঢাকার দিকে দিকে শোনা যেতে লাগল গুলি বোমার আওয়াজ। জানা গেল ইয়াহিয়া আর ভুট্টো গভীর রাতে ঢাকা ছেড়ে পালিয়েছেন নতুন নির্দেশ দিয়ে। [গণশক্তি—৫ই এপ্রিল]

সোমবার ২২শে মার্চ ভুট্টোর উপস্থিতিতে মুজিবুর ও ইয়াহিয়া খাঁর বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকের পর সকলেই আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন। ফলে সব মহলে বেশ কিছু খুশীর ভাব দেখা গেল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করে দিলেন। ২৫শে এই বৈঠক হবার কথা ছিল।

'ইত্তেফাক' সম্পাদকীয় লিখল : "সংকট নিরসনের পথে"।

সোমবার ঢাকায় এই মর্মে আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, রাজনৈতিক সংকট নিরসনের পন্থা চূড়ান্ত করার পদক্ষেপ হিসাবে প্রেসিডেন্ট দুই একদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের এক যৌথ বৈঠকে মিলিত করার চেষ্টা করিতে পারেন। সম্ভবতঃ সেই উদ্দেশ্যেই তিনি কাইয়ুম খানকে তলব করিয়া আনেন। অন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় গণপ্রতিনিধিত্বশীল নেতারা বর্তমানে ঢাকায় রহিয়াছেন। এদিকে গতকাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর এবং জনাব ভুট্টো আলোচনায় অগ্রগতি হইতেছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। চারি দফা পূর্ব শর্ত পূরণ করা না হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়া এ ব্যাপারে শেখ সাহেব যে আপোসহীন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, ইয়াহিয়া ও ভুট্টো উহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়াছেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

সম্ভবত সেই কারণেই অর্থাৎ সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর সহ বঙ্গবন্ধুর দাবি পূরণের ব্যবস্থা' গ্রহণের নিমিত্তই ভুট্টোর উপস্থিতিতে শেখ সাহেবের সঙ্গে বৈঠক চলা কালেই সোমবার প্রেসিডেণ্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিত ঘোষণা করিয়াছেন। যদি শেষ মুহূর্তে ব্যক্তিবিশেষের কারণে অতিনাটকীয় কিছু না ঘটে তবে অচিরেই সামরিক আইন প্রত্যাহৃত এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর ব্যবস্থা গৃহীত হইতে যাইতেছে। আরও জানা গিয়াছে যে শেখ মুজিবের দাবি অনুসারে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পরই নয়া সরকারের রূপরেখা নির্দিষ্ট হইবে। ইতিমধ্যে শেখ সাহেব সোমবার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, 'আমাদের আন্দোলন চলিতেছে। লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'বাংলার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান চায়। কিন্তু উহা না হইলে সংগ্রামের মাধ্যমেই তারা লক্ষ্যে গিয়া পৌঁছিবে।'

বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে আলোচনাকল্পে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সোমবার প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে ৭০ মিনিট স্থায়ী ষষ্ঠ দফা বৈঠকে মিলিত হন। এই সময় জনাব ভুট্টোও উপস্থিত ছিলেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর তিন জনের একই টেবিলে উপবেশন ও আলোচনা এই প্রথম। এই আলোচনা-কালে আর কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এই সময় প্রেসিডেণ্ট ভবনের আশেপাশে পূববর্তী যে কোন দিনের তুলনায় কড়া সামরিক বাহিনীর প্রহরা মোতায়েন ছিল। শেখ মুজিবুরের সমর্থনে ও ভুট্টোর বিরুদ্ধে শ্লোগানরত জনতার কলেবর ছিল সববৃহৎ। শেখ সাহেব প্রেসিডেণ্ট ভবনে পৌঁছাইবার পাঁচ মিনিট আগে ভুট্টো সেখানে প্রবেশ করেন ; বঙ্গবন্ধুর প্রেসিডেণ্ট ভবন ত্যাগের পরে এক ঘণ্টা ভুট্টো সেখানে অবস্থান করেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার পর স্বীয় বাসভবনে ফিরিয়া শেখ সাহেব সাংবাদিকদের আভাস দেন যে, আলোচনার আরও অগ্রগতি হইয়াছে। তিনি বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে নির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হইয়াছি। সেখানে ভুট্টো সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট আমাকে জানান যে তাঁহার সঙ্গে আমার যে সব আলোচনা হইয়াছে তাহা তিনি জনাব ভুট্টোকে অবহিত করিয়াছেন।' এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবুর বলেন, 'আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারি না। আর সেই অনুসারেই প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করিয়াছেন।' আর এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ সাহেব বলেন, 'অগ্রগতি না হইলে আমি আলোচনা অব্যাহত রাখিয়াছি কিসের জন্য।'

প্রেসিডেন্ট ভবন হইতে আলোচনা শেষে বাহির হইয়া আসিলে সামরিক বেষ্টনীর বাহিরে বিপুল জনতা 'জয় বাংলা' ধ্বনির সাহায্যে তাঁহাকে স্বাগত জানান। শেখ সাহেবের প্রস্থানের পর জনতা আবার পূর্বস্থান দখল করে। ঘন্টাখানেক পরে জনাব ভুট্টো বাহির হইয়া আসিলে জনতা তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জনতা চরম ভুট্টোবিরোধী স্লোগান দেয়। অগ্রপশ্চাতে স্টেনগান সজ্জিত সামরিক বাহিনীর গাড়ীর মধ্যস্থলে থাকিয়া ভুট্টো হোটেল ও প্রেসিডেন্ট ভবনে যাতায়াত করেন। জনাব ভুট্টোর দুপাশে বন্দুকের নল উচাইয়া দুজন রক্ষী উপবিষ্ট ছিল। হোটেল প্রাঙ্গনে আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা ভুট্টোর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু কেহই তাঁহার নিকটে যাইতে পারেন নাই। একজন সাংবাদিক ছুটিয়া গিয়া প্রশ্ন করিলে জনাব ভুট্টো সংক্ষেপে জবাব দেন—"প্রগ্রেসিং"।

সোমবার ঢাকায় সর্বাধিক সংখ্যক মিছিল বাহির হয়। বিশেষ করিয়া 'বায়তুল মোকাররম', শহিদ মিনার, নিউমার্কেট এলাকা, মীরপুর রোড মিছিলে মিছিলে ছাইয়া যায়। বস্তুত নিউমার্কেট এলাকা হইতে বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডিস্থ বাসভবন পর্যন্ত দীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত সমগ্র রাস্তা যেন উত্তাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। চৈত্রের নিদাঘ আকাশে জ্বলন্ত সূর্যের দাবাগ্নির তীব্র দাহনে রাস্তার গলিত উত্তপ্ত পীচকে উপেক্ষা করিয়া অগ্নিশপথের হুঙ্কার দিয়া চলে অগনিত মানুষের অন্তহীন মিছিলের স্রোত। সকালের দিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হোটেল ইণ্টারকন্টিনেণ্টালের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই সময় হোটেলের আঙ্গিনায় মেসিনগান স্টেনগানধারী সশস্ত্র সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল। মিছিলকারীগণ ভুট্টো ও সামরিক বাহিনীর গণহত্যা বিরোধের শ্লোগানে ফাটিয়া পড়ে। মিছিলকারীদের মধ্যে অনেককে পায়ের জুতো ও স্যাণ্ডেল উপরে তুলিতে দেখা যায়। একটি দীর্ঘ মিছিলে ভুট্টোর 'কুশপুত্তলিকা' বহন করে আনা হয়। কুশ-পুত্তলিকাটি বিক্ষুব্ধ মিছিলকারীগণ বর্শার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে।

প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান এইদিন এক বাণীতে বলেন, 'জাতিকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাকিস্তান এক ক্রান্তিলগ্নে উপনীত। যখন আমাদের মূল জাতীয় অস্তিত্বই বিপদাপন্ন তখন আসুন আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার দরবারে প্রার্থনা জানাই—তিনি যেন আমাদের সঠিক পথে পরিচালনা করেন।'

মঙ্গলবার ২৩শে মার্চ 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—"এবারের ২৩শে মার্চ"—

সারা দেশে এবারও ২৩শে মার্চ উদ্‌যাপিত হইতেছে। কিন্তু এ এক নবতর ২৩শে মার্চ। নতুন ইহার সাজ। নতুন ইহার সুর। নতুন ইহার ধ্বনি। ২৩শে মার্চ বলিতে মানুষ এতদিন যাহা বুঝিত

তাহা আর নাই, মানুষের সেই ধ্যান ধারণা আমূল বদলাইয়া গিয়াছে। তদস্থলে ২৩শে মার্চ নতুন আঙ্গিকে পরিগ্রহ করিয়াছে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপ, নতুন এক অর্থ। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ইহাকে 'প্রতিরোধ দিবস' রূপে পালনের ডাক দিয়াছেন। শেখ সাহেব ইহাকে সাধারণ সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করিয়া 'লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন দিবস' হিসাবে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানাইয়াছেন। তাই ২৩ বছর ধরিয়া যে ২৩শে মার্চ 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' বা 'পাকিস্তান দিবস' রূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে তাহা আজ উদ্‌যাপিত হইতেছে প্রতিরোধ দিবস রূপে তথা লাহোর প্রস্তাবায়ন দিবস রূপে। বাংলাদেশে সাত কোটি মানুষ অভিন্ন সুরে আজ যে আওয়াজ তুলিতেছে, সে আওয়াজ হইল সকল অত্যাচারের উদ্ধত শিরে বজ্র হানিয়া স্বরাজ ও স্বাধিকার ছিনাইয়া আনার আওয়াজ, সঙীন ও বুলেট প্রতিরোধের আওয়াজ।

শেখ সাহেব এই দিনটিকে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের দিন হিসাবে পালনের যে কথা বলিয়াছেন তাহা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা লাহোর প্রস্তাব কেবল ভৌগোলিক স্বাধীনতারই ছক ছিল না, ছক ছিল জনগণের স্বাধীনতারও। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল স্বাধীনতার নামে আমরা যা পাইলাম, তা কেবল ভৌগোলিক অর্থেই সত্য হইল, দেশের আপামর মানুষের জীবনের কোথাও তার কোন স্পর্শ লাগিল না। স্বাধীনতার নামে মানুষের স্বাধিকার হরণ যেমন লাহোর প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য ছিল না, তেমনি সে প্রস্তাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে কলোনী বানাইবার ও তার কোটি কোটি মানুষকে ক্রীতদাসে পর্যবসিত করারও কোন প্রস্তাবনা ছিল না। কিন্তু ক্ষমতা হাতে পাইবার পর হইতে শাসক গোষ্ঠী ২৩টি বৎসর যাবৎ তাহাই করিয়াছে এবং সংহতির নামে দুই যুগ ধরিয়া গণ-শোষণ, নিপীড়ন ও স্বাধীনতা হরণ কার্যই চালাইয়াছে। একটা ভৌগোলিক

অঞ্চল হিসাবে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির কথা ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলার হতভাগ্য মানুষ সে স্বাধীনতার কোন স্বাদ ভোগ করিতে পারে নাই। জনসংখ্যাগরিষ্ঠ এই অঞ্চলের মানুষেরা স্বাধীনতার যে 'অমৃত' ভোগ করিয়াছে তাহা হইল নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনা। 'ঝুটা আজাদী' এমনি মহিমা যে বাংলার বঞ্চিত বিশীর্ণ মানুষের প্রতিবাদ জানানোর অধিকারটুকুও উহার কল্যাণে হৃত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুত বাক্ স্বাধীনতাই হইয়াছে নব্য ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর হস্তে ফার্স্ট ক্যাজুয়ালটি এবং স্বাধীনতার মূল সনদ লাহোর প্রস্তাব হইয়াছে উহাদের মেসিনগানের মুখ্য-শিকার। তাই রাষ্ট্র পত্তনের পর ২৪টা বৎসরও যাইতে পারিল না। সব কিছু তছনছ হইয়া গেল, এমন কি মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, ধ্যান ধারণার রাজ্যেও সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িল। অতীতের নাম নিশান পর্যন্ত বিলুপ্তির যোগাড়। মূলে ভুল না থাকিলেও থুলে ভুল হইয়াছে এবং সেই ভুলেরই খেসারত দিতে দিতে মানুষকে আজ প্রাণান্ত হইতে হইতেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের স্রোতে যে স্বাধীনতার আগমন, সেই স্বাধীনতার মৌল অঙ্গীকারের সঙ্গেই করা হইয়াছে নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা। যাহারা যত বেশী 'সংহতির' দোহাই পাড়িয়াছে তাহারা তত বেশী 'সংহতির' গোড়া কাটিয়াছে। সংহতির নাম শুনিলে মানুষের প্রাণে জাগে ভয়, বুঝি বা উহা নতুন কোন নিপীড়নের কলাকৌশল। অতএব বাঙালী মানসের আজিকার এই বিস্ফোরণ অকারণ নয়। শাসক-শোষকরাই বাঙালীকে এই পর্যায়ে লইয়া আসিয়াছে এবং এই তুলনাহীন বিস্ফোরণ সংঘটন ও অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছে। এবারের ২৩শে মার্চের ভিন্ন সাজ ও ভিন্ন সুরের জন্য সবাংশে তাহারাই দায়ী। এবারের ২৩শে মার্চ যে সকল প্রশ্ন আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির মোকাবিলা করিতে হইবে, বাস্তবের পটভূমিতে বিচার

করিয়া তার সময়োপযোগী সুষ্ঠু স্থায়ী সমাধান দিতে হইবে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই।

সাত কোটি মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে তখন দাবি আদায় করিয়া ছাড়িব

—শেখ মুজিব

সোমবার স্বীয় বাসভবনের সম্মুখে জমায়েত বিপুল জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন : সাত কোটি মানুষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব। বন্দুক, কামান, মেসিনগান কিছুই জনসাধারণের মুক্তি রোধ করিতে পারিবে না। শেখ মুজিব সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

গতকাল সকাল হইতেই অসংখ্য মিছিল শেখ মুজিবের বাসভবনে একের পর এক আসিতে থাকে এবং বার বারই শেখ মুজিব শোভা-যাত্রীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। প্রতিটি মিছিলই জনতার অধিকার আদায়ের দৃপ্ত শপথে মুখর ছিল।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব শৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশে আন্দোলন চালাইয়া যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রাম ব্যতিরেকে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, যাহারা বাড়ী বাড়ী জোর করিয়া চাঁদা আদায় করিয়া বেড়ায় তাহাদের এই কাজকে গুণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

শেখ মুজিব বলেন : ৭ কোটি মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে তখন আমি অবশ্যই দাবি আদায় করিয়া ছাড়িব। ২৩ বছর মার খাইয়াছি,

আর মার খাইতে রাজী নই। শহিদদের রক্ত বৃথা যাইতে দিব না। প্রয়োজন হইলে আরও রক্ত দিব। কিন্তু এবার সুদে আসলে বাংলার দাবি আদায় করিয়া আনিব। বাংলা দেশকে আর কলোনী ও বাজার করিয়া রাখা যাইবে না। সত্যের জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি। জয় আমাদের অবশ্যই হইবে।'

শেখ মুজিব দাবি আদায়ের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, দেশে জনগণের সরকার কায়েম হইলে অন্যায়ভাবে কাহাকেও আটক রাখা হইবে না।

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব ভুট্টো সোমবার ঢাকায় বলেন, রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসন করিয়া সমঝোতা ও ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য সংশ্লিষ্ট শক্তি শিবিরসমূহ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতেছেন এবং এই প্রয়াস ভণ্ডুল করিয়া দেওয়ার জন্য কোন পক্ষই 'ভেটো' প্রয়োগ করিবে না।

পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জনাব ভুট্টো সোমবার ঢাকায় বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমান সমসাময়িক সঙ্কট নিরসনের জন্য একটি সাধারণ ঐকমত্যে পৌঁছিয়াছেন। এই ঐকমত্যকে জনাব ভুট্টো আরও আলাপ আলোচনার জন্য 'উৎসাহজনক একটি ভিত্তি' বলিয়া বর্ণনা করেন।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রাত সোয়া নয়টায় সাততাড়াতাড়ি আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ভুট্টো বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনের জন্য তিনি নিজে কোন 'ফর্মুলা' পেশ করেন নাই। তবে ইয়াহিয়া-মুজিব 'সাধারণ ঐকমত্য' তাঁহার পিপলস্ পার্টির অনুমোদন বা সমর্থন সাপেক্ষ। সর্বজনগ্রাহ্য একটি সমঝোতা ও ঐকমত্যে পৌঁছার জন্য তাঁহার দল সর্বপ্রকারের প্রয়াস পাইবে বলিয়া তিনি পুনরায় ঘোষণা করেন।

জনাব ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান সম্পর্কিত শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা পূর্ব শর্ত এবং সম্ভবত তার চাইতে বেশী কিছু আমরা বিবেচনা করিতেছি। দেশের জন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থার কথা মনে রাখিয়া অন্তর্বর্তীকালীন একটা ব্যবস্থার কথা আমরা' চিন্তা করিতেছি। তাঁহারা দুইটি শাসনতন্ত্রের কথা ভাবিয়াছেন কিনা জানিতে চাহিলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে চিন্তা করিতেছি।'

জনাব ভুট্টো পুনরায় উল্লেখ করেন যে, জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে বসার আগে আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনীর মধ্যে 'ত্রিপক্ষীয় চুক্তি' প্রয়োজন রহিয়াছে। তিনি মনে করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীও একটা 'পক্ষ'। কারণ, সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা আছে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে তাহাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে হইবে। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব আমি স্বীকার করি, তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা হইতেছে এই যে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত দেশের দুইটি সংখ্যা-গুরু দল আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টিকে সমঝোতা ও ঐকমত্যে অবশ্যই পৌঁছিতে হইবে।

জনাব ভুট্টো জানান যে, সোমবার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁহার ফলপ্রসূ আলোচনা হইয়াছে। তাঁহারা পূর্বাহ্নে প্রেসিডেন্ট ভবনে বৈঠকে মিলিত হন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পৃথক কোন বৈঠক হইয়াছে কিনা জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, শেখ সাহেব যে ধারণা দিয়াছেন সে ধারণার বিপরীত কোন ধারণা আমি দিতে চাহি না।

জনাব ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন যে, 'সাধারণ ঐকমত্যটি' সম্পর্কে তাঁহার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানে যাইতে

পারেন। তবে সে অবস্থায় তিনি খুব তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরিবেন এবং এখানে কিছুকাল থাকিবেন।

বর্তমান পরিস্থিতিকে 'দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক' বলিয়া বর্ণনা করিয়া সঙ্কট নিরসনের জন্য সমঝোতায় পৌঁছার উদ্দেশ্যে জনাব ভুট্টো নতুন করিয়া দৃঢ় বাসনা প্রকাশ করেন। শেখ সাহেবের দাবি দাওয়া তিনি ও প্রেসিডেন্ট আলোচনা করিয়াছেন কিনা জানিতে চাহিলে তিনি 'হাঁ' বাচক জবাব দিয়া বলেন, আমরা এর বেশীও কিছু আলোচনা করিয়াছি।

২৩শে মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস। ১৯৪০ সালে লাহোরে ২৩শে মার্চ তারিখে নিখিল ভারত কাউন্সিল মুসলীম লীগের অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই লাহোর প্রস্তাবটি বিশ্বের মানচিত্রে পাকিস্তানের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর এই দিনটিকে 'পাকিস্তান দিবস' বা 'জাতীয় দিবস' হিসাবে পালন করা হয়।

১৯৭০ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের যুগবাণী পত্রিকায় এই ২৩শে মার্চ দিনটির উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল : "ভুলের মাশুল"।

"বছরে বছরে বিশেষ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তান দিবস উদ্‌যাপন করতে গিয়ে যে আত্মপ্রবঞ্চনার অপরাধে আমরা নিজেদের অপরাধী করে চলেছি তাতে করে লাহোর প্রস্তাব দিবসের কার্যত অমর্যাদাই করা হচ্ছে। লাহোর প্রস্তাবের প্রতিটি ছত্র আদ্যন্ত অস্বীকার করেই আমরা প্রতি বছর লাহোর প্রস্তাব দিবস উদ্‌যাপন করে চলেছি। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এ অধিবেশন এই মর্মে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করছে যে নিম্নোক্ত মৌলিক আদর্শসমূহকে

ভিত্তি হিসাবে না ধরে, অপর যে কোন নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রণীত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী এবং মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

যে সব এলাকা একান্তভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল, প্রয়োজন অনুযায়ী সীমানার রদ বদল করে ঐ সকল এলাকাকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে এরূপ ভাবে পুনর্গঠিত করা হোক যাতে করে তারা দুটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌমের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়।

১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রকাশ্য অধিবেশনে উত্থাপনের পূর্বে প্রস্তাবটি ওইদিন সকালে বিষয় নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে কায়দে আজম স্বয়ং পাঠ করে কমিটির সভ্যদের শোনান, এবং প্রস্তাবটির তাৎপর্যও বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন। তখন তাঁকে এ প্রশ্নও করা হয়েছিল, দুটি স্টেটের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে? এর জবাবে তিনি বলেন, সংবিধান রচনার সময় বিষয়টি স্থিরিকৃত হবে।

১৯৪৫ সনের শেষ ভাগে কেন্দ্রীয় পরিষদের এবং ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে প্রদেশিক আইন পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ আইন পরিষদের মুসলিম আসনগুলিতে একটি মাত্র ইস্যুতে প্রার্থী দাঁড় করান এবং সেই ইস্যুটি ছিল: পাকিস্তান ইস্যু (লাহোর প্রস্তাবের ইস্যু)।

উক্ত নির্বাচনে কেন্দ্রীয় পরিষদের ৩০টি মুসলিম আসনের সব কয়টিই লীগ মনোনীত প্রার্থীগণ পান।

আর প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির মধ্যে বাংলার আইন পরিষদের ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১২টি আসন মুসলিম লীগ অধিকার করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীদের এই সাফল্য, বিশেষ

করে বাংলাদেশে নির্বাচনের প্রশংসনীয় সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল 'লাহোর প্রস্তাব থেকে সঞ্চারিত আশা উদ্দীপনা ও প্রেরণা।' ভারতের মুসলিম জনগণের কাছে লাহোর প্রস্তাব যেন একটি প্রত্যাদিষ্ট প্রস্তাব বলে প্রতিভাত হয়েছিল। এতে ভারতের দুই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষ তাদের স্বাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং মহামুক্তির প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট দেখেছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তাদের সেই লাহোর প্রস্তাবকে পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। কেন্দ্রের ও প্রাদেশিক নির্বাচনগুলির আইন পরিষদ সমাপ্তির পর ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে কায়দে আজম দিল্লীতে কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের নব নির্বাচিত লীগ সদস্যগণের এক কনভেনসান আহ্বান করেন।

১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল তারিখে উক্ত কনভেনসানে সর্বসম্মতি-ক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে পরিষ্কার বলা হয় যে পাকিস্তান একটি মাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। লাহোর প্রস্তাবের ইস্যুতে যাঁরা জয়লাভ করেন আইন পরিষদের সেই সদস্যরা কোন্ অধিকারে সেই লাহোর প্রস্তাবকে সরাসরি অস্বীকার করে একটি নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই। রাজনীতির অ আ ক খ যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে একথা বিদিত যে ১৯৪০ সনের লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত লাহোর প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন কারা। পাকিস্তানকেই গত ২৩ বৎসর যাবৎ লাহোর প্রস্তাবকে বেআইনী ভাবে অস্বীকার করার খেসারত দিতে হচ্ছে। একটানা ২৩ বৎসর যাবৎ ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে হতভাগ্য প্রদেশ আজ ভিখারীতে পরিণত হতে চলেছে।

দ্বি-জাতি থিয়োরির ওপরে ভিত্তি করে যে পাকিস্তান সৌধ নির্মাণ করা হল তার বাস্তব রূপ দেখে কায়েদে আজমের মতন অন্যান্য উপনেতারাও কম চমকিত হন নি। হোসেন সহিদ সুরাবর্দী নাটকের পঞ্চম অঙ্কে অভিনয় করতে গিয়ে দেখলেন—সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে। তিনি তাঁর আত্মীয় ও লীগ সেক্রেটারী আবুল হাসেম, ক্যাবিনেট সহযোগী মহম্মদ আলি (বগুড়া), ফজলুর রহমান (ঢাকা ইউনিভারসিটি) এবং ডাঃ আবদুল খালেককে (নদীয়া) সঙ্গে করে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে 'সভারেন বেঙ্গল' গঠনে তখন ব্যস্ত। গান্ধীজি সে প্রস্তাব বিবেচ্য মনে করেছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক তাপমাত্রা এমন পয়েণ্টে তখন পৌঁছেছে যে বাঙালীরা বা গান্ধীজি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও যা অবশ্যম্ভাবী তা রোধ করতে পারেন নি। কিরণশঙ্কর সেই মুহূর্তে একবার বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে যা শুনেছিলেন তাই সঠিকভাবে সেদিনকার ভারতবর্ষের বিকার দশার অবস্থা নির্ণয় করে। মাউন্টব্যাটেন নাকি কিরণ-শঙ্করকে বলেছিলেন যে, গোটা দেশের মধ্যে কেবল দুটি প্রাণীই দেশ বিভাগ চায় না—এক তিনি (মাউন্টব্যাটেন) এবং অপর জন হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বাঙালীদের সেই শেষ যুক্ত চেষ্টা 'সভারেন বেঙ্গল' কল্পনা কতদূর গড়িয়েছিল তা গান্ধীজির সেক্রেটারী পিয়ারীলাল গান্ধী জীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। গান্ধীজি বলেছিলেন যে, 'সভারেন বেঙ্গল' অথবা পরে যদি বাংলাদেশ পাকিস্তান অথবা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় তবে সে সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হবে কেবল মাইনরিটি হিন্দুদের তিনভাগের দুইভাগ সমর্থন করলে। "It Seems that till last Sarat Bose could not get either Suhrawardy or Moslem League to agree to Gandhiji's stipulation that every act of the

Government—including the decision about Sovereign Bengal are its subesequent joining India or Pakistan—must carry with it the cooperation of at least twothirds of the Hindu minority in the execution and in the legislature what appeared in its place in the amended clauses (of the draft) was an overall twothirds majority."

সাতচল্লিশ সালের ৬ই জুন দিল্লীতে শরৎ বসু 'সভারেন বেঙ্গলের' শেষ খসড়া রদবদল করে গান্ধীজির কাছে পেশ করলেন, কিন্তু তার পূর্বেই লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবর্গ মাউন্টব্যাটেনের দেশ বিভাগ প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলেছেন। 'সভারেন বেঙ্গল' কল্পনা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেল। শরতের সঙ্গে গান্ধীজি এই বিষয়ে যে শেষ পত্রালাপ করেছিলেন, জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর যে আলাপ আলোচনা হয়েছিল, তা সার্থক হয়নি। তাঁদের মতে 'সভারেন বেঙ্গল' কল্পনা চাল মাত্র, হিন্দু ও সিডিউল্ড কাস্টের সদস্যদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা। এমন কি তাঁদের মতে তখন টাকার থলে অবাধে চালনা করা হচ্ছিল সিডিউল্ড কাস্টের ভোট গড়বড় করবার উদ্দেশ্যে। অতএব গান্ধীজির মতে এ প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হওয়া সমীচীন নয়। বিধান সভায় দেশ বিভাগ প্রস্তাব পেশ করবার পূর্বে কারেন্সি নোট থলে ভর্তি করে নবাবজাদা লিয়াকত আলি যে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন সে সংবাদ কলকাতার তদানীন্তন মুসলমান চালিত ইংরেজী দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। পিয়ারীলালের মতে গান্ধীজি 'সভারেন বেঙ্গল' কল্পনা রূপায়ণে আগ্রহী হলেও সুরাবর্দী যে সে কাজে সত্য সত্যি সাহায্য করতে পারেন, এ ভরসা আর করতে পারছিলেন না। **He (Suhrawardy) was playing for high tricks but lacked the courage or the will or**

perhaps both to face up to Quaid-i-Azam who suffered no nonsense in the Moslem League camp and was trying to tread on a thin wire. And Sarat Bose and his friends, with more zeal than prudence, were permitting themselves unwillingly to be drawn into Saheed's desperate gamble."

'সভারেন বেঙ্গল' কল্পনা বানচাল হলেও সুরাবর্দীকে নানা কারণে ভারতবর্ষে কিছুকাল থাকতে হয়েছিল। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মহিমায় কি অবস্থান্তর হতে চলেছে সে সম্পর্কে তখন তাঁর দৃষ্টি সুপ্রসারিত। করাচীতে এগারোই সেপ্টেম্বর তারিখে পাকিস্তান কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লি উদ্বোধনে কায়েদে আজম যেমন স্বয়ং আবিষ্কৃত দ্বি-জাতি থিয়োরি নিয়ে তোবা তোবা করলেন, তেমনি তাঁর কলিকাতাস্থ ৪০ নং থিয়েটার রোডের বাড়ী থেকে লেখা পত্রে সমগোত্রের চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে একই বিষয় নিয়ে আপন মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন।

(সেই পত্রে সুরাবর্দী জানালেন : হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে লঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের কি ভবিষ্যৎ ? এ বিষয়টি নিয়ে তো পূর্বে কোন আলোচনাই আমরা করিনি। আমরা কোন দিনই আশা করতে পারিনি যে বাংলাদেশ বিভক্ত হবে এবং এখানেও অঞ্চল বিশেষে মুসলমানেরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ হবে।) (We are now all thinking every hard as to what should be the position of the minorities, particularly of the minority Moslems in the Hindu majority provinces. We had not thought about it earlier, as we did not expect Bengal to be partitioned and Moslems being reduced to a minority in part of Bengal.)

(সেই দীর্ঘ পত্রে সুরাবর্দী মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আলোচনা করে জানালেন, যদি আমরা ভারতবর্ষে ইসলামিক ঐতিহ্য নিয়ে মোসলেম লীগ নিয়ন্ত্রিত দ্বি-জাতি থিয়োরি নিয়ে বসে থাকি তবে পাকিস্তানের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের হিন্দুদের বিষ নজরে পড়তে হবে। আমি নিজে মুসলমান সম্প্রদায়কে দেশের অন্যান্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার পক্ষপাতী নই অথবা দ্বি-জাতি থিয়োরি যে ধরনের সমাজ গঠন চায় তাও সমর্থন করি না।)

(continue to live as Moslems in the best Islamic traditions connected with Moslem League and holding fast to the two nation theory········I am, therefore, not in favour of adopting an attitude of aloofness dependent upon two nation theory.)

চৌধুরী খলিকুজ্জমান সে চিঠির কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু তাঁর গ্রন্থে তিনিও দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর মন্তব্য করেছেন। সে মন্তব্যে কোনই আবছায়া নেই। তবে সে মন্তব্যের কোন সার্থকতাও ছিল না। দ্বি-জাতি থিয়োরি যা ক্ষতি করবার তা করে ফেলেছে তখন। যখন আগুন জ্বলে উঠেছিল তখন তো প্রধান ইন্ধনদাতা ছিলেন এই দ্বি-জাতি তত্ত্বের আবিষ্কারক মহম্মদ আলি জিন্না এবং তাঁর সমর্থকেরা—যথা হোসেন সহিদ সুরাবর্দী ও চৌধুরী খলিকুজ্জমান! চৌধুরী সাহেবের মন্তব্য হল : "He (Suhrawardy) doubted the utility of the two nation theory which to my mind also had not paid any dividends to us. But after the partition it proved positively injurious to the Moslems of India and on a long view basis of Moslems everywhere. Many of the quaries in Suhrawardy's letter are also offshoots of the

first question concerning the two nation theory. I would have replied to him in detail but certain events intervened."

দ্বি-জাতি থিয়োরি সম্পর্কে ইতিহাসের দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে অতীতের অনেক বিষয়ের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যে দিন থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দু ইংরেজের সমালোচক হ'ল সেদিন থেকেই এই থিয়োরি জন্ম লাভ করেছিল, কেবল এর সুদূরপ্রসারী কর্মক্ষমতা সেদিন অজ্ঞাত ছিল। যখন মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু পরিচালিত আন্দোলন বিশেষ করে ইলবার্ট বিল পর্বের পরে দানা বাঁধতে শুরু করল এবং কংগ্রেস জন্মলাভ করল তখন থেকেই প্রথমে আমীর আলি এবং তিনি বিলেতে চলে গেলে (১৮৮৫-৮৬ সাল) আলিগড়ের সৈয়দ আহমদকে ক্রীড়নক স্বরূপ ব্যবহার করে এ ভাবধারা সিঞ্চিত করা হয়েছে। ধাপে ধাপে যতই পোলিটিক্যাল আন্দোলন জোরদার হতে লাগল ততই শাসককুল পরিচালিত ভেদবুদ্ধি মুসলমান মনকে অন্যদিকে চালিত করেছে। সিপাহী বিদ্রোহে যে মোটামুটি হিন্দু মুসলমান ঐক্য বজায় ছিল এমনকি সে কথা ঘুণাক্ষরেও স্মরণে রাখবার প্রয়োজন বোধ হয়নি। মলে-মিন্টো শাসন-সংস্কার কালে অতি গোপন ব্যবস্থায় বিভেদের বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হল। অবস্থান্তর আনতে গিয়ে লক্ষ্ণৌয়ে আপোস ব্যবস্থাপত্রে (১৯১৬ সাল) বিভেদটাই বড় করে দেখান হল। পরিণামে দেশ বিভাগের দাবি রূপায়ণে দ্বি-জাতি থিয়োরি একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে দাবি মিটলে যখন দৃষ্টি স্বচ্ছ হ'ল তখন প্রথম ধরা পড়ল সর্বনাশের পরিমাণ।

এ সর্বনেশে পরিণতির জন্যে কেবল মুসলমান নেতৃত্বের সমালোচনা নিরর্থক। কারণ অতীতে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল দেশ বিভাগের পূর্বমুহূর্তে তখন তা মহীরুহ। বিশের বা ত্রিশের এমন কি চল্লিশের কোঠাতেও সমস্ত মুসলমান দাবি মেনে নিলেও

এ পরিণাম এড়ান যেত কিনা সন্দেহ। কারণ সমস্ত দাবি দাওয়ার ভিত্তিই ছিল সাম্প্রদায়িক বিভেদের ওপর। মুখে স্বীকৃতি না পেলেও কাজেকর্মে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে যে হিন্দু ও মুসলমান বিভিন্ন গোষ্ঠী। সাতচল্লিশ সালের তেসরা জুন তারিখে কংগ্রেস ও লীগ পার্টিশন ব্যবস্থা স্বীকার করে নিয়ে অতীতের সেই ইংরেজের উসকানিতে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক ভেদধারা সরাসরি এবং সরকারী ভাবে গ্রহণ করল মাত্র। কংগ্রেস নেতৃত্ব এই পরিণতিকে কোন প্রকারে প্রতিরোধ করতে পারতেন কি?

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে পারতেন না এবং সে চেষ্টা অতীতের মতন কেবল ভেদবুদ্ধিই অধিকতর তীব্র করে তুলত। কিন্তু নানা ধরনের অভিজ্ঞতায় লব্ধ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বক্তব্য সঠিক ভাবে (সেই মুহূর্তে দেশের সামনে নানা কারণে ধরা না পড়লেও) অনুধাবন করলে মনে হয় তাঁর নির্দিষ্ট পথে দেশকে এগুতে সহায়তা করলে ভবিষ্যতে হয়ত দেশ বিভাগ ছাড়া অন্য কোন গন্তব্যে পৌঁছতে পারা যেতও বা।

পিয়ারীলাল তাঁর গ্রন্থে একদিকে যেমন শরৎ-সুরাবর্দীর 'সভারেন বেঙ্গল' কল্পনা নিয়ে যে আলোচনা গান্ধীজির সঙ্গে চলেছিল তা বর্ণনা করেছেন, অপরদিকে সে কল্পনা-বিরোধী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বক্তব্যও উদ্ধার করেছেন। সেদিন প্যাটেল-নেহরুর এই বিষয়ের অন্যতম মন্ত্রদাতা ছিলেন তিনি। গান্ধীজির সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ পরিষ্কারভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সভারেন বেঙ্গল' কল্পনা, তাঁর মতে, সাহেবদের মাথায় প্রথম গজিয়ে থাকবে। (Soverign Bengal move was inspired by European vested interests for reasons of their own)

উত্তরে গান্ধীজি জানালেন, কিন্তু সুরাবর্দী তো দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়ে সে কল্পনা রূপায়ন করতে ইচ্ছুক?

শ্যামাপ্রসাদ প্রতি-প্রশ্ন করলেন : 'সভারেন বেঙ্গল' হয়ে যাবার পর যদি হিন্দুরা ভারতবর্ষে এবং মুসলমানেরা পাকিস্তানে যোগদান করতে চায় তখন কি হবে ?

সে প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজি যা বলেছিলেন তাতেই সেই অজানা সম্ভাবনার কথা স্বতই মনে উদয় হয়। গান্ধীজি জানালেন : সে অবস্থা এলে অন্তত ইংরেজের কোন কিছু করবার থাকবে না। দ্বিতীয়ত তাতে জিন্নার দ্বি-জাতি থিয়োরির কোন স্থান থাকবে না। (It would not be participated by a third party on the basis of Zinnhas two nations)

সেদিন এ আলোচনার মর্মার্থ সাধারণের কাছে ধরা পড়েনি। কিন্তু পাকিস্তান-কল্পনা বাস্তব রূপ নেবার পরই এবং ইংরেজের রাজদণ্ড অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কায়েদে আজম ও তাঁর শিষ্য উপশিষ্যদের সেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর নতুন ধরনের মতামত যে ভাবে তড়িৎ-গতিতে এসেছিল তাতে মনে হয় তৃতীয় পক্ষের যুগ যুগ ধরে উসকানি দেবার দরুন যে দ্বি-জাতি থিয়োরির ওপর ভিত্তি করে দেশ বিভাগ ঘটল তা যদি ঠেকান যেত তবে হয়ত অন্য কোন দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা সম্ভবপর হত এবং অন্য কোন সমাধান খুঁজে বের করবার অবকাশ মিলতও বা।

ইতিহাস এত সহজে অতীতকে ভুলতে অথবা নতুন সুযোগ গ্রহণ করতে দেয় না এবং সেদিনও দেয় নি। গান্ধীজি তাঁর মর্মকথা চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতায় জুড়ে রাখলেন : I find myself all alone even the Sardar (Patel) and Jawaharlal (Nehru) think that my reading if partition is agreed upon……they did not like my telling the Viceroy that even if there was to be partition it should not be through British intervention or

under British rule···We may not feel the full effect immediately but I can clearly that the future of independence gained at this price is going to be dark. I pray that god may keep me alive to Witness it."

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শোনবার পর তাঁর বাকরুদ্ধ স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র ভাইসরয়কে লেখেন সে পত্র যেমন অন্য কোন ভাষায়, এমন কি মাতৃভাষাতেও রূপান্তর করা অসম্ভব—কবি নিজেও সে চেষ্টা করেছিলেন—তেমনি গান্ধীজির এই মর্মস্পর্শী শেষ প্রার্থনা ভাষান্তরিত করা অসম্ভব। অশোকের শিলালেখের মতন চিরকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের শেষ পাতা জুড়ে গান্ধীজির এই শেষ প্রার্থনা ভাবীকালের বাঙালীর মনে প্রশ্ন জাগাবে।

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে বাঙালীত্বের ওপর চরম আঘাত হেনে এবং পশ্চিম প্রান্তে পাঠান-ভূমি নিশ্চিহ্ন করবার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে ইংরেজ বিদায় নিল।

[যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়—কালীপদ বিশ্বাস, পৃঃ ৪০১]

সংযুক্ত স্বাধীন বাংলা

[শরৎ বসু ফর্মূলা]

১৯৪৭ সালের ১২ই মে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত একটি খবরে জানান হয় যে, ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি, বাংলায় নূতন মন্ত্রিসভা গঠন এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মুসলিম লীগের প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটি অন্যান্য

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগের পরই শরৎবাবু বাংলার মুসলিম নেতাদের কারুর কারুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলে যে রিপোর্ট বেরিয়েছিল ওই খবরে তা ভ্রান্ত বলে উল্লেখ করা হয়।

শরৎবাবু নাকি মূলত চেয়েছিলেন যে :

(১) বাংলা হবে একটি সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র।

(২) ঐ সাধারণতন্ত্রের জন্য যে সংবিধান রচিত হবে সেই অনুসারে প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও যুক্ত-নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে বাংলার আইন সভা গঠিত হবে।

(৩) এই ভাবে গঠিত বাংলার আইন সভা ভারতের বাকী অংশের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক কী হবে তা স্থির করবে।

(৪) বর্তমান মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা বাতিল করে অবিলম্বে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে।

(৫) বাংলায় সরকারী পদগুলিতে বাঙ্গালীরাই থাকবে এবং সেগুলি হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হবে।

(৬) বাংলায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে ৩০ বা ৩১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান রচনাকারী সংস্থা গঠন করতে হবে। ওই সংস্থা দ্রুত বাংলা সাধারণতন্ত্রের সংবিধান রচনা করবে।

খবরে আরও বলা হয়েছিল যে শরৎবাবু, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় আরও কোন কোন বিষয়ে কথাবার্তা হয় এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয় তখনও বিবেচনাধীন ছিল। অবশ্য সেগুলি সম্বন্ধে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে জানানো হয় যে কোন কোন মুসলিম লীগ নেতার সঙ্গে শরৎবাবুর গোপনে চুক্তি করা সম্পর্কে প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

১৯৪৭ সালের ২০শে মে শরৎবাবু একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন :

ভারত এবং তার অন্তর্গত প্রদেশগুলির ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কী হবে সে সম্বন্ধে আমি গত কয়েক বছর ধরে যথেষ্ট চিন্তা করেছি। ১৯৪৪ সালের ২৯শে জানুয়ারী জেলে বসে আমি আমার ধারণাগুলিকে যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলাম তা হল :

"আমি কল্পনা করি আমার এই দেশ কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের ইউনিয়ন হিসাবে গড়ে উঠবে—এক প্রকাণ্ড মিলনভূমি রূপে এর অন্তর্গত সকল জাতি ও উপজাতির বৈশিষ্ট্যগুলি তার মধ্যে এমন ভাবে মিশে যাবে যার মধ্যে জন্ম নেবে এক নূতন বিশ্ব—যার মধ্যে জাতি, শ্রেণী অথবা ভৌগোলিক সীমানার কোন আড়াল থাকবে না।"

গত কয়েক মাসে বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা সত্ত্বেও আমি আমার ধারণায় অটুট আছি। গত জানুয়ারীতে আমি কী ভাবে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা যায়, বাংলায় এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে ঐক্যমত হতে পারে এবং বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কি হবে সে সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক (এখন ছুটিতে) মিঃ আবুল হাসেম-এর সঙ্গে আলোচনা করতে উদ্যোগী হয়েছিলাম। তার কয়েকদিন পরেই গত ২৬শে জানুয়ারী বেলগাছিয়া ভিলায় আহুত এক অভ্যর্থনা সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারবৃন্দ ও অন্যান্যদের কাছে এক ভাষণে আমি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একথা বলেছি যে, স্বায়ত্তশাসিত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের একটি ইউনিয়ন হিসাবে ভারত গড়ে উঠবে আমি বরাবরই এই মত পোষণ করেছি। আমার বিশ্বাস বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে যদি ভাষার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যস্ত করে সেই অধুনা কথিত প্রদেশগুলিকে স্বয়ংশাসিত সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করা হয়, সেই সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলি সানন্দে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গড়ে তুলবে।

এই ভারতীয় ইউনিয়নে ভারতীয় চিন্তাধারায় ভারতীয়েরা নিজেরা গড়ে উঠবে। আমি সেই ইউনিয়নের দিকে মুখ চেয়ে আছি, বৃটিশ ধারণাশ্রয়ী বৃটিশ তৎপরতায় সৃষ্ট ইউনিয়নের দিকে নয়।

তখন থেকে বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আমার ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনার সুযোগ হয় এবং তার থেকে কিছু বাস্তব প্রস্তাবের উদ্ভব হয়েছে। এই সময়েই বাংলায় এবং দেশের অন্যান্য স্থানে যে সব ঘটনা ঘটে তার ফলে দেশবাসীর এক বিরাট অংশে হতাশার সঞ্চার হয়েছে এবং রাজনৈতিক জগতে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যাঁরা একদা পাকিস্তান ও দেশবিভাগের বিরোধী ছিলেন তাঁরাও আজ এই উভয়েরই সমর্থক হয়ে উঠেছেন। এ সব সত্ত্বেও আমি আগেও যা বলেছি দৃঢ়তার সঙ্গে এখনও তাই বলবো যে, পাকিস্তান মেনে নেওয়া ও দেশবিভাগকে সমর্থন করার অর্থ ভারতের স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগতির পক্ষে আত্মঘাতী হওয়া। এর ফলে বিভক্ত প্রদেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হবে। এখন যে ভাষার বন্ধন রয়েছে তা হবে ছিন্ন এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমাধানের পরিবর্তে আরও তীব্র ও ব্যাপক আকার নেবে। পাকিস্তান বা দেশবিভাগের কথা না বলে বা চিন্তা করে এবং তার দ্বারা সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক শিবিরের জন্ম না দিয়ে আমাদের সম্মিলিত ভাবে বাঁচার ও কাজ করার পথ ও উপায় খুঁজতে হবে। এক জনগণের সরকার গঠনের চেষ্টা করতে হবে। সেই সরকার সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পরিবর্তে জনসাধারণের সাধারণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হবে। আমার মতে ভাষার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রসমূহের সৃষ্টি করা এবং দেশে ঐ সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রগুলির একটি কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন গড়ে তোলার মধ্যেই বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রকৃত মীমাংসার সূত্র নিহিত রয়েছে।

আমাদের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আমরা যেন কিছুতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা চালিত না হই। সাধারণ মানুষের সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতেই আমরা নূতন সমাজতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলবো, সাম্প্রদায়িক বৈরীতার অবসান ঘটাবো। আমি দেশের যুবকদের আহ্বান করছি—তাঁরা যেন আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড বিশ্বাস ও আশা নিয়ে এই বিরাট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা আলো দেখান, সাধারণ মানুষ সেই রাস্তায় হাটবে।"

গভীর পরিতাপের বিষয়, গত ডিসেম্বর থেকে ক্রমাগত অসুস্থ থাকায় আমি আগের মতো রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় থাকতে পারিনি। তবু গত দু সপ্তাহের মতো কিছুটা সুস্থ বোধ করায় আমি অদূর ভবিষ্যতে কাজে নামতে চাই, দেশবাসীকে বোঝাতে চাই যে, যে সমাধানের ইঙ্গিত আমি দিয়েছি সেটাই সঠিক সমাধান।

১৯৪৭ সালের ২২শে মে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার তরফে খুব বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত একটি সংবাদ উদ্ধৃত করে জানানো হয় যে, বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র এবং নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী শরৎবাবু এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কোন কোন প্রখ্যাত নেতার মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে রূপগ্রহণ করেছে।

সেই শর্তগুলি হল :

১। বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। ভারতের বাকী অংশের সঙ্গে কী সম্পর্ক হবে বাংলার স্বাধীন রাষ্ট্র সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে।

২। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে যৌথ-নির্বাচকমণ্ডলী, প্রাপ্ত-বয়স্কের ভোটাধিকার এবং হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার সমানুপাতিক

আসন সংরক্ষণের বন্দোবস্ত সমন্বিত আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা থাকবে। হিন্দু ও তফসিলীভুক্ত হিন্দুদের আপেক্ষিক জনসংখ্যা অনুযায়ী অথবা তাদের মধ্যে যেমন ঐক্যমত হতে পারে সেই মতো আসন বণ্টন করা হবে। নির্বাচকমণ্ডলী ও ভোট হবে বণ্টনাত্মক, পৌনঃপুনিক নয়। নির্বাচনে যে প্রার্থী নিজের সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের শতকরা ২৫ ভাগ ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হয়েছেন বলে ঘোষণা করা হবে। যদি কোনও প্রার্থী এই শর্ত পূরণ করতে না পারেন তাহলে যিনি নিজ সম্প্রদায়ের সর্বাধিক ভোট পাবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন।

৩। বৃটিশ সরকারের ঘোষণায় স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র মেনে নেওয়ায় এবং বাংলাদেশ বিভক্ত হবে না এটা স্বীকার করায়, বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গড়তে হবে। সেই সরকারে মুখ্যমন্ত্রী বাদে সমসংখ্যক হিন্দু (তফসিলীভুক্ত হিন্দুদের ধরে) ও মুসলিম মন্ত্রী থাকবে। ঐ মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন একজন মুসলিম এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার আসবে একজন হিন্দুর হাতে।

৪। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে একটি আইনসভা ও মন্ত্রিপরিষদ চূড়ান্তভাবে গঠিত হওয়ার আগে সামরিক বাহিনী ও পুলিশ সমেত সকল বিভাগের পদগুলি সমসংখ্যক মুসলিম ও হিন্দুদের (তফসিলীভুক্ত হিন্দু সমেত) দ্বারা পূর্ণ করা হবে। সকল পদেই বাঙ্গালী নিয়োগ করা হবে।

৫। সংবিধান বিধায়ক পরিষদে ইউরোপীয় বাদে ১৫ জন মুসলিম ও ১৪ জন অমুসলিম সদস্য থাকবেন। মোট সদস্য সংখ্যা হবে ৩০। এঁরা আইনসভায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

১৯৪৭ সালের ২৩শে মে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন :

বাংলায় স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হলে সেটি একটি সাধারণতন্ত্র হবে। সেই সাধারণতন্ত্রের প্রকৃতি এবং বিশেষত্ব হবে সমাজতান্ত্রিক। বাংলায় যদি কখনো একটি নিজস্ব সংবিধান বিধায়ক পরিষদ গঠিত হয় তবে তখন সেখানেই সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বিস্তারিত রূপ স্থির করা হবে। গত পাঁচ মাস ধরে আমি যাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছি তাঁদের সঙ্গে মূল ব্যাপারগুলির বিষয়ে আমার কোন মতপার্থক্য নেই।

আমি বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যত্র সকলকে বোঝাতে চাই যে, সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার নিরসন করা যায় না। একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বলিষ্ঠতর দৃষ্টিভঙ্গী—অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্যাটির মোকাবিলা করতে হবে।

আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না যে সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কি গভীর পারস্পরিক অবিশ্বাস রয়েছে। গত আগস্ট মাস থেকে এটা বেড়েই চলেছে। যদি এটা দূর করা না যায় তাহলে বাংলা তথা ভারত ধ্বংস হয়ে যাবে—এটা দূর করতেই হবে।

এই সমস্যার সমাধান হিসাবে আমি সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র সৃষ্টি করার প্রস্তাব করেছি (এগুলিকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে)। আজ সকালে সমঝোতার যে শর্তগুলি প্রকাশিত হয়েছে তাতে ঐ কথাগুলিই ব্যবহার করা হয়েছে। আমার কাছে 'স্বাধীন'—এই কথাটার অর্থ শুধু রাজনৈতিক অধীনতা থেকে মুক্তি নয়, এর অর্থ সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধন মোচন।

জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনতে গেলে বাংলায় প্রথমেই দরকার এক নূতন সরকার গঠন করা। বর্তমান সাম্প্রদায়িক

মন্ত্রিসভা সরিয়ে জনগণের আস্থাভাজন এক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অবিলম্বে এটা প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে যে অবিশ্বাস রয়েছে, শুধু এর ফলেই তা বহুলাংশে দূর হবে। যে মুহূর্তে সকল শ্রেণীর মানুষের আস্থাভাজন একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে সেই মুহূর্ত থেকে প্রশাসন ব্যবস্থার চরিত্রও দ্রুত বদলাতে শুরু করবে। আইন রচনার প্রস্তাবগুলি তখন সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে জাতীয়তা-বাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে দেখা হবে। জনসাধারণের একাংশের সুবিধার বদলে সমগ্র জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থে আইন প্রণীত হবে।

লর্ড মিণ্টোর আমল থেকে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী প্রচলিত রয়েছে। তারপর কয়েক দশক কেটে গেছে, এই প্রথম ভারতের কোনও প্রদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে রাজী হয়েছেন। অবশ্য এটা ঠিক যে কিছু কিছু রক্ষাকবচ রাখা হয়েছ। কিন্তু সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবেই তা করা হয়েছে এবং আমি আশা করি বছর দশেক পরে কিংবা তার আগেই এগুলি উঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভোট পৌনঃপুনিক হবে না বণ্টনমূলক হবে একথা আমরা বলেছি। এর অর্থ হল, কোন ভোটদানকারী তার সকল ভোট একজন প্রার্থীকেই দিতে পারবেন না।

এই শর্তগুলি কংগ্রেস ও লীগ সংগঠনগুলিকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আমার চিন্তাধারা এখন কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছে তা আপনাদের জানিয়েছি—এই মুহূর্তে আর বিশদভাবে বলার প্রয়োজন নেই।

এই মুহূর্তে আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্বচ্ছতা হারিয়েছে সত্য কিন্তু আমার সর্বৈব আশা আমাদের হিন্দু মুসলিম সকল রাজনৈতিক

কর্মী এই সুযোগ গ্রহণ করবেন এবং সমবেতভাবে বাংলার ইতিহাসে এক নূতন পরিচ্ছেদ যোজনা করবেন এবং কালক্রমে ভারতের ইতিহাসেও তা এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

আমি যা খবর পেয়েছি এবং বেশ নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া সেই খবর—তাতে জানা যায় যে, বাংলাদেশ বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে বর্ধমান বিভাগ, ২৪ পরগণা জেলা, খুলনা জেলা এবং সম্ভবত কলকাতা পশ্চিম বাংলায় যাবে এবং বাকী বিভাগ ও জেলাগুলি পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়বে। এই ধরনের বিভাগে সম্মত হওয়া সম্ভব কি না তা আমি বাংলাদেশের জনগণকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে, আমি সব সময়েই চেয়েছি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যেন আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা না হয়, আমরা যেন আমাদের ঘর নিজেরাই গুছিয়ে নিতে পারি।

২২শে মে ১৯৪৭ সালে মহাত্মা গান্ধীকে লেখা শরৎচন্দ্র বসুর একটি শিলমোহর করা খাম নিয়ে জনৈক পত্রবাহক পাটনায় যায়। গান্ধীজি তখন পাটনায়। এই প্রসঙ্গেই শ্রীবসুর কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া শরৎচন্দ্র বসুকে লেখা মহাত্মা গান্ধীর নিম্নলিখিত চিঠিটি বিশেষ আকর্ষণীয়।

পাটনা

২৪।৫।৪৭

প্রিয় শরৎ,

তোমার চিঠি পেয়েছি। শুধুমাত্র সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কিছু করা যাবে না এমন কোন কথা তোমার খসড়ায় দেখলাম না। আইনসভা এবং শাসন বিভাগের সকল সরকারী কাজে

হিন্দুদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের সহযোগিতা থাকা দরকার। বাংলার সংস্কৃতি অভিন্ন এবং মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষাও অভিন্ন এই স্বীকৃতিটুকু থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ প্রস্তাবের বিরোধী এমন ধরনের খবর রয়েছে, তবু তাঁদের সম্মতি আছে—এটা নিশ্চিতভাবে জানা প্রয়োজন। যদি দিল্লীতে তোমার উপস্থিতির প্রয়োজন থাকে তাহলে আমি টেলিফোনে বা টেলিগ্রাম করে জানাব। ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আমি প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

—তোমার বাপু

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার তরফে বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া নিম্নোক্ত সংবাদটি ১৯৪৭ সালের ২৬শে মে প্রকাশিত হয় :

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু উদ্যোগী হয়ে কোন কোন লীগ ও কংগ্রেস নেতার সঙ্গে বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন তা থেকে উদ্ভূত সূত্রগুলির কিছুটা পরিবর্তন সম্পর্কে কথাবার্তা চলেছে বলে জানা গেছে।

সূত্রগুলির উদ্ভাবকেরা তাঁদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন : লক্ষ্য, সূত্রগুলির আরও উৎকর্ষ বিধান। প্রধানত (১) ভারতের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক থাকবে, এবং (২) আইনসভার নির্বাচন—এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কথাবার্তা চলেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে যে ঐ অনুচ্ছেদ দুটির খসড়া প্রস্তাব রচনাকারীদের কারুর কারুর হাতে নূতন করে লিখিত হয়েছে। সংশোধিত অনুচ্ছেদ—১। বাংলা হবে স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। কোন একটি রাষ্ট্র সমবায়ে যোগ দেওয়ার বিষয়টি স্বাধীন

বাংলা রাষ্ট্রের আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে স্থির করা হবে।

সংশোধিত অনুচ্ছেদ—২। স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে যৌথ-নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে আইনসভা গঠন করার ব্যবস্থা থাকবে। আইনসভায় হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের বন্দোবস্ত থাকবে।

হিন্দু ও তফসিলীভুক্ত হিন্দুদের আপেক্ষিক জনসংখ্যার অনুপাতে অথবা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হবে। একাধিক আসনবিশিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হবে। ভোট পৌনঃপুনিক হবে না, বণ্টনমূলক হবে।

যে প্রার্থী নির্বাচনে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সর্বাধিক ভোট ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভোটারদের দেওয়া ভোটের শতকরা ২৫ ভাগ পাবেন, তাঁকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে। এই শর্তগুলি যদি কোন প্রার্থীই পূরণ করতে না পারেন তাহলে যাঁর পক্ষে আপন সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক ভোট ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ ভোট পড়বে তাঁকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে। এই শর্তও যদি কোনও প্রার্থী পূরণ করতে না পারেন তাহলে মোট যত ভোট গৃহীত হবে তার মধ্যে যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন, তিনি নির্বাচিত হবেন।

আরও জানা গেছে যে বর্তমান আইনসভায় এবং যখন অন্তর্বর্তী-কালীন সরকার গঠিত হবে তখনকার আইনসভায় নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, না বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তাও আলোচনাকারীদের বিবেচনাধীন।

১৯৪৭ সালের ৩১শে মে নয়াদিল্লীতে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু বলেন যে বাংলার অবস্থা, বিশেষ করে বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করার বিকল্প হিসাবে তাঁর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র

গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

শ্রীবসু আশা প্রকাশ করেন যে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড যদি তাঁর পরিকল্পনা মেনে নেন তাহলে কার্যত তাঁর পরিকল্পনারই অনুরূপ সুরাবর্দী পরিকল্পনা স্বীকার করে নিতে লীগ হাইকমাণ্ডকে রাজী করানো সহজ হবে। শ্রীবসু বলেন : আমার পরিকল্পনায় আমার আস্থা আছে এবং শেষ পর্যন্ত আমি এতে অনড় থাকবো। আমি অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করবো এবং বাংলা বিভাগের সম্ভাবনা রোধ করার সকল উপায় চেষ্টা করে দেখবো।

বাংলাদেশ ইউনিয়নের বাইরে থাকবে একথা আমি বলি না। আমার বক্তব্য, কেবলমাত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রই ভারতের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে

১৯৪৭-এর ৯ই জুন শরৎচন্দ্র বসু এম এ জিন্নাকে নিম্নলিখিত চিঠিটি লেখেন :

১ উডবার্ন পার্ক
কলিকাতা
৯ই জুন, ১৯৪৭

প্রিয় জিন্না,

আপনি আমাকে যে শিষ্টাচার ও হৃদ্যতা এবং আমার প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে যে বিবেচনা দেখিয়েছেন তার জন্য আমার একান্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন। বাংলা তার ইতিহাসের বৃহত্তম সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, কিন্তু তাকে বাঁচানো যেতে পারে। যদি আপনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি পাঠান তবেই তা সম্ভব :

(১) ব্যবস্থাপক সভার (ইউরোপীয়দের বাদ দিয়ে) সকল সদস্যের যে বৈঠকে স্থির করা হবে যে ভবিষ্যতে যদি বাংলার উভয় অংশ অবিভক্ত থাকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তখন কোন সংবিধান রচনাকারী পরিষদে সমগ্রভাবে বাংলা যোগ দেবে এই প্রশ্নে তাঁরা যেন হিন্দুস্থান সংবিধান রচনাকারী পরিষদ কিংবা পাকিস্তান সংবিধান রচনাকারী পরিষদ—এর কোনটিতেই যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত না করেন এবং তাঁরা ব্যবস্থাপক সভায় অথবা সংবাদপত্রে অথবা অন্য যে কোন উপায়ে এক বিবৃতি প্রকাশ করে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে তাঁরা বাংলা দেশের জন্য একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ গঠনের ব্যাপারে দৃঢ়মত।

(২) ব্যবস্থাপক সভার দুই ভাগের সদস্যেরা যখন স্বতন্ত্রভাবে মিলিত বৈঠকে প্রদেশ ভাগ করার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা পাবেন তখন যেন তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিভক্তিকরণের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সময় আপনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন সেই অনুসারেই আপনাকে এই অনুরোধ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি যদি শুধুমাত্র আপনার মতটুকু প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেন এবং ভোটদান সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট নির্দেশ না দেন তাহলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সম্ভব হবে না। আশা করি বাংলাদেশ যাতে অবিভক্ত থাকে এবং একটি মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় তার জন্য আপনি সাধ্যমতো সব কিছুই করবেন।

যদি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মুসলিম সদস্যেরা উপরোক্ত অনুচ্ছেদ (১) এবং (২) অনুসারে সকলে ভোটদান করেন তাহলে আমার ধারণা লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্যবস্থাপক সভার (ইউরোপীয় বাদে) সকল সদস্যকে আর একটি বৈঠকে ডাকতে বাধ্য হবেন এবং সেই

বৈঠকে সমগ্র ভাবে এই প্রদেশ একটি নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদ গঠন করতে চায় কিনা সে ,বাবদে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

১৩ই অথবা ১৪ই আমি আবার দিল্লী যাচ্ছি এবং ১৪ই বা ১৫ই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

ধন্যবাদ রইল। আমার শ্রদ্ধা জানবেন।

—শরৎচন্দ্র বসু

কায়েদে আজম এম এ জিন্না
ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল
১০ আওরঙ্গজেব রোড, নয়া দিল্লী

বিমানে বিশেষ দূত মারফৎ এই চিঠিটি মিঃ জিন্নার হাতে পৌছে দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড শরৎচন্দ্র বসুর সংযুক্ত স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এ বিষয়ে আলোচনা আর চালানো সম্ভব হয় নি। পরে গান্ধীজি তাঁর একটি প্রার্থনা সভার ভাষণে বলেন যে, "শরৎবাবুর প্রস্তাব সমর্থন করায় তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে।"

১৯৪৭-এর ২১শে জুন মহাত্মা গান্ধী শরৎচন্দ্র বসুকে নিম্নোক্ত পত্রটি লেখেন :

হরিদ্বার
১২-৬-৪৭

প্রিয় শরৎ,

এখানে কিছুটা সময় নিজের মতো ক'রে কাটাবার অবকাশ পেয়েছি। সেই অবসরে অনেক আগে লেখা উচিত ছিল এমন দু একটা চিঠির উত্তর দিচ্ছি। এ মাসের ১৪ তারিখে লেখা তোমার চিঠিটি আমি পেয়েছিলাম।

ভৌগোলিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হলে ঐক্যের জন্য কী ভাবে কাজ করতে হয় তা আমি জানিয়েছি।

তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল আশা করি। ভালবাসা রইলো।

—বাপু

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাঙালী ভায়েদের প্রতি

[১৯৫৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্র বসুর একটি প্রেস বিবৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।]

গতকাল "দি নেশন" পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ "এটা পথ নয়" শীর্ষক লেখাটিতে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে। তবু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলিম ও হিন্দু ভায়েদের কাছে আবেদনক্রমে ইউ এস ও-এর সভাপতি হিসাবে আমার কিছু বলা কর্তব্য এবং বলার অধিকার আছে বলে মনে করি। আমি তাঁদের কাছে শান্তি, মর্য্যাদাজনক শান্তির জন্য আবেদন করি, আবেদন করি তাঁরা যেন সুবিবেচনা, ধৈর্য্য এবং সুস্থতাকে মর্যাদা দেন।

পূর্ববঙ্গের কোন কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক ধরনের গণ্ডগোল বেধে ওঠায় এবং তার সূত্র ধরে কলকাতা ও শহরতলীতে গোলমাল শুরু হওয়ায় আমি সত্যই ব্যথিত। আমার আরও দুঃখ এই যে যদি উভয় বঙ্গে শাসকবৃন্দ কিছুটা করুণা, বুদ্ধি, চাতুর্য এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন—যদি তাঁরা অবিবেচনা প্রসূত বিবৃতি দেওয়া থেকে কিছুটা সংযত থাকতেন তাহলে এই সব বিশৃঙ্খলা এড়ানো যেত। যাঁরা সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের স্রোতে ভেসে গেছেন কিংবা ওই মনোভাবের উসকানি দিচ্ছেন তাদের আমি এইটুকুই বলবো যে প্রতিশোধ কোন সদ্‌গুণ নয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা নূতন এবং হিংসার ও অপকার্যের পারম্পর্যের জন্ম দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার সমর্থকদের

গ্রাস করে। সীমান্তের ওপারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার নামে যাঁরা প্রতিশোধ প্রবৃত্তিকে উসকানি দিচ্ছেন, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মানুষ যেন তাঁদের হাতে খেলার পুতুল না হন—এই আমার আবেদন। যারা প্রলোভন দেখাচ্ছে তারা সমাজের ছদ্মবেশী শত্রু। আমার আবেদন—তাদের কথায় কান দেবেন না।

পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে বলে কিছুদিন থেকে আমি খবর পাচ্ছি। তার ফলে রোগশয্যা থেকে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের কাছে আমি আবেদন জানাতে বাধ্য হয়েছি যে তিনি যেন ঘটনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করে সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্পত্তি এবং স্বাধীনতার নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। অনেক আগেই অর্থাৎ গত ২রা জানুয়ারীতেই আমি এই আবেদন করেছি।

আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারিনা যে কলকাতার কোন কোন গণ্ডগোলের জন্য কয়েকজন সাংবাদিকেরও দায়িত্ব কিছু কম নয়। কেননা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মতে যখন "পূর্ববঙ্গের প্রকৃত পরিস্থিতি কী তা জানা ছিল না" তখন এঁদের দায়িত্ববোধহীন জ্বালাময়ী লেখা ও প্রচার এবং সংবাদ পরিবেশনাকে এর জন্য কিছুটা দায়ী না করে উপায় নেই। সৌভাগ্যক্রমে সংখ্যায় এঁরা খুবই অল্প। এঁরাই বাংলা বিভাগের জন্য প্রচণ্ডভাবে দারুণ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। যোগাযোগটা লক্ষ্য করার মতো। অবশ্য আজ দেশবিভাগ এক অনস্বীকার্য ঘটনা। আমি আশা করেছিলাম, তাঁরা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁদের পরিবর্তিত কর্তব্যের কথা উপলব্ধি করবেন এবং উভয় বঙ্গে সংখ্যালঘুদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি তাঁদের লেখার মাধ্যমে বিপন্ন হতে দেবেন না। যদি এতই তাঁরা পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে বা তাদের হয়ে

লড়তে চাইতেন তাহলে কলকাতায় সম্পাদকীয়ের পবিত্র কোটরে আবদ্ধ না থেকে পূর্ববঙ্গে গিয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য লড়াই করাই তাঁদের উচিত ছিল। অবশ্য যেখানে সংগ্রামের ঝুঁকি নেই সেখানে বীরত্ব দেখানো সহজ।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই যে, গোলমালের সুযোগ নিয়ে কোন কোন জমি ও বস্তিমালিক আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধ করতে তৎপর হয়েছেন এরকম খবরও ক্রমাগত আমার কাছে আসছে। খবরগুলি কতদূর সত্য তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুসন্ধান করে দেখা কর্তব্য। ক্রমাগত আরও খবর পাওয়া যাচ্ছে যে গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা শুধুমাত্র লুট এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে নির্বিবাদে অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এই সন্ত্রাস বন্ধ করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তার পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর।

দেশবিভাগের ফলে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান হবে না, বরং নূতন আকারে এই সমস্যা জিয়ানো থাকবে এটা তৎকালীন কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভার নেতাদের মনে যেদিন দেশ ব্যবচ্ছেদের ধারণা সৃষ্টি হয় তখন থেকেই আমি আশঙ্কা করেছিলাম। অনেক আগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই মার্চ আমি বলেছিলাম : "ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশগুলির বিভক্তিকরণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান নয়। প্রদেশগুলি ওইভাবে ভাগ করা হলেও সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের পাশাপাশি বাস করতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের ঝুঁকি সেখানেও থাকবে…। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সমস্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তার সমাধান একান্ত জটিল হয়ে উঠবে, হয়তো অসম্ভব হবে। ভারতের সর্বত্র এই রকম মিশ্রিত জনবসতি থাকার দরুন সাম্প্রদায়িক পার্থক্যকরণ কিংবা ধর্মভিত্তিক বিচ্ছিন্নকরণ বাঞ্ছনীয় নয়, সম্ভবও

নয়···। আমরা হিন্দু বা মুসলিম, শিখ বা খৃষ্টান হই আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও স্বার্থ অভিন্ন।"

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আমার এই রাজনৈতিক মতামতের জন্য আমি জীবনে কোনদিন কখনই অবিভক্ত বাংলায় অথবা তার পরে বিভক্ত বাংলায় হিন্দু মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য করিনি। বাংলা বিভাগের পরেও উভয় বঙ্গেই জনসংখ্যার মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য তেমনই থেকে গেছে, পার্থক্য ঘটেছে শুধু পরিমাণগত। কাজেই উভয় রাষ্ট্রে উদার সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সংখ্যালঘুদের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে। সেই পথেই সমস্যার সমাধান, অন্য কোন পথে নয় এবং আমি আশা করি উভয় রাষ্ট্রের সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারবেন। রাষ্ট্র দুটি, কিন্তু প্রতিটি রাষ্ট্রে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক জনগণ অভিন্ন· উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি বন্ধনে বাঁধা। সীমান্তের এপারে কিংবা ওপারে হোক একে অপরের সঙ্গে অস্থিমজ্জার মতো মিশে আছে।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাঙালী ভায়েরা, পবিত্র সব কিছুর নামে, বাংলার অতীত ইতিহাসের নামে, বিগত এবং বর্তমান বন্ধুত্বের নামে, আমি আপনাদের কাছে হিংসার পথ পরিহার করে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি ও মিল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আবেদন করছি। দিল্লী বা করাচীর পথ চেয়ে বসে থাকবেন না, সেখান থেকে আলো আসবে না। আপনাদের অন্তরের আলোয় যে নির্দেশ রয়েছে তাকেই অনুসরণ করুন। যে সব প্রস্তাব বিভিন্ন মহল থেকে করা হয়েছে সেগুলি নিয়েও আমি বিবেচনা করে দেখেছি। গভীর চিন্তা ও পরিণত বিবেচনার শেষে আমি এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছি যে এর কোনটাই কোন সমাধান নয়। আমি ভারত ও পাকিস্তানের জনগণকে

শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে পাঞ্জাবে এবং পাঞ্জাব থেকে ব্যাপক বাধ্যতামূলক দেশত্যাগে যে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে আজ পর্যন্ত তার সমাধান হয়নি।

ভারত ও পাকিস্তানের জনগণকে আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাই যে পূর্ববাংলা একটি নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিক এবং ভারত ও পাকিস্তানের জনগণ যেন তাঁদের নিজ নিজ সরকারকে এটা যতদূর সম্ভব দ্রুত কার্যক করার জন্য চাপ দেন। গত তিন বছর ধরে আমি বারবার ব   আসছি যে ধর্মের ভিত্তিতে এই প্রদেশ ভাগ সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান নয় এবং ওইভাবে প্রদেশগুলি বিভক্ত হলেও সেথানে হিন্দু ও মুসলিমদের পাশাপাশি বাস করতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক পৃথকীকরণ বা ধর্মভিত্তিক বিচ্ছিন্নকরণ—বাঞ্ছনীয় নয়, সম্ভবও নয়। আমার এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমি জীবনে কোন ন বিভক্ত কিংবা অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে কোন ভেদ করিনি। উভয় বাংলাতে আগের মতোই জনসংখ্যার মিশ্রিত চরিত্র অব্যাহত রয়েছে।

ভারত ও পাকিস্তানের প্রতি আবেদন

[মৃত্যুর আধঘণ্টা আগে "দি নেশনে" শরৎচন্দ্র বসুর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় হিসাবে লিখিত এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০-এ প্রকাশিত—পূর্ণাঙ্গ পুনর্মুদ্রণ।]

এক বিরাট ব্যক্তিগত শোকের অন্ধকারে মগ্ন থেকে গত শনিবারের আগের শনিবার অর্থাৎ এ মাসের ১১ই দি তে বসে আমি পূ ও পশ্চিম বাংলার ভায়েদের কাছে শান্তির জন্য—

মর্যাদাজনক শান্তির জন্য আবেদন করেছিলাম। আবেদন করেছিলাম তাঁরা যেন সুবিবেচনা, ধীরতা ও সুস্থতাকে মর্যাদা দেন।

পবিত্র সব কিছুর নামে, বাংলার অতীত ইতিহাসের নামে, বর্তমান ও অতীতের বন্ধুত্বের নামে, পবিত্রতার নামে আবেদন জানিয়ে আমি তাঁদের হিংসার পথ পরিহার করে ধীরতা ও সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি ও মিল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অনুরোধ করেছিলাম। আমি তাঁদের দিল্লী বা করাচীর পথ চেয়ে বসে থাকতে বারণ করেছিলাম, কেননা সেখান থেকে আলো আসবে না। আমি তাঁদের অন্তরের আলোর নির্দেশ অনুসরণ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলাম।

বর্তমান অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তার প্রকৃত সমাধান কী হতে পারে এ নিয়ে আমি গত এগারো দিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা করেছি। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের ব্যাপক দেশত্যাগ কিংবা উভয় বাংলার মধ্যে জনসংখ্যা বিনিময়ের ব্যাপারেও। বঙ্গবিভাগ যখন ঘটেই গেছে তখন এর আমি পরিবর্তন করতে চাইনে। দেশবিভাগের দাবির পিছনে যে ব্যর্থতাবোধ ছিল, সম্প্রতি কিছুকাল আগে পূর্ব বাংলার মানুষের মনে তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এটা আমি ভালভাবেই জানি। আমি সমাধানের যে প্রস্তাব করেছি তাতে বর্তমান ব্যবস্থার ন্যূনতম পরিবর্তন ঘটবে। একটি সুনির্দিষ্ট ও পৃথক রাজ্য হিসাবে পূর্ব বাংলা বাঁচুক এবং উন্নতি করুক, কিন্তু আমার আগেকার কথামতো দুই বাংলায় বসবাসকারী যে সম্প্রদায়গুলি পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ, যারা একে অপরের সঙ্গে অস্থিমজ্জার মতো মিশে আছে তাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বলি, পূর্ব বাংলা যেন ভারতীয় ইউনিয়নের ছত্রছায়ার আশ্রয়ে বেঁচে ওঠে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

"দি নেশনে" আমার সহকর্মীদের নামে ও তাঁদের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের তরফ থেকে আমি ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের

বিবেচনার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি। "দি নেশন" বিশ্বাস করে, এই সমাধান শুধু যে দুই বাংলার শান্তি ও সমৃদ্ধির সহায়ক হবে তাই নয়, এতে ভারত ও পাকিস্তানেও শান্তি ও সমৃদ্ধি আসবে। সকল শান্তিপূর্ণ এবং আইনসম্মত উপায়ে এই সমাধানকে ত্বরান্বিত করার কাজে "দি নেশন" আপনাকে উৎসর্গ করছে।

স্বাঃ—শরৎচন্দ্র বসু

দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিলে যাহা হয়, বাংলার ভাগ্যে আজ তাহাই জুটিতেছে। অধিকৃত বৃটিশের ইউনিয়ন জ্যাক উপড়াইয়া ফেলিয়া অর্ধচন্দ্র তারকা খচিত পতাকা সদর্পে প্রোথিত করার অব্যবহিত পর যাহারা সাবেক দিনের জগৎশেঠ রায়দুর্লভদের মত নিছক ভাগ্যান্বেষণে এদেশে আগমন করিয়াছিল তাহাদের কণ্ঠ আজ বাংলা-বিরোধী 'অর্থনৈতিক অবরোধ' সৃষ্টির জয়ধ্বনিতে মুখরিত। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। চিত্তে সুখের কারণ ঘটিলে কত কি করিতে ইচ্ছা জাগে। তাহাদের চিত্তে আজ সুখের কারণ ঘটিয়াছে। লোহা ঘটি সম্বল করিয়া যাহারা এদেশে আসিয়াছিল, তাহারা এখন অচিন্তনীয় জৌলুসের অধিকারী। যাহারা একদিন ঢাকায় হাজার টাকা লইয়া আসিয়াছিল কিনা সন্দেহ, তাহারাই এখন বিপুল বিত্ত বৈভবের অধিকারী বনিয়া যায়, তখন এমন পাঁয়তারা না করিলে চলেই বা কেমন করিয়া। সুতরাং আমরা আশ্চর্য হইতেছি না, শুধু বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে ভাবিতেছি, ইহার পরিণতি তাহাদের নিজেদের জীবনে আশীর্বাদ না অভিশাপ বহন করিয়া আনিবে, সেইটিও ইহারা ভাবিতে পরাঙ্মুখ ? পরাঙ্মুখ কিনা সে ইহাদের ভাল জানা থাকার কথা। তবে যে সুপারিশ জ্ঞাপন করা হইতেছে তাহার নির্গলিতার্থ এই যে বাংলা দেশ হইতে শেখ সাহেবের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা যদি প্রত্যাহৃত না হয়, তাহা হইলে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে পণ্য রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য সম্প্রতি করাচী শিল্প-বণিক সমিতি একটি পুরাদস্তুর সভা ডাকিয়া এই অবরোধ সৃষ্টির হুমকি প্রদর্শন করে। সে হুমকি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য যে ভীতি প্রদর্শন করিয়া কার্যোদ্ধার করা—সে কথা বলাই নিরর্থক।

কিন্তু আমরা বলি, 'ও' ভয়ে কম্পিত নহে বীরের হৃদয়।' পীচ ঢালা কালো রাজপথ রক্তরঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও যাহারা ভয় পায় নাই, সান্ধ্য আইনের বিভীষিকা যাহাদের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছে, তাহারা করাচী শিল্প-বণিক সমিতির ভয় ভীতি প্রদর্শনে লেজ গুটাইয়া ভিজা বিড়ালের মত আত্মসমর্পণ করিবে, ইহা নিছক গোবর্ধন ছাড়া আর কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। তাই ও ভয়ে আমরা ভীত নই। আমরা ভাবিতেছি, রাজনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির যে ভীতি প্রদর্শন করা হইতেছে তাহা কি করিতে এখনও কিছু বাকী আছে? পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পণ্য রপ্তানী আপাততঃ বন্ধ রহিয়াছে—গভীর সমুদ্র হইতে খাদ্যশস্যবাহী জাহাজের গতিপথ পরিবর্তন করিয়া করাচী বন্দরে লইয়া যাওয়া হইতেছে, ইহার পর অবরোধ সৃষ্টির আর বাকী আছে কি? করাচী শিল্প ও বণিক সমিতি যদি আরও ব্যাপকতর ও বিস্তৃততর অবরোধ সৃষ্টির সম্ভাব্যতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলেই বা কি হইবে? তেমন অবস্থায় বাংলা দেশের মানুষকে কি প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষের ন্যায় দিগম্বর ভাবে বা বাকল পরিধান করিতে হইবে? না কি অপরাপর পণ্য-সামগ্রীর অভাবে বাংলা দেশ অনতিক্রমে সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া পড়িবে? অন্তত আমরা তা মনে করি না। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পণ্যদ্রব্য রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে সাময়িকভাবে বাংলা দেশে কোন কোন পণ্য-দ্রব্যের কিছুটা সংকট দেখা দিতে পারে বটে, তবে তাহা কোন সুদূরপ্রসারী সংকট সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না। সাময়িক অভাব দেখা দিতে পারে এইজন্য যে, বিগত চব্বিশ বৎসরের ক্রুর বঞ্চনা আর শোষণের অপরিহার্য পরিণতি স্বরূপ বাংলার সোনা-দানা যেমন শতদ্রু বিপাশার তীরবর্তী সিন্দুকে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে, তেমনি বাংলার সম্পদে ওইসব ঊষর মরুময় অঞ্চল শস্য-শ্যামলা এবং শিল্প-সম্ভার সমৃদ্ধ হইয়া উঠিলেও

বাংলাদেশে প্রয়োজনানুগ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। পরন্তু ঔপনিবেশিক মানসিকতার বেদীমূলে তখনকার যা কিছু ছিল তাহাকেও বিনষ্ট করা হইয়াছে। ঔপনিবেশিক বৃটিশের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডে পরিণত হয়, তখন এই বাংলার বুকে অপরাপর কুটির শিল্প ছাড়াও বিশ্ববিশ্রুত মসলিন উৎপন্ন হইত। বৃটেনের শিল্প-বিপ্লবের স্বার্থে সেই সব কিছুর নির্মম বিনাশ সাধন করা হয়। শুধু তাই নয়—মসলিন তৈরির কলাকৌশল যাহাতে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তজ্জন্য তাঁতীদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দেওয়া হয়। সেই অমানুষিক বর্বরোচিত নীতির অভিশাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক বৃটিশ নাগরিকই বৃটিশরাজের নিকট প্রেরিত এক পত্রে লিখিয়াছেন, "বাংলার মাটি তাঁতীদের হাড়ে সাদা হইয়া যাইতেছে।" উত্তর-স্বাধীনতাকালে বাংলার মানুষ শাসকচক্রের নিকট হইতে যে নির্মম আচরণ লাভ করিয়াছে, তাহাও তদপেক্ষা তেমন কিছু উন্নত নয়। পার্থক্য শুধু এই, তখন তাঁতীদের হাড়ে বাংলার মাটি সাদা হইয়াছিল আর এখন তাঁতী, কামার-কুমার, শ্রমিক-মজুর, ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সকলের রক্তে বাংলার মাটি লাল হইতেছে। উত্তর-স্বাধীনতাকালে পশ্চিমা শিল্পের স্বার্থে এখানকার কুটিরশিল্পকে বিচিত্র কৌশলে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলিয়া আনা হইয়াছে। পশ্চিমা চাউল-মরিচা পেঁয়াজ মায় বাংলার সুস্বাদু কমলালেবুর স্থলে রসকষহীন মাল্টা বিক্রয় স্বার্থে এখানকার উন্নয়নকে নির্মমভাবে অবহেলা করা হইয়াছে। স্বাধীনভাবে বাংলাকে ব্যবহার করা হইয়াছে পশ্চিমা পণ্যদ্রব্যের 'সংরক্ষিত বাজার' হিসাবে। আর তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা আজও পরনির্ভরশীল, ইহার সর্বাঙ্গ দারিদ্র্যক্লিষ্ট। কিন্তু তবু আমরা ইহা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, পণ্য রপ্তানী সর্বতোভাবে বন্ধকরণেও বাংলার মানুষের সুদূরপ্রসারী কিছু ক্ষতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বরং রহিয়াছে তাহাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান লাটে উঠার

সম্ভাবনা, যাহারা বর্গীর লুঠতরাজ অপেক্ষাও নিষ্ঠুরতম পন্থায় বাংলা দেশকে লুণ্ঠন করিয়া শিল্পসম্ভার গড়িয়া তুলিয়াছে।

কেননা, পূর্বাহ্নেই বলা হইয়াছে যে বাংলা দেশেই পশ্চিমা শিল্পদ্রব্যের প্রধানতম বাজার। যদি এই বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা বন্ধ হইয়া যায়, আজ যদি বাংলার মানুষ একজোট হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, শোষকের উৎপাদিত পণ্য আমরা ব্যবহার করিব না, তাহা হইলে পাঁচ আঙ্গুল ঘি খাওয়ার কথা বিস্মৃত হইয়া যাওয়া ছাড়া কোন গতি থাকিবে না। তাহাদের কপাল ভাল যে, বঙ্গবন্ধু এখনও তেমন ডাক দেন নাই। পক্ষান্তরে তেমন অবস্থায় অর্থাৎ পশ্চিমা পণ্যদ্রব্য রপ্তানী যদি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা বাংলার মানুষের জন্য সুদূরপ্রসারী সুফল সৃষ্টি করিবে এই জন্য যে, তেমন অবস্থায় বাংলা দেশ আবার স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পথে অগ্রসর হইবে। তখন বাংলার অবহেলিত তাঁতশিল্প, খদ্দরশিল্প প্রভৃতি আবার নব প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিবে। রসকষহীন মাল্টার দৌরাত্মমুক্ত পরিবেশে আবার জাগিবে সুস্বাদু কমলালেবুর চাষের প্রেরণা। আমরা জানি, অন্ধকার বিদূরিত হওয়ার পূর্বক্ষণেই অন্ধকার সর্বাধিক ঘনীভূত হয়। সঙ্কট যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সঙ্কট উত্তরণের স্পৃহাও তত বাড়ে। পশ্চিমা পণ্যদ্রব্য যখন এ শ্যামল মাটির ধরাতলে আসিত না, তখন এখানকার মানুষ কদলীপত্র পরিধান করে নাই এবং তাহাদের পেটেও কাপড় বাঁধিতে হয় নাই। সুতরাং সে রকম ভয়-ভীতি প্রদর্শন অর্থহীন। বাংলায় অর্জিত অর্থসম্পদ বাংলা দেশে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং ইহাই বাংলার মানুষের দাবি। এই দাবিতে অস্পষ্টতা নাই, অযৌক্তিকতা নাই। অতএব, হুমকি-ধমকির অবাঞ্ছিত স্বভাবধর্ম বর্জন করিয়া যুক্তির পথে অগ্রসর হওয়াই তাহাদের পক্ষে সর্বাধিক মঙ্গলজনক।

[দৈনিক ইত্তেফাক—২৩শে মার্চ]

"আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ—"

'৭১-এর তেইশে মার্চের সুর

দৈনিক ইত্তেফাক—২৪শে মার্চ, ১৯৭১ : বিক্ষুব্ধ বাংলার বুকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের স্মারক দিবস ২৩ মার্চ গতকাল (মঙ্গলবার) চিরাচরিত আনুষ্ঠানিকতায় আর পালিত হয় নাই। বাংলার মুক্তি ও স্বাধিকার আন্দোলনের রক্তঝরা পটভূমিকায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ও 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের' ডাকে গত কালের দিনটি বাংলা দেশব্যাপী 'প্রতিরোধ দিবস' হিসাবে পালিত হইয়াছে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সরকারী বেসরকারী ভবনসমূহে, বাড়ী ঘরে, যানবাহনে কালো পতাকার পাশাপাশি গতকাল সংগ্রাম পরিষদ পরিকল্পিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উড্ডীন করা হয়। ঢাকা সহরে সামরিক কড়া বেষ্টনীর ছত্রছায়ায় বিমানবন্দর ভবনটিতে পাকিস্তানের পতাকা উড়িতে দেখা যায়। সংরক্ষিত এলাকা প্রেসিডেন্ট ভবন ও লাটভবনে পাকিস্তানের পতাকা ছিল। এছাড়া রাজধানীর সকল সরকারী ভবন—বাংলা পরিষদ ভবন, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট, শেখ সাহেবের বাসভবন, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, ঢাকা বেতার কেন্দ্র, টেলিভিশন কেন্দ্র প্রভৃতি স্থানে কালো পতাকার পাশাপাশি 'স্বাধীন বাংলার' পতাকা উড্ডীন করা হয়। গতকাল প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকার গণজীবনে গণআন্দোলনের সাগরে ভরা কোটালের জোয়ার দেখা দেয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আউটার স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ছাত্রছাত্রীরা যে বীরোচিত কুচকাওয়াজ পরিবেশন করেন, স্বাধিকারপিপাসু হাজার হাজার নরনারী আনন্দ

উজ্জ্বল কিন্তু বজ্রকঠোর ছন্দিতে দীপ্ত এক অপূর্ব পরিবেশে তাহা অবলোকন করেন। বাংলার তরুণদের এই কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়া গতকাল বাংলার আকাশে-বাতাসে বাঙালীর মানুষের মত মরিবার ও বাঁচিবার আত্মপ্রত্যয়ের যে অনির্বাণ স্বাক্ষর রচনা করিয়াছে তাহা অতুলনীয়, অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। সকাল হইতে রাত পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় বীর বাঙালীর অগণিত মিছিল শুধু কামনা বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া গিয়াছে অবিশ্রান্ত জলধারার মত। মিছিলে মিছিলে সভা-সমিতিতে জনতার কণ্ঠ যেন কেবলি বলিতে চাহিয়াছে :

"শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক
ভাঙ্গনের জয়গান গাও—
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক
আমরা শুনেছি ঐ, মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ—"

গতকাল ছিল শেখ মুজিবের নির্দেশে সরকারী ছুটির দিন।

স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক এই দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল ভোরে প্রভাতফেরী, শহিদানের মাজার জেয়ারত, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী বাসভবনে এবং প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন। আউটার স্টেডিয়ামে জয় বাংলা বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান এবং স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভা অনুষ্ঠান করা হয়।

কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার উপর ছাড়িয়া দিন

—শেখ মুজিব

বিক্ষুব্ধ বাংলার দশদিগন্তে সর্বাত্মক মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে নয়া আঙ্গিকে আবির্ভূত তেইশে মার্চের অবিস্মরণীয় দিনে (মঙ্গলবার)

বন্যার স্রোতের মত স্বীয় বাসভবনে সমাগত জনতার উদ্দেশে ভাষণদান কালে স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় বলেন, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। যতদিন সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর সার্বিক মুক্তি অর্জিত না হইবে, যতদিন একজন বাঙ্গালী বাঁচিয়া থাকিবে, এই সংগ্রাম আমাদের চলিবেই চলিবে। মনে রাখিবেন সর্বাপেক্ষা কম রক্তপাতের মাধ্যমে যিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করিতে পারেন, তিনিই সেরা সিপাহশালার। তাই বাংলার জনগণের প্রতি আমার নির্দেশ—সংগ্রাম চালাইয়া যান, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংগ্রামের কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার উপরই ছাড়িয়া দিন।"

শেখ সাহেব তাঁহার ভাষণে আরো বলেন, "বাংলার দাবির প্রশ্নে কোন আপোস নাই। বহু রক্ত দিয়াছি, প্রয়োজনবোধে আরও রক্ত দিব, কিন্তু মুক্তির লক্ষ্যে আমরা পৌঁছিবই। বাংলার মানুষকে আর পরাধীন করিয়া রাখা যাইবে না।" তিনি বলেন, "আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকার লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম আমাদের চলিতেই থাকিবে। এই সংগ্রামের পন্থা কি হইবে উহা আমিই ঠিক করিয়া দিব, সে ভার আমার উপরই ছাড়িয়া দিন। শোষক কায়েমী স্বার্থবাদীদের কিভাবে পর্যুদস্ত করিতে হয় আমি জানি।" তিনি বলেন, "অতুলনীয় ঐক্য, নজিরবিহীন সংগ্রামী-চেতনা আর প্রশংসনীয় শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিয়া বাংলার মানুষ প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, শক্তির জোরে তাঁহাদের আর দাবাইয়া রাখা যাইবে না।"

কাক ডাকা ভোর হইতে রাজপথ জনপথ প্লাবিত করিয়া শহর ও শহরতলির বিভিন্ন দিক হইতে দশ ঘণ্টা সময়ে ৬টি মহিলা মিছিল সহ অন্তত ৫৫টি ছোট বড় মিছিল গতকাল শেখ সাহেবের বাসভবনে

আগমন করিয়া মহান জাতির মহান নেতার প্রতি অকুণ্ঠ আস্থার পুনরাবৃত্তি এবং সংগ্রামের দুর্জয় পথের স্বাক্ষর রাখিয়া যায়। সেই মিছিলের সমুদ্রে হাতে হাতে লাঠি, বল্লম, বন্দুক, চোখে মুখে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্য আর কণ্ঠে কণ্ঠে নয়া দিনের নবজাতি নতুন দেশের বিজয়গাথা কোটি প্রাণের অমোঘ সঙ্গীত 'জয়-বাংলার' সাধন মন্ত্রে গর্জিয়া গর্জিয়া উঠিতে থাকে। তেইশ বছর ধরিয়া বাংলার দশ দিগন্তে যে পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়াছে, যে পাকিস্তান দিবস পালিত হইয়াছে, যেভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সভা-সমিতি হইয়াছে আর সেই সব অনুষ্ঠানে রাজপথে জনপথে অধিকার বঞ্চিত গণমানুষ ক্ষ্যাপা পাগলের মত 'পাকিস্তান আর স্বাধীনতা' খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, গত-কালের দিনটি তার অবসান সূচনা করিয়া জনতাকে নবসূর্যের নয়া-লোকে নয়া পতাকার দিক্‌নির্দেশে প্রাণের টানে টানিয়া নিয়াছে জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আর বাম হাতে বাংলা দেশের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ডান হাত জনতার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বাংলার মুকুটহীন সম্রাট সাড়ে সাত কোটি মানুষের আত্মার স্পন্দনকে একত্রে জড়ো করিয়া গর্জিয়া উঠিয়াছেন : "বাংলার মানুষ কাহারও করুণার পাত্র নয় : আপন শক্তির দুর্জয় ক্ষমতাবলেই তাহারা মুক্তি ছিনাইয়া আনিবে। জয় বাংলা—বাংলার জয় অনিবার্য।"

১৫শে মার্চ থেকে হাওয়ার গতি বিপরীতমুখী হতে শুরু করল। ২২শে মার্চ থেকেই মুজিবুর-ইয়াহিয়া খাঁ আলোচনা কিছুটা শ্লথ গতিতে এগুতে থাকে। মাঝে ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে দিনটি নানা উত্তেজনার মধ্যে কেটে যায়। কিন্তু ২৪শে মার্চও

আলোচনায় খুব একটা অগ্রগতি দেখা গেল না। ২৩শে মার্চ একদল ছাত্র চীনা দূতাবাসের ছাদে গিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাটি নামিয়ে এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। এদিনে আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল সামরিক বাহিনীর লোকেরা ঢাকার টেলিভিশন কেন্দ্রটির নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করে গত দুই দিন মুজিবুরের উপদেষ্টা ও ইয়াহিয়া খাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয় কিন্তু সেই বৈঠকে ফলপ্রসূ কিছু হয়েছে বলে জানা যায় না।

শেখ মুজিবুর বুধবার বলেন যে, বাংলা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়ার চেয়ে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দেবেন। জনাব ভুট্টো গত দুদিন ধরে যে সমস্ত কথাবার্তা বলেন তার মধ্যেও সমস্যা সমাধানের কোন সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায় না। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের যে সমস্ত নেতা ঢাকায় এসেছিলেন তাঁরাও সকলে করাচী ফিরে যাবার উদ্যোগ নেন। মিয়া মমতাজ দৌলতানা, খান আবদুল কাইয়ুম খান, খান আবদুল ওয়ালী খান, মৌলানা মুফতি মাহমুদ, সর্দার শওকৎ হায়াৎ খান, মৌলানা নূরানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ করাচী রওনা হয়ে যান।

আগামী ২৫শে মার্চ রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের দু বৎসর পূর্ণ হওয়ার স্মরণীয় দিন। সকলের শেষ আশা এই স্মরণীয় দিনটিকে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খাঁ হয়তো কোন ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্যে আরো স্মরণীয় করে রাখবেন।

২৫শে মার্চ সকাল হল। মুজিবুর ঘোষণা করলেন শহিদদের রক্তধারা যেন ব্যর্থ না হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান আজ পাকিস্তানের শাসকদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর বাইরে থেকে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা

কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। বাংলা দেশের জনগণ আজ ঐক্যবদ্ধ। আর কোন শক্তি তাদের দাবি উপেক্ষা করতে বা তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধু বলেছেন যে, জনগণ যেন ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকেন। শান্তিপূর্ণ, অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন বানচাল করার সব অপচেষ্টা রুখতে হবে। শহিদদের রক্তধারা ব্যর্থ হতে দেওয়া চলবেনা। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ বলেছেন যে, তাঁদের দল তথা বাংলা দেশের জনগণ কি চান তা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সবিস্তারে বলা হয়েছে, আর কিছু বলার দরকার নেই। তবে আরও ব্যাখ্যার দরকার থাকলে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সঙ্গে তাঁরা আরও আলোচনায় প্রস্তুত। যাই হোক, অনিশ্চিত অবস্থা বেশী দিন থাকতে পারে না। বর্তমান সংকটের দ্রুত সমাধান কাম্য। এদিকে ভুট্টো সাহেব এখনও তাঁর পুরানো গত্ গেয়ে চলেছেন। আজও সক... তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৭৫ মিনিট কথা বলেন। ভুট্টো যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে এখনও নারাজ। ভুট্টো আজ বলেন, সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে বৃহস্পতিবার আওয়ামী লীগ এবং প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, এই নতুন পরিস্থিতির কথা তাকে জানানো হলে শুক্রবার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন, নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক স্থগিত রাখতে হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঐ বৈঠক বসার কথা ছিল। ভুট্টো বলেন, শেখ মুজিবুরের ৯ দফা দাবির ব্যাপারে তাঁর দলের নীতিগত ভাবে কোন আপত্তি নেই। তাঁরা চান, দেশের উভয় অংশেরই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

(ভুট্টোর মতে: আওয়ামী লীগের স্বাধিকার দাবি নিছক স্বায়ত্তশাসনের চেয়েও বেশী—প্রায় সার্বভৌমত্বের কাছাকাছি।)

পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান আরও বলেন : তিনি এখনও এক ইউনিটের ফরমুলা নিয়ে পীড়াপীড়ি করছেন—একথা বলা ঠিক নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক। ঢাকায় তিনি আর কত দিন থাকবেন জানতে চাওয়া হলে ভুট্টো বলেন : যদি কোন বোঝাপড়ায় পৌঁছানো যায় তবে তিনি আরও দু-এক দিন থাকতে পারেন। তা না হলে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবেন।

আজ সকালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন : তিনি মুজিবের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চান। কিন্তু মুজিব আমার সঙ্গে দেখা করতে নারাজ।

পূর্ব পাকিস্তানকে কার্যত স্বাধিকার দিয়ে প্রেসিডেন্ট শুক্রবারে এক ঘোষণা করবেন বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তা না হওয়ায় পূর্ববাংলার উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

ঢাকায় বিক্ষোভকারীরা 'মুজিবুর আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না'—স্লোগান দিতে থাকেন। গত কয়েকদিন ধরে একখানি হেলিকপটার প্রেসিডেন্ট ভবন ও বিমানঘাঁটির মধ্যে যাতায়াত করছিল। এই হেলিকপটারের যাতায়াত এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর কালহরণ খুবই সন্দেহের চোখে দেখছিলেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে সব কথা বলবার সে সব কথা বলা শেষ হয়ে গেছে, সকলেরই আশা ছিল ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ হয়তো তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করবেন, কিন্তু ঘোষণা এল প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে নয় বন্দুকের নল থেকে। রংপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে সামরিক বাহিনী গুলিবর্ষণ করল নির্বিচারে। নিহত হল কয়েক শত ব্যক্তি। ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষিত হল মুজিবের কণ্ঠস্বর—এই সন্ত্রাসজনক অবস্থা আর মুখ বুজে সহ্য করা হবে না। ২৭শে মার্চ শনিবার সারা রাজ্যে ধর্মঘট পালন করা হবে। স্তব্ধ হয়ে যাবে জনজীবন ও প্রশাসনের সমস্ত গতি।

চট্টগ্রামে একটি জাহাজ থেকে গোলাবারুদ খালাস করতে ডক কর্মীরা অস্বীকার করে। সামরিক ব্যক্তিরা সেই মাল খালাস করতে গেলে হাজার হাজার মানুষ সামরিক বাহিনীর কাজে বাধা দেয়। রংপুরে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ না করে সামরিক বাহিনী প্রশাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষণ করে। ঢাকায় সশস্ত্র ব্যক্তিরা একটি কারখানায় প্রবেশ করে গুলিবর্ষণ করে। আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন ঘোষণা করলেন আমাদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রয়াসকে বানচাল করে দেওয়াই এই বর্বরোচিত আক্রমণের উদ্দেশ্য। তিনি জনগণকে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানান।

২৫ তারিখের রাত্রের কথা নতুন ইতিহাসের উপাদান হয়ে রয়েছে। সেই ইতিহাস আরও পরে বলব। ইয়াহিয়া খাঁ ঢাকা ত্যাগ করে চলে গেছেন করাচী। মুজিবুর ঘোষণা করেছেন—বাংলা দেশ স্বাধীন সার্বভৌম। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই ঢাকা, চট্টগ্রাম শহরের পথে পথে শুরু হয়েছে জঙ্গী শাসনের মুখোমুখি মুক্তি পাগল মানুষের লড়াই।

শুক্রবার মুজিবুর ঘোষণা করলেন বাংলাদেশ সার্বভৌম স্বাধীন, আর করাচী থেকে ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করলেন শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জাতীয় পতাকাকে অপমান করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের শত্রু। তাঁরা পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলতে চান, এই অপরাধের জন্যে তাঁদের শাস্তি পেতেই হবে।

মুজিবুর পাকিস্তানের শত্রু! অতীতে পাকিস্তানের শত্রুরূপে আটক, অন্তরীণ ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন জনাব এ কে ফজলল হক, সহিদ সোরাবর্দী; আর এবার এই দুই নামের সঙ্গে যুক্ত হল মুজিবুর রহমানের নাম।

"এ আমার পাপ এ তোমার পাপ"

'রাইত কত কইতে পারুম না। দুনিয়ার অন্ধকার নামছিল আমাগো সাকিনে। আমরা ভাবছি কেয়ামত আইব। বাবা সন্ধ্যায় গল্প করতাছে, বিশ বছর আগে এই রকম আর একটা ঝড় আইছিল। কিন্তু এইবারের ঝড় আরো শক্ত। বাবা বাইরে উঁকি দিয়া দেইখ্যা কইলেন—অবস্থা খারাপ, পানি উঠতাছে।'...

১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে যে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গিয়েছিল, সেই কাল-রাত্রির কাহিনী পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত 'একতা' পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে মহাপ্রলয়ের ছোবলে সর্বহারা সোলেমান নামে একটি বালক অকপটে বলে গিয়েছিল। সে কিন্তু জানত না যে আগামী চার মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে এর চাইতেও সাংঘাতিক আর এক ঝড়। ২৬শে মার্চ ১৯৭১-এর শেষরাত্রি বয়ে এনেছে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে আর এক হিংস্র কাল-রাত্রির দীর্ঘ সূচনার ইঙ্গিত।

প্রলয়ের এক নতুন নজির সৃষ্টি করেছে ১২ই নভেম্বর। কারণ এই ঝড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অন্যসব ঝড়ের মৃত্যুর সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছে। কারণ, এর আগের ঝড়গুলি প্রাকৃতিক আকাশের চাইতে রাজনৈতিক আকাশ থেকেই সাধারণের আঙিনায় আছড়ে পড়েছে, তাই সাধারণ মানুষ কিছুটা প্রস্তুত হতে সময় পেয়েছে, আর মৃত্যুর সংখ্যাও সেই কারণে তুলনামূলক ভাবে কম। কিন্তু এখন পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের চোখে মুখে নতুন করে সেই ১২ই নভেম্বরের ভয়াল রাত্রির দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়েছে। আবার জনপদে, লোকালয়ে, ক্ষেতে-খামারে শোনা যাচ্ছে দুর্গতের আর্তরব। পশ্চিম পাকিস্তানী নরঘাতকদের নিষ্ঠুর প্রলাপের ফলে এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃত্যুর আলপনা। ভয়াল সব দৃশ্য।

দেশপ্রেমিকদের গলিত লাশে দুঃখের প্রস্রবণ। এখানে জীবনের স্পন্দন নেই। প্রাণের কলতান নেই। মিলিটারি শকুনের ব্যবচ্ছেদে থেমে গেছে সব। তাই সাধারণ মানুষ বার বার প্রশ্ন করে ইতিহাসের কাছে—কেন এই স্বাধীনতা? কেন এই দেশ বিভাগ?

১৯৩০ সাল থেকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ যে পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন সেই স্বপ্নকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ দেশবিভাগের অনতিকাল পরেই নিদারুণ ভাবে হতাশ হয়েছিলেন। কারণ দেশবিভাগের পশ্চাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় নেতাদের বৃহৎ অংশের মধ্যে যে হিংস্র ক্ষমতার লোভটি লুকিয়েছিল সেটি দেশবিভাগের পরই যেমনটি ধরা পড়েছে, ১৯৪৭-এর আগস্টের আগে পর্যন্ত ততটা জনগণের চোখে ধরা পড়েনি। কারণ তখন বিদেশীদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করাটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য, অন্য আর যা কিছু সবটাই সাধারণের নজর এড়িয়ে গেছে।

দেশ বিভাগের জন্য কোন্ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অধিক দায়ী?—এই প্রশ্ন ইতিহাস সম্বন্ধে নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক; কিন্তু, তবুও ইতিহাসের দলিল থেকে একথা প্রমাণ করা যায় যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের দূরদৃষ্টির অভাব ও গোঁয়ার্তুমির ফলেই একদল ক্ষমতালোভী মুসলমান রাজনীতিবিদ্‌কে ভারত বিভাগের বদ্ধমূল ধারণার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতালোভী হিন্দু নেতৃত্বের গোঁয়ার্তুমিকে জনসমক্ষে হেয় করার পণ

নিয়ে একদল ক্ষমতালোভী মুসলমান নেতৃত্ব নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই দেশ বিভাগের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে জোর করে এই উপমহাদেশের জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও দেশবিভাগের আগে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, দেশ ভাগ না হলে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শান্তি নষ্ট হবে এবং রক্ত-গঙ্গা বয়ে যাবে। আজ দীর্ঘ ২৩ বছর স্বাধীনতার পর অবশ্য এই উপমহাদেশের জনগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পেরেছেন যে লাভের মধ্যে দেশটাই ভাগ হয়েছে এবং 'দুভাগ পিঠে' দুদল লুটেপুটে খাচ্ছেন, কোন দিক দিয়েই কোন শান্তি ফিরে আসেনি।

সেদিন. দেশ বিভাগের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে (১৯৪৬), এবং তারও ছ-বছর আগে যখন মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে মুসলমান নেতৃবৃন্দ 'দুই জাতি' তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের প্রস্তাব সোচ্চার ভাবে ঘোষণা করেছিলেন, তখন কিন্তু এই উপমহাদেশের একদল প্রগতিশীল নেতা বার বার জাতি গঠনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, "জাতি কোন সময় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না, জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাবে বিকশিত একটি জনসমষ্টি—যারা দীর্ঘকাল যাবৎ একই ভূখণ্ডে বাস করেন, একই ভাষায় কথা বলেন, একই অর্থনৈতিক জীবন যাপন করেন এবং একই সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে যাদের একই প্রকার গড়ন প্রকাশিত হয়।" —কিন্তু সেদিন এই কথাগুলো কারোরই কানে যায় নি, এমন কি আজ এই উপমহাদেশের যে দুই অংশের লোক 'জয় বাংলা' বলে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলছেন তাঁরাও সেদিন এই বক্তব্যকে 'কমিউনিস্টদের পাগলামি' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ যখন 'জয় বাংলা' আন্দোলনের জোয়ার 'দুই জাতি' তত্ত্বকে ভাসিয়ে

নিয়ে গেছে, তখন আবার সময় এসেছে পিছন দিককার কিছুটা হিসাব নিকাশের।

বর্তমান আলোচনাটি 'জয় বাংলা' আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা হলেও এখানে বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের আলোচনার চাইতেও পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছর আগেকার ইতিহাস থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালের মিলিটারি শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর পর্যন্ত ইতিহাসের আলোচনা করার প্রয়াস পাব। আজ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বীজ লুকিয়ে আছে বিগত দিনের ইতিহাসের মধ্যে।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মুসলমান নেতৃবৃন্দই, বিশেষত বাংলা দেশের মুসলমান নেতৃবৃন্দ যে দেশ বিভাগের বিপক্ষে ছিলেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে অতি পরিষ্কার ভাবে বর্তমান। যদিও মুসলিম লীগের গোড়া পত্তনের সময় থেকেই (১৯০৬) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দলকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে ফাটল ধরাবার কাজে ব্যবহার করবার জন্যই উৎসাহিত ছিলেন, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যে মুসলমান বিরোধিতা ও ক্ষমতার লোভ জনকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিকে আচ্ছন্ন করে তোলেনি, ততদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ব্রিটিশ শাসকগণ কি ধরনের উৎসাহিত হয়েছিলেন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর কাছে একজন ব্রিটিশ অফিসারের চিঠি থেকে সেই ধারণার নজির মেলে। তিনি লিখেছিলেন :

"আমি মহামান্য ভাইসরয় বাহাদুরের কাছে একটুখানি লিখে জানাচ্ছি যে, আজ একটা অত্যন্ত বিরাট ব্যাপার সংঘটিত হয়ে গেছে। জাতীয় রাজনীতিতে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে যেটি ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বহু বছর পর্যন্ত বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করবে। এটি কম করে ৬ কোটি ২০ লক্ষ ভারতবাসীকে মুসলমান বিদ্রোহী বিরোধী শক্তির (কংগ্রেসের) সঙ্গে হাত মেলাতে নিরস্ত করার চাইতেও বেশি কিছু করবে।"

এই ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেছে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হননি। এমনকি ১৯০৬-এর পর থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্ত দলিলে তারা এই দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখতে বাধ্য হয়েছিল: "unprecedented fraternisation between the Hindus and Moslems ......extraordinary scines of fraternisation."

১৯১৯-এর পরও তিন চার বছর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন রকম কোন মনকষাকষির সূত্রপাত হয় নি। এই সময় ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে যে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল সেই আন্দোলনে মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও মুসলমান জনগণ কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁদের বীরত্ব ও দেশপ্রেম প্রমাণ করেছেন। এই সময় আলিভ্রাতৃদ্বয় ও হুসেন আহমেদ মাজানী সৈন্যবাহিনীকে রাজনৈতিক অনুপ্রেরণা দান করবার জন্য ৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯২১ সালেই কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের মধ্যে প্রথম তিক্ততার সৃষ্টি হয়। এই সময় খিলাফৎ আন্দোলনের নেতারা

দাবি করেন যে 'স্বরাজ' কথাটিকে 'পূর্ণ স্বাধীনতার' অর্থে ব্যবহার করতে হবে। ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে মৌলনা হাস্‌রাৎ মোহানী প্রকাশ্য ভাবে এই দাবি জানান। যদিও এই দাবির মধ্যে কোনরকম কোন অন্য উদ্দেশ্য ছিল না তবুও গান্ধীজি এই দাবির বিরুদ্ধে ভীষণ ভাবে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেন এবং বললেন : "এই দাবি আমাকে খুবই চিন্তান্বিত করে তুলেছে এবং আমি মনে করি এই দাবি বিশেষভাবে দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।" এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে এর পরবর্তীকালেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে 'স্বরাজ' ও 'পূর্ণ স্বাধীনতার' প্রশ্নে এই জাতীয় দলের মধ্যে বহুবার বহু ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। সি আর দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাকেও কংগ্রেস ত্যাগ করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি আদায়ের জন্য আলাদা দল করতে হয়েছে।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজি হঠাৎ যখন অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন, খিলাফৎ নেতারা তাঁর এই কাজের তীব্র সমালোচনা করলেন। এর পর থেকে ভারতের রাজনীতিতে দেখা দিল এক হতাশার ভাব। আর এই হতাশার মধ্যে সেই কংগ্রেস লীগ পার্থক্যের বীজ বপন করা হল। যেটি ধীরে ধীরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাত করে।

অতএব, এখন দেখা যাচ্ছে ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে কবি ইকবালের পাকিস্তানের দাবি এবং তার দশ বছর পর ১৯৪০ সালের লাহোর মুসলিম লীগ সম্মেলনে দেশ বিভাগের দাবি হঠাৎ কোন ব্যাপার নয়। এর পিছনে রয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের এক বিরাট দায়িত্ব।

১৯২২ সালের পর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের যে বিরোধের সূত্রপাত হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেই ফাটলকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের

ক্ষতি করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই সময় থেকে তাদের 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসিকে' পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী করবার তাগিদে গোঁড়া মুসলিম লীগ নেতাদের মদত দিতেও পিছপা হন নি। এর পরবর্তী কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও অতি বীভৎসরূপে দেখা দেয়। যার ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য আরো আঘাতপ্রাপ্ত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃত্বের মধ্যে এই সময় মুসলমান বিরোধিতা এমন চরমে ওঠে যে ১৯২৫ সালে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরোধিতা করবার জন্য হিন্দু মহাসভার সৃষ্টি হয়। এর পর যদিও ১৯২৭ সালে যৌথভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সিমন কমিশনের বিরোধিতা করেন, কিন্তু এই দুই দলকে আবার এক করবার প্রয়াস ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় সম্মেলনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়।

এই পটভূমিতে এলো ১৯৩৭ সালের নির্বাচন। ১৯৩৫ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে এবং বৃহৎ ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির নির্বাচন। এই নির্বাচনে দেখা গেল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নির্বাচনের লড়াইতে নেমেছেন। এই নির্বাচনে সাধারণ আসনগুলিতে কংগ্রেস অর্ধেকের মত আসন লাভ করলেন (১,৫৪৫টির মধ্যে ৭১৫টি)। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য যে আসনগুলি সীমাবদ্ধ ছিল সেখানে কিন্তু তাঁরা বিশেষ নাক গলাতে পারলেন না। মুসলমানদের জন্য ৪৮২টি সীমাবদ্ধ আসন ছিল, তার মধ্যে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন মোট ৫৮টি আসনে এবং জিততে পারলেন মোটে ২৬টি আসনে। এই সময় থেকেই কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসকে তার হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের গোঁয়ার্তুমির মাশুল দেওয়া শুরু করতে হল। কিন্তু

পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পরও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ভারতীয় জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি তাকিয়ে এই দুই দলের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব জাগিয়ে তোলবার তেমন কোন প্রচেষ্টা করেন নি। বরং তার উল্টোটাই করেছেন।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ দল কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে মন্ত্রিসভা গঠনে ও আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে একটা বোঝাপড়ায় আসতে অনুরোধ জানান। কিন্তু কংগ্রেস দল তাদের সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং কংগ্রেস ছাড়া জাতীয় স্তরে অন্য কোন দলের অস্তিত্বকেও তাঁরা স্বীকার করতে রাজি হন না। যার মাশুল অবশ্য পরবর্তী সময় আরো বেশি করে দিতে হয়েছে। এই সময় জিন্নার কাছে এক চিঠিতে (১৯৩৭ জানুয়ারী) নেহরু লিখলেন :

"বর্তমান পরিস্থিতি পর্যন্ত বিশেষ ভাবে পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে আজ ভারতবর্ষে কেবল দুটি শক্তিই আছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেস—যে কিনা সারা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে......মুসলিম লীগ কেবলমাত্র একদল মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে তাঁরা সবাই গণ্যমান্য লোক, কিন্তু তাঁদের কার্যক্ষেত্র উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং তাঁদের সঙ্গে মুসলমান জনসাধারণের কোন যোগাযোগ নেই। এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ খুবই সীমিত।"...

এই সমস্ত ঘটনার পর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব কখনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করবার ব্যাপারে তাদের দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না। এখানে আরো স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৩২ সালে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' ঘোষিত হয়েছিল সেটিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব কর্তৃক 'গোলটেবিল

বৈঠকে' কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে না পারার দরুনই ত্বরান্বিত হয়েছিল। একথাও শোনা যায় যে ডাঃ আনসারি, চৌধুরী কালিউজ্জামা প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করবেন বলে শাসিয়েছিলেন, যদি কিনা কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিষয়ে কোন রকম স্থির সিদ্ধান্তে না এসে এই অ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা করেন।

এই স্থানে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ভুল পদ্ধতি অনুসরিত হয়েছিল সেটিও স্মরণ করা উচিত। আমরা জানি যে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে, যে দিনগুলিকে আমরা 'স্বদেশী' আন্দোলনের জোয়ারের যুগ বলে চিহ্নিত করি, সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন তিলক, অরবিন্দ ঘোষ এবং অন্যান্যরা—যাঁরা এই আন্দোলনকে কিছুটা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছিলেন। এমন কি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যুগ্ম নেতা হিসাবে পরিচিত মহাত্মা গান্ধীজিকেও হিন্দুস্তোত্র সভায় খুব কম দেখা গেছে। একথা মনে করলে খুবই খারাপ লাগে যে গান্ধীজির মত নেতা যখন হিন্দুদের সম্বন্ধে বলেছেন তখন তিনি 'আমরা' বলে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমানদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন 'ওরা'। তিনি ১৯২৪ সালে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখেছিলেন—"যদি আমরা মুসলমানদের হৃদয় জয় করতে চাই তবে নিশ্চয়ই আমাদের আত্মশুদ্ধির জন্য তপস্যা করে যেতে হবে।"

আগেই বলেছি ১৯৪০ সালে লাহোরের মুসলিম লীগ সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য ভারত বিভাগের প্রস্তাব কোন হঠাৎ ঘটনা নয়। এর পিছনে বিরাট ইতিহাস বর্তমান।

ভারতবর্ষে বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে যেমন আজকের প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশক্তির পূর্ব ইতিহাসের আদিপর্ব অতি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে, তেমনি করেই আজকের পূর্ব বাংলার দীর্ঘ আন্দোলনের সীমান্ত পর্বে 'জয়বাংলা' আন্দোলনকে ধরতে গেলেও চোখে পড়বে সেই একই ইতিহাসের একটি অতি পরিষ্কার ক্রমবিবর্তনের ধারা। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই জানেন যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকেই ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে বাংলাদেশের একটি অতি নিজস্ব ভূমিকা ছিল। এমন কি ১৯১৯ সালের পর সারা ভারতের রাজনীতিকে যখন ধীরে ধীরে কংগ্রেসী যুগের পূর্ণ জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তখনও কিন্তু বাংলাদেশ ত৷৷ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। সে একদিকে বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে, অন্যদিকে নিজস্বভাবে নিজের মত করেও চলেছে। যেটিকে ঠিক একলা চলার পথ বলা চলে না, বলা চলে স্বতন্ত্র চি॰॰র অভিব্যক্তি। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীজির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা বাংলার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই একাধিকবার বাংলাদেশ এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বিদ্রোহ অবশ্য জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করবার জন্য নয়। এই আন্দোলনকে মেরুদণ্ডহীন আপোস মীমাংসার পথ বর্জন করে বিপ্লবী পথে পরিচালনা করবার প্রয়োজনে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—দীর্ঘপথ এই বিদ্রোহের বাণীতেই সোচ্চার। আরো একটা কথা এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের চলার পথে এই বাঙালী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান সম্প্রীতি। সি আর দাশ যখন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন তখন থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রভূত পরিমাণে বিনষ্ট হলেও, সি আর দাশের প্রচেষ্টায় হিন্দু-

মুসলমান সম্প্রীতির যে ইমারতের ভিত্তি উঠেছিল বহু ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও সেই ভিত্তির উপর আজ যে 'জয় বাংলার' ঐতিহাসিক ইমারত গড়ে উঠছে সেটি তাঁর উত্তরসূরী ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্ব থেকেই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কিভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' বইতে। তিনি একই সাথে লিখেছেন যে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কিভাবে অসাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের নেতাদের সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে বলি হন এবং বাধ্য হয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করতে শুরু করেন। আজাদ আরো বলেন যে, এই ঘটনাই পরে পাকিস্তান সৃষ্টিতে মদত যোগায়। আজাদ লিখেছেন :

—"It is a matter of great regret that after he died (Mr. C. R. Das), some of his followers assailed his position and his declaration was repudiated. The result was that the Muslims of Bengal moved away from the Congress and the first seed of partition were sown."—(India Wins Freedom by Azad, Page-21)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনীতি সারা ভারতের রাজনীতির সঙ্গে তাল রেখে এমন এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়, এবং এই সময় থেকেই রাজনীতির উপর দিকটায় কিছুটা অসাম্প্রদায়িকতার লেবেল লাগানো থাকলেও এই রাজনীতি যে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির সূত্রপাত করে সেটি আর কেউ না বুঝুক মৌলানা আজাদ, শরৎ বসু প্রভৃতি নেতারা খুব ভাল ভাবেই

বুঝেছিলেন। ১৯৪৬ সালে মৌলানা আজাদের বক্তব্য থেকেও সেটি পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে এসেছে। যে ইতিহাস পরে আলোচনা করব।

১৯৩৭ সালে জিন্নার কাছে নেহরুজির চিঠিখানি আগে উল্লেখ করেছি। সেটির মধ্যে নেহরু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন একটি দলের নেতৃবৃন্দ বলে ঘোষণা করেছেন। সম্ভবত নেহরু সেই সময় থেকেই ভারতের মানচিত্র থেকে বাংলা দেশকে বাদ দিয়ে জাতীয় মুক্তির কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন, না হলে বাংলাদেশে এই সময়ের অনেক আগে থেকেই কৃষককুলের যে নবজাগরণ শুরু হয়েছিল সেটা তাঁর মতো একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদের চোখে কি করে এড়িয়ে গেল সেইটাই আশ্চর্যের কথা। আজ যুক্তবঙ্গের ইতিহাসের সমীক্ষা করতে গেলে চোখে পড়ে একদল শতাব্দীব্যাপী নিপীড়িত মানুষের রায়ের ফলেই এই বঙ্গদেশ একদিন ভেঙ্গে দুই দেশের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই শতাব্দীর অন্ধকারে থাকা কৃষককুলের ধীর জাগরণ শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকে। এই জাগরণের নেতৃত্বে ছিলেন কিন্তু মুসলমান নেতাগণ, যার মধ্যে ফজলুল হক, জনাব নওশের আলি, জনাব বদরুদ্দোজা প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজ পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস ও এই প্রবল জনজাগরণের ইতিহাসকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এই অংশের সাধারণ মানুষের ইতিহাস, তাদের আন্দোলনের ইতিহাসকে জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাদের উপর শতাব্দীব্যাপী মর্মান্তিক শোষণের ইতিহাস জানাও বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন না হলে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অকস্মাৎ বিস্ফোরণের সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে।

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সাম্রাজ্যবাদী শাসক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি তৎকালীন বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নামে এদেশের কায়েমী স্বার্থবাদী জমিদার গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। ব্রিটিশ সরকার তাদের এজেন্ট এই সব দেশী জমিদারদের ইচ্ছামত খাজনা নির্ধারণ এবং আদায়ের সুযোগ দেয়। ফলে জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচার অপ্রতিহত ভাবে একশত বছরের অধিককাল চলতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শহিদ তিতুমীর ও হাজী সরীয়তুল্লাহ জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। কিন্তু এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

একশত বছরের অধিককাল ব্রিটিশ অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচারে ও শোষণে বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষক ও প্রজা সম্প্রদায় দেউলিয়ায় পরিণত হয়। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাও এই শোষক শ্রেণীর করায়ত্ত হয়েছিল। তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানদ্বয়—জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বৃহৎ জমিদার ও শিল্পপতিদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। ঠিক এই সময় বাংলাদেশের কৃষককুলের স্বার্থরক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন জনাব ফজলুল হক। তিনিই প্রথম বাঙালী নেতা, যিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের প্রজা ও কৃষক সম্প্রদায়কে জমিদার ও মহাজনের অত্যাচার এবং শোষণ থেকে মুক্ত করবার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তিনি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কৃষক ও প্রজার নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত তাদের মুক্তি কোনদিনই আসবে না। সব চাইতে আশ্চর্য লাগে যখন দেখা যায় যে বৃহত্তর দেশের এক অংশে যখন একদল অসাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় সর্বহারা ও নিম্নবিত্ত

মানুষের জন্য আন্দোলন পরিচালিত হতে শুরু করেছে, তখন জাতীয় নেতৃত্বের ভাবীকালের দেশনায়কগণ এই জাগরণকে কোনরকম কোন মর্যাদা পর্যন্ত দান করে নি।

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ফজলুল হককে পরাজিত করবার জন্য মুসলিম লীগ খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রার্থী দাঁড় করান। নির্বাচনের আগে ফজলুল হক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেই বিবৃতিটি সর্বকালীন ইতিহাসে তাঁকে গরীবের বন্ধু ও অবিভক্ত বাংলার একজন অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে প্রমাণ করবে।

"আজ আমি বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এমন এক অতুলনীয় নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে চলেছি যা এদেশের অর্থশালী নবাব ও স্বেচ্ছাচারী 'নাইটদের' বিরুদ্ধে এক আপোসহীন সংগ্রামের বলিষ্ঠ প্রস্তুতি হিসাবে অমর হয়ে থাকবে। যদি এই নির্বাচনে আমি পরাজিত হই, তা হলে 'ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ানের পরাজয়ের চাইতেও বেশি গৌরবজনক হবে।"

নির্বাচনে জনাব ফজলুল হক ১৩ হাজার ভোটে জয়লাভ করেন। এই নির্বাচন সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন তুর্কী লেখক খালেদা এজিব খানম (কামাল আতাতুর্কের এককালীন বিপ্লবী সহকর্মী ও বিখ্যাত তুর্কী বক্তা) তাঁর বিখ্যাত 'ইনসাইড ইণ্ডিয়া' বইতে। এজিব খানম তাঁর বইতে লিখেছেন যে, "শেরে বাংলার এই নিবাচনী বিজয়ের পিছনে একটি জিনিসই বিশেষ ভাবে কাজ করেছিল, সেটা হচ্ছে জনাব ফজলুল হক ছিলেন কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের হাসিকান্নার শরিক। ফলে কৃষকেরা তাঁকে প্রাণের চাইতেও বেশি ভালবাসতেন। আর এই কারণেই তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী তাঁকে ঢোল সহরৎ করে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালাবার দরকার হয় নি।"

আগেই বলেছি যে ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের

পর বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন ব্যাপারে কংগ্রেসের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ার প্রশ্নে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আবেদন অগ্রাহ্য করবার ঘটনা থেকেই পাকিস্তান প্রশ্নের একটি ভিত্তি রচিত হয়েছিল, যে সম্বন্ধে মৌলানা আজাদ তাঁর 'India Wins Freedom' বইতে সরাসরি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তথা জওহরলাল নেহরুকে দায়ী করেছেন :

"আমি এলাহাবাদে ফিরে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম যে জবাহরলাল এক চিঠিতে চৌধুরী খালিউজ্জামান এবং নবাব ইসমাইল খানকে জানিয়েছেন যে তাদের দুজনের মধ্যে যে কোন একজনকে মন্ত্রিসভায় নেওয়া যেতে পারে। তিনি আরো বলছেন যে এঁদের মধ্যে কাকে নেওয়া হবে সেটি মুসলিম লীগ দলই ঠিক করে দেবে। কিন্তু আমি যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কিছুই করা হয়নি। অতএব, তাঁরা এই ব্যাপারে তাঁদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে জানান যে, তাঁরা জবাহরলালের প্রস্তাব মানতে রাজি নন।

এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনার সূত্রপাত করে। যদি উত্তর প্রদেশে লীগের এই একতার প্রস্তাবকে মেনে নেওয়া যেতো তবে অন্তিম বাস্তব ভাবেই মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যেতো। জবাহরলালের কার্যকলাপ উত্তর প্রদেশের লীগকে নতুন ভাবে বাঁচবার রাস্তা করে দিল। ভারতের ইতিহাসের সমস্ত ছাত্রেরই জানা আছে যে এই উত্তর প্রদেশ থেকেই লীগের নতুন করে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। মিঃ জিন্না এই ঘটনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং উল্টো চাপ সৃষ্টির রাস্তায় এগুতে শুরু করেন। যেটি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করেছিল।"

১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এগারটি প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার একটুখানি হিসাব দিলেই

বোঝা যাবে যে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস দলের জনগণের মধ্যে কি ধরনের সমর্থন ছিল।

	আসন লাভ	শতকরা ভোট
মাদ্রাজ	১৫৯	৭৪%
বিহার	৯৮	৬৫%
বাংলা	৫৬	১১% (মোট ২৫০টি আসন)
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৭০	৬৫.৫%
বম্বাই	৮৬	৪৯%
যুক্তপ্রদেশ	১৩৪	৫৯%
পাঞ্জাব	১৮	১০.৫%
উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ	১৯	৩৮%
সিন্ধু	৭	১১.৫%
আসাম	৩৩	৩১%
উড়িষ্যা	৩৬	৬০%

এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছটি প্রদেশেই কংগ্রেসী সদস্যরা সংখ্যাধিক্য লাভ করেন।

১৭ ও ১৮ মার্চ ১৯৩৭ দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হ'ল। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে বলা হল যে, প্রাদেশিক লাটগণ যদি এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, তাঁরা তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না বা আইনানুগ শাসন সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন না তা হলে কংগ্রেস সদস্যদের পক্ষে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্ভব। প্রত্যেক প্রদেশের কংগ্রেস দলের নেতাকে লাট সাহেবের প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে।

১৯৩৭-এর নির্বাচনের পটভূমিতে বাংলা দেশের কথা একটু বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। এই নির্বাচনে পুণা চুক্তি অনুযায়ী

হিন্দুদের দেওয়া হল ৮০টি আসন এবং এই আশিটির মধ্য ৩০টি আসন অনুন্নতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। অন্যদিকে অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাদেশেও মুসলমানদের মধ্যে একাধিক দল। নির্বাচনের পর দেখা গেল যে কোন দলই এখানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্বাচনে জিততে পারেন নি। নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা দলের মধ্যে একটি আপস রফা হয় এবং জনাব ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সময় সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন প্রদেশে যখন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের টানাপোড়েন চলছে, ঠিক তখনই ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে নিজেদের নিয়োজিত করে জনগণ কর্তৃক বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হতে শুরু করেন। একথা অনস্বীকার্য যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শাসনকালে বাংলা দেশের কৃষক ও প্রজা সম্প্রদায়ের অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। কৃষক প্রজা সমিতির মূল কর্মসূচি অনুযায়ী শেরে বাংলা ১৯৩৮ সালে মহাজনী আইন পাশ করে বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে মহাজনী-ঋণ থেকে মুক্ত করেন। শেরে বাংলার নির্দেশে বাংলাদেশে ৬০ হাজার ঋণ সালিশী বোর্ড স্থাপিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই আইনের বিরোধিতা করবার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার মহাজন শ্রেণী তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু শেরে বাংলার অনমনীয় দৃঢ়তা ও তাঁর সহকর্মীদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার কাছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমস্ত চক্রান্তই ব্যর্থ হয়। এই একই বছরে তিনি বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করিয়ে জমির উপর কৃষকের মালিকানা স্থাপন করেন। এই আইনের ফলে জমিদারগণ শুধুমাত্র নির্ধারিত খাজনা আদায়ের অধিকার পায়। কিন্তু খাজনা বৃদ্ধির ও অন্যান্য কর আদায়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকালে কৃষক ও প্রজাসাধারণের স্বার্থে এই

যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি করা হয়েছিল তার দ্বারা কেবলমাত্র কৃষক সাধারণের উন্নতিই হল তাই নয়। এই কার্যকলাপের ফলে ফজলুল হক প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবৃন্দের উপর সাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা অধিক পরিমাণে বর্ধিত হল।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠন ব্যাপারে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে এই তিক্ততা আরো প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। এই বছর মিঃ জিন্না নেহরুর সঙ্গে এক সাক্ষাতে বললেন যে, ১৯২৯ সালের যে ১৪ দফা দাবির ভিত্তিতে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল তিনি সেটি স্বীকার করেন না এবং এই দাবির মধ্যে তিনি আরো অনেকগুলি দাবি যোগ করেন এবং সেইগুলিকে কার্যকরী করবার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর দাবির মধ্যে প্রধানত তিনটি দাবি ছিল মুখ্য—(১) কংগ্রেস কমিউনাল অ্যাওয়ার্ডের বিরোধিতা করতে পারবে না; (২) ত্রিবর্ণ পতাকার পরিবর্তন করতে হবে; (৩) বন্দেমাতরম গানটিকে বর্জন করতে হবে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কংগ্রেস বন্দেমাতরম গানের কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে দেবার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন, কিন্তু এই ঘটনাটি হিন্দু মুসলমান কোন সম্প্রদায়কেই সন্তুষ্ট করতে পারল না। ইতিমধ্যে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির জন্য জিন্নার সঙ্গে নেহরু ও সুভাষ বসুর কয়েক দফা আলোচনা হয়। কিন্তু সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি।

ইতিমধ্যে আবার নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ এই সময় ঘোষণা করে যে, তারা কংগ্রেসের সঙ্গে কোন ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে রাজি নয়। একমাত্র তারা কংগ্রেসের সঙ্গে বসতে রাজি থাকবে যদি কিনা কংগ্রেস মুসলিম লীগকে ভারতের মুসলমান

সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি দল হিসাবে স্বীকার করে নিতে রাজি থাকে। একথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ সম্মেলন থেকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দাবি করা হয় এবং এই একই সঙ্গে তাঁরা দাবি করেন যে ভারতবর্ষকে 'একটি গণতান্ত্রিক ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যার মধ্যে সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পূর্ণ অধিকার সংবিধানে মেনে নিতে হবে।'—এই সম্মেলনের এই সমস্ত দাবিসমূহ কি ধরনের পরিবর্তন আনতে পেরেছিল সেটি বোঝা যায় এর পরবর্তী মাসে বিভিন্ন প্রাদেশিক সভাগুলিতে বিভিন্ন দলের প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী অধিক সংখ্যক মুসলমান প্রতিনিধিদের মুসলিম লীগে যোগদানের দ্বারা। যদিও তখনও 'পাকিস্তানের' দাবি তেমন সোচ্চার হয়ে ওঠেনি কিন্তু জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ অতি ধীর পদক্ষেপে সেই দিকে এগুতে শুরু করেছিল। কারণ তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন ভাবে বাজিয়ে দেখে বুঝেছিলেন যে শক্ত হুমকিকে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সর্ববিষয়ে আপসকামী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বহুদিন আগেই হারিয়ে ফেলেছেন। এই সময় আবার কংগ্রেসের ভিতরকার দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব এই দলের মধ্যে গভীর সঙ্কটের সৃষ্টি করে, এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যে জাতীয় রাজনীতির অগ্রগতিকেও রুদ্ধ করে দিয়েছিল সেটি পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ঠিক সেই মুহূর্তেও এই আত্মকলহ পরিত্যাগ করে জাতির স্বার্থে একতাবদ্ধ হতে বিফল হয়েছেন। কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনে সভাপতি পদের জন্য গান্ধীজি মনোনীত প্রার্থী পট্টভী সীতারামাইয়ার পরাজয়ের পর গান্ধীজির মতো নেতা যে ধরনের ব্যবহার করেছিলেন সেই ঘটনার দ্বারা কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ একেবারে নগ্নভাবে জনসাধারণের চোখে ধরা পড়ে। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যে এই অধিবেশন থেকেই

কংগ্রেসের মধ্যেকার বামপন্থী শক্তি দক্ষিণপন্থী শক্তির দ্বারা কোণঠাসা হতে শুরু করে।

এর পরের বছর (১৯৩৯ সালে) এপ্রিল-মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভা বসল কলকাতায়। এই সভায় সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করলেন। এর পর কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব চরমে গিয়ে পৌঁছুল। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক সৃষ্টি হলেও সবভারতীয় ক্ষেত্রে এই দল কংগ্রেসের সংগঠনকে দুর্বল করতে সক্ষম হল না। কারণ নিত্য অভ্যাসের মতো কংগ্রেসের রাজনীতিকে জাতীয় রাজনীতি হিসাবে মেনে নেওয়া তখন ভারতবাসীর একটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯৪০ সালকে এক দুঃখজনক বছর হিসাবে চিহ্নিত করা হয় বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিব্যাপ্তির জন্য। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৪০ বহন করে এনেছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক দুঃখকালের সূচনা। এই বছরই সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সমস্ত রাস্তা ঐতিহাসিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পুরনো তিক্ততা নতুন ক্ষমতালাভের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক হিংস্র পথযাত্রার সূচনা করলো ১৯৪০।

এই সময়ের কিছুকাল আগে থেকেই মিঃ জিন্নার মতো একজন প্রগতি-অভিমানী নেতা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদকে বদ্ধমূল করবার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচারে সরব হয়ে উঠেছিলেন। শুধু ধর্মই নয়, আচারে-ব্যবহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, ভাষায়-সাহিত্যে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং মুসলমান যে দুটি স্বতন্ত্র জাতি এই প্রচার তখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এই সঙ্কটময় বছরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যে দুই সম্মেলন

অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলন দুটি বর্তমানকালে পিছন দিককার ইতিহাস বিচার করে বর্তমানের সূত্র সন্ধান পর্বে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়।

এই বছর কংগ্রেসের অধিবেশন বসল রামগড়ে। এই সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্নার সাম্প্রদায়িক উসকানীর বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্ব লাভ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত থেকে সংখ্যালঘিষ্ঠদের যে কোনরূপ কোন নির্যাতনের ভয় নেই সেটি অতি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেন। তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহারে এই দুই সম্প্রদায়ের একাত্মতা সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখেন সেটি চিরকাল তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির একটি অন্যতম অবদান হিসাবে নিঃসন্দেহে ইতিহাসের স্বীকৃতি লাভ করবে। তিনি বলেন :

"গত এগার শ' বছরের ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদের (হিন্দু ও মুসলমান) উভয়েরই কীর্তিগৌরবে সমুজ্জ্বল। আমাদের ভাষা, কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ঘটনা—এর সপক্ষে উভয়েরই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। জাতীয় জীবনের এমন কোন দিকই নাই যার উপর এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ছাপ না পড়েছে। আমাদের ভাষা পৃথক ছিল, কিন্তু কালে আমরা এক ভাষাতেই কথা বলতে শিখেছি। আমাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি স্বতন্ত্র ছিল, কিন্তু পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হওয়ায় শেষে উভয়ের সংমিশ্রণে এ-সবই অভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের আগেকার পোশাক পুরাতন চিত্রে দৃষ্ট হয়। আজকাল কাউকে আর এরূপ পোশাকে দেখা যায় না। এই সম্মিলিত সম্পদ আমাদের এক জাতীয়তারই প্রতীক। আমরা এটা পরিত্যাগ করে সে যুগে ফিরে যাব না যেখানে আমরা স্বতন্ত্র ছিলাম। যদি কোন হিন্দু মনে করেন

যে, হাজার বছর পূর্বেকার হিন্দু জীবন-যাপন প্রণালী আবার ফিরিয়ে আনবেন তবে বলতে হবে এ তাঁর দিবাস্বপ্ন। আবার যদি কোন মুসলমান মনে করেন যে, হাজার বছর পূর্বে ইরাণ ও সর্ব-এশিয়ার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি সঙ্গে করে এনেছিলেন তা সবই তিনি জাগিয়ে তুলবেন তবে তিনিও সমান ভ্রান্ত। তাঁদের এই ভ্রান্তি যত শীঘ্র দূর হয় ততই মঙ্গল। এই দুইটি চিন্তাই অস্বাভাবিক। বাস্তবের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। আমার দৃঢ় মত এই। ধর্মে এরূপ পুনরুজ্জীবনের অবকাশ আছে, কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে এর কোন স্থান নেই।"

১৯৪০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশাপাশি মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশন বসে এবং এই অধিবেশনেই পাকিস্তানের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই অধিবেশন থেকে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও তীব্র মন্তব্য করা হয় এবং ভারত বিভাগের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এক প্রস্তাব পাশ করা হয়। মূল প্রস্তাবটিতে দেশ বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দাবি জানান হয় :

"The following basic principle, namely that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted, with such territorial adjustments as may be necessary, that the area in which the Muslims are numerically in a majority as in the northwestern and eastern zones of India *should be grouped to constitute 'Independent States' in which the Constituent units shall be autonomous and sovereign.*"—

লাহোর সম্মেলনের বিস্তৃত আলোচনা করবার আগে এখানে একটুখানি উল্লেখের প্রয়োজন যে, আজ পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম

পাকিস্তানের যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে উঠে পূর্ব পাকিস্তান (বাংলা দেশ)-কে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে তার মূলে রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগণ কর্তৃক লাহোর প্রস্তাবকে মেনে নেবার অসম্মতি। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে। এখন লাহোর অধিবেশনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এই অধিবেশন থেকে লীগ নেতৃবৃন্দ যদিও 'ভারতের স্বাধীনতালাভের বিষয়টিকে' অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন, কিন্তু সমস্ত কিছু বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল 'দুই জাতি তত্ত্বে'র যৌক্তিকতা প্রমাণের প্রবল জোয়ার। জিন্না তাঁর সভাপতির ভাষণে যে বক্তব্য রাখেন সেটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

"এই বিষয়টি আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে আমাদের হিন্দু বন্ধুরা কেন ইসলাম ও হিন্দুধর্মের আসল প্রকৃতি বুঝতে ভুল করছেন। আসল অর্থে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তাদের ধর্ম তো সেই ধরনের ধর্ম নয়। সত্যি কথা বলতে কি এটা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতি ও সংস্কারের সমন্বয়, এবং হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের কথা কেউ যদি ভেবে থাকেন তবে সেটি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।··· হিন্দু ও মুসলমানগণ সম্পূর্ণ দুই স্বতন্ত্র ধর্ম, দর্শন, সামাজিক সংস্কার ও সাহিত্যের থেকে উদ্ভূত।···এমন কি হিন্দু ও মুসলমানগণ সম্পূর্ণ দুটি স্বতন্ত্র ইতিহাসের ধারা থেকে তাদের অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে।"

এইভাবে আরো অনেক বিশদ ভাবে মিঃ জিন্না তাঁর সভাপতির ভাষণে কেবলমাত্র 'দুই জাতি তত্ত্ব'কেই সোচ্চার ভাবে উপস্থিত করেন।

১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে মিঃ জিন্নার দুই জাতি তত্ত্বের ওকালতিকে যদি দীর্ঘ ইতিহাস থেকে আলাদা করে দেখা যায় তবে হয়তো খুব একটা আশ্চর্য লাগে না, কিন্তু তখনই আশ্চর্য লাগে যখন কিনা দেখা যায় যে ১৯১৬ সালে এই একই ব্যক্তি বাল গঙ্গাধর

তিলকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভাষণে সভাস্থ সকলকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আর তখনই প্রশ্ন ওঠে মিঃ জিন্নার পরিবর্তনের জন্য তাঁর ক্ষমতালোভী মনটি দায়ী না দায়ী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এক অংশের আপোসহীন মনোভাব?

১৯১৬ সালে যখন লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেস-লীগ মৈত্রীবন্ধনের চুক্তি সম্পাদিত হল তার পরই এই দুই দলের একটি যুক্ত অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ঘোষণা করেন :

"It has been said, gentlemen, by some that we Hindus have yielded too much to our Mahammedan brethern I am sure I represent the sense of the Hindu community all over India when I say that we could not have yielded too much....when we have to fight against a third party, it is a very great thing, a very important event, that we stand on this platform united, united in race, united in religion, united as regards all different shades of political creed."

একই ভাবে জিন্না সভায় সভাপতির ভাষণে বলেন :

"I have been a staunch Congressman throughout my life and have been no lover of sectarian cries. But it appears to me that the reproach of separatism sometimes levelled at the Mussalmans is singularly inept and wide of the mark when I see this great communal organisation rapidly growing into a powerful factor for the birth of a united India."

দুই

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরের মুসলিম লীগ সম্মেলন থেকে দেশ বিভাগের যে দাবি উঠেছিল, তখন থেকে দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত সেই ভুত জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের চিন্তার রাজ্যে নিয়ত তাড়া করে বেড়িয়েছে। যার ফলে তাঁরা আরো অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল ভাবে ঘটনার স্বচ্ছ গতিবেগকে অধিকতর জটিলতার দিকে নিয়ে গেছেন। জিন্নার 'দুই জাতি' তত্ত্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাগণ হিন্দুরাষ্ট্রের দাবিকে এমন একটি হাস্যকর পর্যায়ে দাঁড় করালেন এবং বললেন যে ভারতবর্ষে মুসলমানদের কোন দাবিই তাঁরা মানেন না।

এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যেকার সম্পর্ক ক্রমেই অবনতির দিকে যেতে লাগল। বিভিন্ন প্রদেশে আবার পুনরুদ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হতে শুরু করল।

এই সময়কার বাংলাদেশের অবস্থা একটু বিশেষ করে আলোচনা করা দরকার। নতুন শাসন-তন্ত্র প্রবর্তন অবধি বাংলার রাজনীতি অদ্ভুত রূপ ধারণ করল। বাংলার কংগ্রেস দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব চরমে উঠল। ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অমান্য করে আর একটি কমিটি গঠিত হল এবং বাংলাদেশের আইন সভাতেও এদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হল। সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবর্গ ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন পেলেন না। সুভাষচন্দ্র রামগড় সম্মেলনের পর কলকাতার সন্দেহজনক অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ প্রকাশ্য রাজপথ থেকে যাতে সরিয়ে দেওয়া হয় সেই জন্য আন্দোলন চালালেন। বহু স্বেচ্ছাসেবক এই জন্য নির্যাতিত হয় এবং তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ হন। তবে সুখের বিষয় যে স্মৃতিস্তম্ভ-

টিকে এর পর প্রকাশ্য রাজবন্দ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই কাজের প্রধান হোতা ছিলেন হক সাহেব। এর পর অন্তরীণ থাকা কালে ১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে তিনি স্বগৃহ থেকে নিখোঁজ হলেন। এদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস বিষিয়ে তুলল। যদিও তখন মন্ত্রিসভা ছিল মুসলিম লীগ পরিচালিত, তবুও হিন্দু সদস্যদের মতো একদল মুসলমান সদস্যও তখনকার মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করেন এবং একে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনে সাহায্য করেন। ১৯৪১ সালের ১৮ ডিসেম্বর নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এবারেও মুখ্যমন্ত্রী হলেন জনাব ফজলুল হক। এই মন্ত্রিসভা গঠনের পিছনে শরৎচন্দ্র বসুই ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা।

এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসকগণ এই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলকেই এই যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন ভাবে আবেদন নিবেদন করতে থাকেন। কিন্তু কংগ্রেসের রামগড় অধিবেশনে এবং ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী বৈঠকসমূহে স্বদেশের শাসন-তন্ত্র গঠন সম্পর্কে বলেছেন যে যুদ্ধকার্যে ব্রিটেন তথা মিত্রপক্ষকে সার্থকভাবে সাহায্য করতে হলে স্বদেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত আবশ্যক মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগও ব্রিটেনকে সাহায্য করতে অসম্মত হন, কিন্তু তা অন্য কারণে। এর কিছুকাল আগে হায়দরাবাদের অধ্যাপক আব্দুল লতিফ ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে ভাগ করে একটি ভাবী শাসন-তন্ত্রের পরিকল্পনা করেন এবং মুসলমান-প্রধান অংশের নাম দেন পাকিস্তান। এই সময় জিন্না সাহেব অনবরত প্রচার করতে থাকেন যে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ মুসলমানদের উপর অত্যাচার অনাচার করছে, এইজন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে মুসলমান-প্রধান অংশকে সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দিতে হবে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, জিন্না সাহেব যখন এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার

বিষ ছড়াতে ব্যস্ত, তখন পাকিস্তান কথাটির প্রবর্তক অধ্যাপক আব্দুল লতিফ কিন্তু এই লীগ-মার্কা পাকিস্তান ব্যাখ্যার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়া হবে কি হবে না প্রশ্নে ১৯৪২ সাল নাগাদ কংগ্রেস ও ব্রিটিশ শাসকদের দ্বন্দ্ব চরমে উঠল। এই সময় আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঝটিকা কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে যুদ্ধের সুবিধার জন্য বাংলা দেশের বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হচ্ছিল। এতে সাধারণ মানুষের কষ্টের আর শেষ থাকল না। এরই মধ্যে আবার ১৯৪২ সালে ১৬ অক্টোবর তারিখে নিদারুণ ঘূর্ণিবাত্যায় মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলার প্রভূত ক্ষতি সাধিত হল। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীদের উপর যে দমন-নীতি প্রযুক্ত হতে আরম্ভ হয়েছিল তার এতটুকুও হ্রাস পায়নি। প্রায় ৩৫ হাজার লোক এই ঘূর্ণিঝড়ে মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়ে যায় এবং শস্যাদি নষ্ট হয়ে অন্নাভাব শুরু হয়। কিন্তু এই সব ঘটনা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার জাপানের অগ্রগতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব অঞ্চলেও যুদ্ধ আইন প্রয়োগ করেন। এর ফলে ক্রমে ক্রমে খাদ্যশস্যের দর চড়তে থাকে। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের ফজলুল হক মন্ত্রিসভা মেদিনীপুরে সরকারী অনাচারের রাশ টানতে গিয়ে লাটসাহেব তথা ইংরেজ বণিক ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের বিরাগ ভাজন হন। নৈসর্গিক বিপর্যয়ে এবং সরকারী নীতির ফলে জনগণের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যাদির ভীষণ অভাব অনুভূত হতে লাগল। সে সময় ওইরূপ একটি জনপ্রিয় মন্ত্রিসভার হাতে কর্তৃত্বভার থাকলে দেশবাসীর হয়তো কতকটা সুবিধা হতে পারত, কিন্তু কর্তৃপক্ষের চক্রান্তের ফলে তারও পতন ঘটল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ঘটনার ১১ বছর পর ১৯৫৪ সালে জনাব ফজলুল হক আবার পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস মন্ত্রিত্ব করবার পরই 'রাজদ্রোহিতার' অপরাধে তাঁর মন্ত্রিত্ব খারিজ হয়ে যায়। এই বারও তিনি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তথা সমগ্র বাংলা দেশ ও বাঙালীর উন্নতি বিধান করতে গিয়ে পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের বিরাগ ভাজন হবার ফলেই এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

হক মন্ত্রিসভা পতনের এক মাস পর স্যার নাজিমুদ্দিনের প্রধান-মন্ত্রিত্বে বাংলা দেশে পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠিত হল। এঁরা ছিলেন মুসলিম লীগপন্থী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী। এই সময় থেকে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক আরো অবনতির দিকে যায়। এই মন্ত্রিসভার কার্যকালে বাংলা দেশে কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর দেখা দেয়। যে মন্বন্তরের ফলে বলি হয়েছিলেন ৫০ লক্ষ বাঙালী।

১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ আবার জমে উঠল। আবার দরকষাকষি শুরু হল দেশ ভাগাভাগি নিয়ে। কারণ, বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশদের আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন এমন চরমে উঠল যে ভারতীয় নেতারা বুঝতে পারলেন ভারত এবার স্বাধীনতা পাবেই। তারপর যুদ্ধের ঠিক পরই ব্রিটেনে শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসার ফলে এই সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ নিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই শুরু হল 'পিঠে ভাগের' দরকষাকষি।

১৯৪৫ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে এক সাংবাদিক সাক্ষাতকারে মিঃ জিন্না ব্যক্ত করলেন মুসলিম লীগের দাবি এবং উদ্দেশ্য। যে

বক্তব্যে তিনি বিগত ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনের চাইতেও একধাপ এগিয়ে গেলেন। মিঃ জিন্না বললেন :

"আজ ভারতের রাজনীতিতে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেটি মূলত ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যকার ব্যাপার নয়। এই ঘটনাটির মূলে রয়েছে হিন্দু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বন্দ্ব। কোন কিছুরই সমাধান হতে পারে না বা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পাকিস্তানের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে।"

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৩৭ সালে নেহরু মুসলিম লীগকে যে জবাব দিয়েছিলেন মিঃ জিন্না ১৯৪৫-এ তারই প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন।

মিঃ জিন্না আরো বললেন : "একটি নয়, এখানে সংবিধান তৈরির জন্য দুটি আলাদা দল করতে হবে। যার একদল হিন্দুস্থানের সংবিধান রচনা করবে এবং অন্যটি করবে পাকিস্তানের জন্য।

"আমরা দশ মিনিটে ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি যদি মিঃ গান্ধী বলেন 'আমি পাকিস্তানকে স্বীকার করে নিচ্ছি। আমি স্বীকার করছি যে, ভারতবর্ষের এক চতুর্থাংশ অধিবাসী যে ছটি প্রদেশে থাকে—সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলাদেশ ও আসাম—বর্তমানে যে সীমারেখা আছে সেইরকম অবস্থাতেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

"এটা খুবই সম্ভব যে এই দুই দেশের অধিবাসীদের স্থানান্তর করা হবে, যদি কিনা সেটা ইচ্ছাপূর্ণ হয়। সীমানা রেখা নির্ধারণের ব্যাপারটিও ঠিক করতে হবে। যদি এগুলি সবই হয় তবে বর্তমান প্রাদেশিক সীমারেখাকে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের সীমারেখা হিসাবে মেনে নিতে হবে। **আমাদের পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামো হবে ফেডারেল ধরনের যার মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন অধিকার থাকবে।...**"

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ জিন্নার নামে অশ্রুপাত না করে কথা বলেন না, সেই শাসকগণ জিন্নার মৃত্যুর পরই ভুলে গেছেন যে জিন্নাই সেই ব্যক্তি যিনি ১৯৪০ সাল থেকে পাকিস্তানের উদ্ভব পর্যন্ত বার বার বিভিন্ন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে স্বীকৃতি দান করবার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকদের দীর্ঘকাল যাবত যে বিরোধ সেই বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণই ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। অতএব বোঝা যাচ্ছে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে স্বার্থান্বেষী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে যে সমস্ত আশ্বাস দিয়েছিলেন সেগুলি কেবল মাত্র ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারই ফল হিসাবে পাকিস্তানের উদ্ভব কাল থেকেই শুরু হয়েছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রাম। যার পূর্ণ পরিণতি পরিলক্ষিত হয়েছে ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করবার মাধ্যমে।

যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৬ সালে আবার সারা দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এইবারকার নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেস নেতৃত্বের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করেছিল। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর এই কয়েক বছরের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব যে কি পরিমাণে মুসলমান সম্প্রদায়ের জনগণের কাছ থেকে সরে গেছেন তার প্রমাণ মিললো এই নির্বাচনে।

এই নির্বাচনে বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় বিপুল ভাবে মুসলিম লীগকে 'পাকিস্তান দাবির' ভিত্তিতে জয়যুক্ত করে। ঠিক এই সময় বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল

তার এক ছোট্ট বিবরণ দিয়েছেন ডোনাল্ট এন উইলবার তাঁর 'পাকিস্তান' বইতে : "The commerce of the province, however, was clearly dominated by the Hindus ; at the time of partition only 358 out of 2,237 large land holders in Bengal were Moslem ; the Hindus controlled the large and profitable jute business ; the professions ; and moneylending were mostly Hindu occupations ; and Hindus held most of the higher civil service posts. Although some of the Moslem political leaders in Bengal were enthusiastic about the idea of Pakistan, all were extremely reluctant to see the province partitioned. Yet most Moslems and Islamic state seemed to be the only answer to the long-resented domination by the Hindus, even at the price of the partition of the province. *The appeal of Pakistan was for Bengal's Moslems both religious and economic.*"

বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায় যে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিল তার মধ্যে শতাব্দীব্যাপী হিন্দু জমিদারদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার আশা যেমন একদিকে সোচ্চার হয়ে উঠছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই অন্যদিকে তাঁরা মনে করেছিলেন যে দেশ ভাগ হয়ে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলে 'আল্লাহর চোখে সকলেই সমান' এই ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠবে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে তাঁদের ধারণা সে সময় ভুল ছিল। তাই ধর্মের জিগির তুলে তাদের শাসন করছে অন্য একদল শোষক। এই নতুন ভাবনার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছিল পূর্ব-বাংলার গণ আন্দোলনের পটভূমি।

যে গণ আন্দোলন জিন্নার জীবদ্দশা থেকেই প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে।

(এখানে আবার ১৯৪৬-এর সময় থেকে শুরু করতে হবে। কারণ ১৯৪৬-এর মার্চ মাসে যখন ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এলো তখন থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত কালের রাজনৈতিক তৎপরতাও ছিল যেমন তীব্রগতিসম্পন্ন, তেমন অন্যদিকে, ঠিক এই সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের ক্ষমতার লোভের যে ভাবে নগ্ন প্রকাশ ঘটে এর পূর্বে সেটি এত বীভৎস ভাবে চোখে পড়েনি।)

ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এসেছিলেন, প্রথমত ভারতবর্ষের জাতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্তের এক চূড়ান্ত মীমাংসা করতে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় নেতারা যাতে স্বাধীনতার প্রশ্নে নিজেরাই একটি নির্দিষ্ট পথ দেখাতে সক্ষম হতে পারেন সেইজন্য তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করতে। কিন্তু কয়েকদিন কথাবার্তা চলবার পরই এই আলোচনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হলো। মিঃ জিন্নার—'পাকিস্তান দাবি না মানলে কোন আলোচনাই সম্ভব নয়'—ঘোষণা এই অচল অবস্থাকে ত্বরান্বিত করল। সত্যিকথা বলতে কি ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যগণ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছাড়া কারো সঙ্গে আলোচনা করে তেমন খুশী হতে পারেন নি। আবুল কালাম আজাদ নিজে মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর কথাবার্তা ও লেখনী থেকে খুব পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি স্বাধীনতার পর হিন্দু ভারতে মুসলমানদের অবস্থা কি হবে, সেই সম্বন্ধে খুবই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি সব সময়ই বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য জিন্নার পাকিস্তান তৈরীর যে পরিকল্পনা সেই পথে কোন সময়েই মুসলমানদের সমস্যার সমাধান হতে পারে না।) আজাদ কংগ্রেসের মধ্যেকার বিভিন্ন হিন্দু বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলবার পর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে যদি ঠিক

ভাবে পরিকল্পনা মাফিক সর্বকিছুই হয় তবে অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতার পর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা সম্ভব হতে পারে। তিনি এই বিষয়ে ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গেও কয়েক দফা আলোচনা করেন। এই বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও সমীক্ষার পর তিনি ১৯৪৬ সালের ১৫ই এপ্রিল তারিখে এক ঘোষণাপত্রে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। ইতিহাসের পাঠকদের কাছে সেটির চিরস্থায়ী মূল্য আছে। আজাদ লিখলেন :

"আমি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিটিকে সর্বতোভাবে বিবেচনা করে দেখলাম। একজন ভারতবাসী হিসাবে ভবিষ্যতে এটি ভারতবর্ষের পক্ষে কতটা উপযোগী সেটিও বিচার করে দেখেছি। একজন মুসলমান হিসাবেও এটি আমি বিচার করে দেখেছি যে ভবিষ্যতে এটি মুসলমানদের ভাগ্যকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই পরিকল্পনাটিকে সর্বতোভাবে বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি, এটি শুধুমাত্র ভারতবর্ষেরই ক্ষতি করবে তাই নয়, এই পরিকল্পনা ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষেও ক্ষতিকর। সত্যিকথা বলতে কি এই পরিকল্পনা সমস্যাগুলির সমাধান করার চাইতে সমস্যা-গুলিকে আরো বাড়িয়ে দেবে।

"একথা আমি নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করছি যে পাকিস্তান কথাটাই আমার অভিরুচির বিরুদ্ধে। এই নামের দ্বারা এইটাই বোঝায় যে, পৃথিবীর কিছুটা জায়গাই শুধু পবিত্র, অন্য সব জায়গা অপবিত্র। এইভাবে পবিত্র ও অপবিত্র তরিকায় দেশ ভাগ ইসলাম বিরোধী এবং ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুতি। ইসলাম এই ধরনের কোন ভাগাভাগি স্বীকার করে না। আল্লাহর দূত বলেছেন—'ভগবান সমস্ত পৃথিবীটাকেই আমার মসজিদ হিসাবে গড়েছেন।' এছাড়া, আমার মনে হয় যে, পাকিস্তানের পরিকল্পনা পরাজিত মনোভাবের প্রতীক এবং এটি ইহুদীদের মাতৃভূমির দাবির মতোই দাবি। একথা

অতি পরিষ্কার ভাবেই স্বীকার করতে হয় যে যেহেতু ভারতের মুসলমানগণ সারা ভারতকে নিজেদের শাসনে রাখতে পারবেন না সেইজন্য তাঁরা ভারতবর্ষের একটি কোণকে বেছে নিয়েছেন যেখানে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। যে কেউই ইহুদিদের একটি নির্দিষ্ট মাতৃভূমির দাবিকে মেনে নিতে পারেন, কারণ তাঁরা সারা পৃথিবীময় বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছেন এবং কোন দেশেরই শাসন ব্যাপারে তাঁরা কোন বক্তব্য রাখতে পারেন না। ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবস্থা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সারা ভারতবর্ষে ৯ কোটির উপর মুসলমান জনগণ সংখ্যার দিক থেকে ও গুণের দিক থেকে ভারতবর্ষের জনজীবনে ও শাসন ঘটিত সমস্ত ব্যাপারেই যথেষ্ট প্রভাবশালী। এতদুপরি প্রকৃতি তাদেরকে সাহায্য করেছে কয়েকটি বিশেষ জায়গায় তাদের একত্র করে।

"এই বাস্তব অবস্থায়, পাকিস্তানের দাবির কোন মূল্যই থাকতে পারে না। একজন মুসলমান হিসাবে আমি তো কিছুতেই সমস্ত ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব থেকে আমাকে সরিয়ে নেবার কথা ভাবতেও পারি না। আমি মনে করি যে, যেটি আমার প্রাপ্য ও যেটিতে আমার অধিকার আছে সেটি থেকে সরে যাওয়া ভীরুতারই নামান্তর।"

আজাদ শুধু এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকলেন না, তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, পাকিস্তান পরিকল্পনার মধ্যে যাই থাক না কেন, ভারতবর্ষকে কখনই ভাগ করা চলতে পারে না। সব চাইতে দুঃখের কথা এই যে তিনি যেভাবে বিষয়টিকে বুঝেছিলেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা ব্যাপারটা সেই প্রগতিশীলতার আলোকে বুঝতে অপারগ হলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, মুসলমানদের একটাই মাত্র ভয় ছিল অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতার সম্বন্ধে, তারা মনে করত

যে ভারত বিভাগ না হয়ে স্বাধীনতা হলে কেন্দ্রে যে সরকার স্থাপিত হবে সেটি হবে হিন্দু সরকার এবং তারা মুসলমানদের নির্যাতন করবে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য আজাদ এক পরিকল্পনা দিয়ে বললেন যে—"মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলি যে যার নিজের প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাবে। এই একই সঙ্গে বৃহত্তর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেবার অধিকারও তাদের থাকবে।")

এই প্রস্তাব ছাড়া বৃহত্তর ভাবে তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন সেটি নিম্নরূপ :

"The situation of India is such that all attempts to establish a centralised and unitary government are bound to fail. Equally doomed to failure is the attempt to divied India into two states. After considering all aspects of the questions, I have come to the conclusion that the only solution can be on the lines embodied in the Congress formula which allows room for development both the provinces and to India as a whole……I am one of those who consider the present chapter of communal bitterness and differences as a transient phase of India assumes the responsibility of her own destiny. I am reminded of a saying of Gladstone that the best cure for a man's fear of water is to throw him into it. Similarly, India must assume responsibility and administer her own affairs before fears and suspicion can be fully allayed. When India attains her destiny, she will forget the present chapter of communal suspicion and conflict and face the problems of modern life from the modern point of view. *Difference will no*

doubt persist but they will of economic not communal. Opposition among political parties will continue, but they will be based not on religion but on eeonomic and political issues. Class and not the Community will be the basis of future alignments and policies will be shaped accordingly.

আজাদের কি সাংঘাতিক দূরদৃষ্টি ছিল এই শেষ কয়েক লাইনেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মের জিগির তুলে একদল স্বার্থান্বেষী লোক চিরকাল মূল লড়াইকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সেই অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। শ্রেণীসংগ্রাম ইতিহাসের গতিপথে অবশ্যম্ভাবি রূপে দেখা দিতে বাধ্য। সেই সত্যই আজাদ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আর সেই উপলব্ধির আলোকে তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো বলেছিলেন—'Class and not the community will be the basis of future alignments and policies will be shaped accordingly.'

শুধু ১৯৪৬ সালেই নয়, তার বহু পূর্বেও যে আজাদ এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ মেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে তার মতামত থেকে। ক্রিপস্ মিশন যখন যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে এলো, তখন আজাদের উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ :—

"The whole world was bound to change after the war. No one who was aware of the world's political situation could doubt the India would become free."—

১৯৪৬ সালে, আজাদের পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ক্যাবিনেট মিশন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতার কাছেই একটি প্রস্তাব রাখল। প্রস্তাবে বলা হল যে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হবে না তবে

কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে মাত্র তিনটি বিষয়ের কর্তৃত্ব থাকবে—প্রতিরক্ষা, বহির্বিষয়ক সংযোগ এবং অন্তর্দেশী সংযোগ সংস্থাপন। এছাড়া সমস্ত দেশকে তিনটি পরিচালন ইউনিটভুক্ত করা হবে। গ্রুপ-'এ' প্রদেশগুলিতে থাকবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। গ্রুপ-'বি'-তে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্থান, যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। গ্রুপ 'সি'-তে থাকবে বাংলা ও আসাম যেখানে মুসলমানগণ অল্প কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রত্যেককে খুব আশ্চর্য করে দিয়ে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ এই পরিকল্পনায় সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং ভাইসরয় ও ক্যাবিনেট মিশনকে বললেন যে তাঁরা অগ্রসর হতে পারেন। এমন কি গান্ধীজিও এই দলিলটি পড়ে উক্তি করেছিলেন যে, এমন ধরনের সুন্দর দলিল তিনি ইতিপূর্বে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনদিন আশা করেন নি এবং এটি নিঃসন্দেহে এই দুঃখের দেশকে দুঃখমুক্ত হতে সাহায্য করবে।

এই সময় সারা দেশ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ আজাদকে স্বাগত জানান হল। মিঃ জিন্না তাঁর লীগ বন্ধুদের বললেন, এই প্রস্তাব তার পাকিস্তান দাবির খুবই কাছাকাছি।

(এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে মিঃ জিন্না ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব আপাত মেনে নিলেও, হিন্দু নেতাদের সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেই ১৯৩৭-এর ধাক্কা তাঁকে প্রতিনিয়তই কংগ্রেসী নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁর অনাস্থা ভাবকে জাগিয়ে তুলেছে।)

এই সময় আবার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি পদ নিয়ে কলহ তীব্র আকার ধারণ করলো। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী মনোভাবাপন্ন সমর্থকগণ চাইছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সভাপতি হলে সুবিধা হয়। অন্যদিকে প্রগতিশীল দল চাইছিলেন জবাহরলাল নেহরুকে

সভাপতি হিসাবে। অবশেষে নেহরুই সভাপতি হয়েছিলেন কিন্তু সেই সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার দক্ষিণ ও বাম অংশের যে ঝগড়া প্রকাশ পেয়েছিল সেটি উত্তরকালে আরো তীব্রতর হয়ে বর্তমান ইতিহাসকেও প্রভাবিত করেছে। অবশ্য এইখানে সেই ইতিহাস আলোচনা অবান্তর।

১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। এবং সভাপতি হবার পর তিনি এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকার আহ্বান করলেন। এই সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে তিনি যে সমস্ত কথাবার্তা বললেন ইতিহাস প্রমাণ করে সেই কথাবার্তাই ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাকে বানচাল করে ভারত বিভাগকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করল। সাংবাদিকগণ যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে কি না ; নেহরু তার উত্তরে তাঁর কাব্যিক ইংরাজীতে বললেন—"Completely unfeltered by agreements and free to meet all situations as they arise."—তাঁর কথার সরল অর্থ দাঁড়াল যে ইচ্ছা করলে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে এদিক ওদিক করাও যেতে পারে। যদিও তিনি পরে বলেছিলেন যে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে এই মিশনের প্রস্তাবকে অদলবদল করতে তিনি কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছা পোষণ করেন না।

নেহরু তখনই বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি যে কি ধরনের মারাত্মক উক্তি করেছিলেন পরবর্তীকালে ভারত বিভাগই একমাত্র তার সাক্ষ্য। নেহরুর বক্তব্য সমস্ত কাগজে বিরাটাকারে ছাপা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জিন্না এটিকে 'কংগ্রেসের বদ মতলব' বলে চিৎকার শুরু করে দিলেন।

আজাদ এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডমে' লিখেছেন :

"Jawaharlal is one of my dearest friends and

his contribution to India's national life is second to none. He has worked and suffered for India freedom, and since attainment of Independence he has become the symbol of our national unity and progress. I have nevertheless to say with regret that he is at times apt to be carried away by his feelings. Not only so, but sometimes he is so impressed by theoretical considerations that he is apt to underestimate the realities of a situation. The mistake of 1946 prove.......costly.")

মিঃ জিন্না স্বভাবতই ক্ষেপে গিয়েছিলেন এবং তিনি খুব অল্পসময়ের মধ্যেই লীগ নেতৃত্বকে বোঝালেন যে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করা খুবই অন্যায় হয়েছে, এবং তিনি একথাও বললেন যে কংগ্রেস খানিকটা ভাল হয়েছে বলে তিনি যে ধারণা করেছিলেন সেটিও ভুল।

১৯৪৬ সালের ২৭ জুলাই তারিখে মুসলিম লীগের সভা ডাকা হল। এই সভাতেই ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে বাতিল করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল; এবং এখান থেকে ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬-এ সারা ভারতবর্ষে পাকিস্তানের দাবিতে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালন করবার আহ্বান জানান হল। জিন্না এই সময় ঘোষণা করলেন—"আমাদের সামনে দুটি পথ, হয় বিভক্ত ভারত, তা না হলে চূর্ণবিচূর্ণ ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারত"।

ইতিহাস প্রমাণ করে জিন্নার দুই আশাই ফলপ্রসূ হয়েছিল। তিনি একাধারে বিভক্ত ভারতকে লাভ করেছিলেন এবং অপরদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারতকেও পেয়েছিলেন।

২৭ জুলাই থেকে ১৬ আগস্ট মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধান। এই সময় সারা দেশের মুসলমান সম্প্রদায় অস্থির হয়ে উঠলেন তাঁদের

ইঙ্গিত ১৬ তারিখের জন্য। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর ধ্বনিতে ছাপিয়ে গেল 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র শপথ। তখন বাংলাদেশে চলছিল মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা, প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শহিদ সুরাবর্দী। সুরাবর্দী যদিও মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন, এবং জিন্নার পাকিস্তান দাবিকে সমর্থনও করতেন, তবুও জিন্না তাঁকে বিশ্বাস করতেন না। কারণ জিন্না জানতেন যে সুরাবর্দী যতই মুখে পাকিস্তানকে সমর্থন করুক না কেন তলে তলে তিনি এই মওকায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করে নিয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান এই দুই রাষ্ট্রেরই তোয়াক্কা না করে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করবেন। সুরাবর্দীর প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু জেনে রাখা প্রয়োজন, না হলে পরে এই লোকটিকে চিনতে ভুল হতে পারে। সুরাবর্দীর প্রকৃতি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মোসলে বলেছেন :

"Mr. Suhrarwardy was a party 'boss' of the type who believes that no politician need ever be out of office once his strong-arm squards have gained control of the polling booths ; that no minister should ever suffer financially by being in public life ; that no relative or political cohort should ever go unrewarded. He loved money, champagne, polish blondes and dancing the tengo in night clubs, and he was reputed to have made a fortune during the war. He loved Calcutta, including its filthy, festering slums, and it was from the noisome alleyways of Howrah that he picked the goondas who accompanied him everywhere as bodyguard."

'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' কথাটার মধ্যে যতই রাজনীতির আবরণ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করা হোক না কেন, এই কথাটির মধ্যে যে বীভৎস হিংসা লুকিয়ে ছিল তার আত্মপ্রকাশ ঘটল ১৬ আগস্ট থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বৃহৎ শহরগুলিতে। ১৬ আগস্ট তারিখে সুরাবর্দী বাংলাদেশে সাধারণ ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই সময় প্রাদেশিক পরিষদের হিন্দু সদস্যরা ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ১০ই আগস্ট তিনি দিল্লীতে এক ভাষণে বললেন যে, কংগ্রেস যদি বাংলা দেশে কোন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের চেষ্টা করে তবে বাংলা দেশে একটি সম্পূর্ণ আলাদা সরকার গড়া হবে। এইভাবে ১৬ই আগস্ট এলো। এই দিন থেকে কলকাতায় কি ঘটেছিল তার ছোট্ট একটি বিবরণ মোস্‌লের 'দি লাস্ট ডেস্‌ অফ দি ব্রিটিশ রাজ' থেকে তুলে দিচ্ছি—**'Between dawn on the morning 16 August 1946 and dusk three days later, the people of Calcutta lacked, battered, burned, stabbed or shot 6,000 of each other to death, and raped and maimed another 20,000."—**

(১৬ আগস্টের জের বহুদিন চলেছিল এবং এই অপরিণামদর্শিতার ফলে সারা ভারতে মাত্র কয়েক মাসে ৩০ হাজার জীবনহানি ঘটল। গান্ধীজি তখনও 'কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন, অপর দিকে জিন্না সাহেব জোর তালে 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট' আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই ভাবে ১৯৪৬ সাল কেটে গেল। কোন ভাবেই কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না।)

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। দিল্লীতে তখনও বেশ শীত অনুভব করা যাচ্ছে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি ভাইসরয় ওয়াভেল ও তাঁর প্রিয় সহচর জর্জ এবেল সবেমাত্র প্রাতরাশের টেবিলে বসেছেন, এই

সময় ডাকে একগাদা কাগজপত্র এলো। তার মধ্যে একখানা টেলিগ্রামও এলো, যার উপরে লেখা ছিল 'প্রাইভেট অ্যাণ্ড কনফিডেনসিয়াল'। ভাইসরয় সেটি খুলে পড়লেন, এবং তাঁর চোথ মুখের ভাব পরিবর্তন হয়ে গেল। জর্জ এবেল ভাইসরয়কে খুব ভালভাবে চিনতেন, তিনি বুঝলেন নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপার ঘটে গেছে। ভাইসরয় টেলিগ্রামথানা রেখে প্রাতরাশে মনোযোগ দিলেন। এরপর কয়েক মিনিট দুজনের মধ্যে কোন কথাবার্তা হল না। কিছুক্ষণ পর জর্জ ভয়ে ভয়ে ভাইসরয়কে জিজ্ঞাসা করলেন— "খুব জরুরী কোন ব্যাপার কি স্যার ?"

উত্তরে ওয়াভেল বলেছিলেন—"ওরা আমাকে বরখাস্ত করেছে জর্জ।"

এর পর আরো থানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলেছিলেন : "আমার মনে হয় ওরা যা করেছে ভালই করেছে।"

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মিঃ এটলি হাউস অফ কমন্সে ঘোষণা করলেন যে আগামী ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। এই সঙ্গে তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় এডমিরাল ভাইকাউন্ট মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে দিল্লীতে পাঠানো হচ্ছে।

হাউস অফ কমন্স-এর এই ঘোষণার পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের আনন্দের সীমা থাকল না। বিশেষত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণায় খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। নেহরু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বললেন :

"এই ঘোষণাটি অতি পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে ভারতবাসী ১৯৪৮

সালের জুনের মধ্যেই স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করবে। এরদ্বারা কেবলমাত্র সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝিরই অবসান ঘটবে না, এই ঘটনা ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি বাস্তব ও বিরাট পরিবর্তন সূচনা করবে। এটি আমাদের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জের মতো। এই চ্যালেঞ্জকে সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে।"

মিঃ জিন্না কিন্তু এই উপলক্ষে খুব বেশি কিছু বললেন না। তিনি বললেন: "ঠিক এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে চাই না, তবে এইটুকুই বলছি যে, মুসলিম লীগ তার পাকিস্তান দাবি থেকে একচুলও নড়বে না।"

একথা এখানে নিঃসন্দেহে বলা চলতে পারে যে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় বনাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লড়াইকে কিন্তু মূল লড়াই হিসাবে ধরা যায় না। কারণ এই বছর ঠিক স্বাধীনতা লাভ করবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মূল লড়াই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে।

ভারতবর্ষে শেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ২২ মার্চ ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে এসে পৌঁছুলেন। কিন্তু ঠিক এই সময় পাঞ্জাব, বিহারে, বাংলাদেশে ও উত্তর প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রতিদিন শত শত লোক মরছিল। গান্ধীজিই একমাত্র নেতা যিনি এই সময় দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে ঘুরছিলেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এখনও এ বিষয়ে চিন্তা করতে খুবই আশ্চর্য লাগে যে সেইদিন সেই হত্যালীলা বন্ধ করবার জন্য বা সাধারণ মানুষের ন্যূনতম নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন সর্বভারতীয় নেতাই কোন চেষ্টা করেননি। তবে সেই সময় রোজ সকালে খবরের কাগজ খুললে দেখা যেত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার দর কষাকষি পুরোদমেই চলছে। তবে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে

যে (১৯৪৬ ও ৪৭-এর দাঙ্গার সময় কলকাতা শহরে এবং ভারতবর্ষে আরো কিছু জায়গায় কমিউনিস্ট তরুণগণ (হিন্দু মুসলমান একযোগে) দাঙ্গা প্রতিরোধে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করেন নি।)

শ্রীনেহরু এপ্রিলে পাঞ্জাবের দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা ঘুরতে গেলেন। সেখানে মার্চ ও এপ্রিল মাসেই কমপক্ষে ২০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। দিন দিন ভারতবর্ষ যে এক রক্তপ্লাবনের ও ঘৃণার দেশ হয়ে উঠেছে তাই দেখে নেহরু বিশেষ ভাবে নিরাশ হয়ে পড়লেন। "আমি যে সমস্ত বীভৎস দৃশ্য দেখলাম ও যে সমস্ত আচরণ লক্ষ্য করলাম তার দ্বারা মনে হয় মানুষগুলো সব পশু হয়ে গেছে।" —নেহরু লিখেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার জন্য যে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারাই দায়ী এই কথাটা কিন্তু কোনদিনই কোন নেতার মুখ থেকে শোনা যায়নি।

নেহরু এই সময় গান্ধীজিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "সারা ভারতবর্ষে যে অবস্থা বিরাজ করছে সেটি মোটেই আশাপ্রদ অবস্থা নয়। এখানে বহু ধরনের অন্তর্ঘাতী শক্তি পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলি সব দিক দিয়েই আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করবে। কংগ্রেস সংগঠনও এই একই ব্যাধিতে ভুগছে। আমরা যারা সরকার পরিচালনা করছি তারা আশু কর্তব্যগুলি সমাধান করা ছাড়া অন্য কিছুই করবার সময় পাচ্ছি না।…এখন আমি সবচাইতে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ছি, কারণ কংগ্রেস সংগঠনটি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। আমরা যারা সরকারে আছি তারা কেউই সংগঠনে মনোযোগ দিতে পারছি না। আমরা ক্রমেই জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলছি।"

এই সময় নেহরু ছাড়া আরো একজন পাঞ্জাবের দাঙ্গা বিধ্বস্ত

এলাকায় গিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন হাসপাতাল ও দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামাঞ্চল তিনি পরিদর্শন করেন এবং সেখানে যে সমস্ত বীভৎস দৃশ্যের মুখোমুখি হন তার মধ্যে ছিল হাতকাটা শিশু, অন্তঃস্বত্বা নারীকে জোর করে সন্তান প্রসব করানো অবস্থা, কোন পরিবার মাত্র ক্ষুদ্র একটি শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে শেষ হয়েছে এমনি ধারা সব দৃশ্য, আরো বহু বর্বর অত্যাচারের সব সাক্ষ্য। তিনি দিল্লীতে ফিরে এসে তাঁর স্বামী ও স্বামীর পরামর্শ-দাতাদের কথায় সায় দিয়ে বলেন, "ভারত বিভাগ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই।" লেডির যখন এই ধরনের মনের অবস্থা তখন তিনি নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, এবং উভয়েই যে পাঞ্জাবের অবস্থায় ভীষণ বিমর্ষ হয়েছিলেন সেই কথা উভয়ে উভয়ের কাছে প্রকাশ করলেন।

(এর কিছুদিন পরে ভারাক্রান্ত মনে নেহরু মৌলানা আজাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। এইদিনকার অবস্থা ও কথাবার্তা সম্বন্ধে আজাদ লিখেছেন—"জবাহরলাল অত্যন্ত বিমর্ষ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে দেশ বিভাগ ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর কি আছে ···সে দেশ বিভাগকে সবসময়ই খারাপ চোখে দেখতো, কিন্তু এমতাবস্থায় সে মনে করছিল যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেশবিভাগের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। নেহরু তখন বলতে শুরু করেছিল যে একে রোধ করা যাবে না এবং এই ঘটনার বিরুদ্ধতা করারও কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কারণ এই ঘটনা ঘটতে চলেছে। সে তখন এ কথাও বলেছিল যে এই বিষয়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বাধা দেওয়াও আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।")

এর পরই সমস্ত ঘটনাগুলি অত্যন্ত দ্রুত ঘটে গেল। যে লোকটি (নেহরু) এতদিন অবিভক্ত ভারতের জন্য লড়াই করেছেন এবং জিন্নাকে বিভেদপন্থী বলে উপহাস করে এসেছেন, এবার তিনিই

ঘটনার কাছে নতিস্বীকার করলেন। যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও এই বিষয়ে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়াতে কসুর করেন নি। কারণ প্যাটেল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুসলমানদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। আরো আশ্চর্যের ঘটনা ঘটল যে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ না করেই নেহরু মাউন্টব্যাটেনকে ভারত বিভাগ সম্বন্ধে তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। এই ঘটনার দ্বারা জিন্না ও ভাইসরয় দুজনেই সন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে নেহরু যে সময় ভারত বিভাগের প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন, ঠিক সেই সময়ও জিন্না মনে করতে পারেন নি যে কংগ্রেস এক্ষুনি পাকিস্তান মেনে নেবে, এমন কি তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ লোকজন জানতেন যে আদপেই পাকিস্তান দাবি কোনদিন সফল হবে—এ কথাও জিন্না ভাবেন নি। তবে ঘটনাচক্রে জিন্নার সেই আশা পূর্ণ হল। অবিভক্ত ভারত বিভক্ত হয়ে নতুন ইতিহাসের জন্ম দিল। যেখানে ব্রিটিশ সরকার মনে করেছিলেন যে ১লা জুন ১৯৪৮ সালে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে, সেখানে তারও প্রায় একবছর আগেই সেই ইপ্সিত স্বাধীনতা ভারতের ভাগ্যে জুটল। ১৯৪৭এর ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হল।

তিন

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত বিভাগ হয়ে স্বাধীনতা এলো। একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসির যুক্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটল এই বিভাগের মধ্যে, অন্যদিকে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয় নেতাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষমতা-লোভের অভীপ্সা পূর্ণ হল এই স্বাধীনতার দ্বারা।

এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ভারত বিভাগ করে স্বাধীনতা দেবার ৪২ বছর আগে আর একবার তারা বাংলাকে ভাগ করেছিল, ১৯০৫ সালে। অতএব বাংলাদেশ ভাগ হল এই দ্বিতীয় বার। এখানে সেই বিগত দিনের ইতিহাসটি খানিক উল্লেখ করছি এই কারণে যে যদিও আপাতদৃষ্টিতে এই দুই বিভাগের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য আছে, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে এই দুই বিভাগের মধ্য বাস্তব মিলও অনেক।

১৯০৫ সালের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বাংলাদেশকে ভাগ করবার মূলেই ছিল সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগ্রত করে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি করা। কারণ, ব্রিটিশ সরকার জানতো যে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্তৃত্ব হিন্দু সম্প্রদায়ের অধীনে। এবং পূর্বাঞ্চলে ঢাকার নবাবের মত কয়েক জন প্রভাবশালী মুসলমান জমিদার ও বিত্তবান ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বহু সংখ্যক হিন্দু জমিদার ও বিত্তবান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে অপারগ। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে নিম্নবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দু জমিদারগণের দ্বারা নিপীড়িত হবার ফলে তারাও খুব হিন্দু বিদ্বেষী। অতএব এই বাস্তব অবস্থায় লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে ভাগ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের যুক্ত সংগ্রামে ফাটল ধরাবার ফন্দি এঁটেছিলেন এবং তিনি যে এ ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন, তার নিদর্শন হচ্ছে যে পূর্ববাংলার বিত্তবান মুসলমান সম্প্রদায় এই বিভাগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং এরপরই ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ স্থাপিত হয়, এবং ১৯০৯ সালে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা নির্বাচন এলাকা ও প্রার্থীপদ স্বীকার করে নেওয়া হয়।

এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় যে সমস্ত মুসলমান জমিদার ও বিত্তবান গোষ্ঠী বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু নিম্নবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দু জমিদারদের নিপীড়ন থেকে কষ্ট লাঘবের পথ হিসাবে ব্রিটিশ রাজ-শক্তির এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানান নি। ইতিহাস প্রমাণ করে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন প্রকার। মুসলমান সম্প্রদায়ের এই বিত্তবান গোষ্ঠী বঙ্গবিভাগের হিড়িকে অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে ও সমাজনীতিতে হিন্দু আধিপত্য হটিয়ে নিজেদের আধিপত্যই কায়েম করতে চেয়েছিলেন, সেখানে নিম্নবিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে শোষণমুক্ত করবার কোন বাসনাই তাদের ছিল না।

১৯০৫ থেকে ১৯৪৫, এই সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনীতির চেহারাটাই পাল্টে গেছে। কিন্তু এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে রাজনীতির চেহারাটি খানিকটা পোশাক বদলের মতো পালটালেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিতরের প্রকৃতিটি অনেক বেশি একগুঁয়ে এবং ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছিল। কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগের সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জোয়ারে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছিল সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা তাকে সীমাহীন লোভী করে তুলেছিল। আর সে তার সেই লোভকে চরিতার্থ করবার জন্য কোথাও জাতীয়তাবাদের মুখোস পরেছে, কোথাও সে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে, কোথাও সে হয়ে উঠেছে তথাকথিত সমাজতন্ত্রী। ১৯৪৫ সালে বাংলা দেশে মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারে প্রধান কথাই ছিল যে তারা যদি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন তবে জমিদারদের জমির সীমানা কমিয়ে দেবেন। এর ফলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান হলে মুসলিম লীগ এই কৃষককুলকে হিন্দু জমিদারদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করবেন। একথাও তাঁরা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত

মুসলমান সম্প্রদায়কে বলেছিলেন যে, যেহেতু ইসলামের চোখে ছোট বড় ভেদাভেদ নেই সেই কারণে পাকিস্তান সৃষ্টির পরই বাঙ্গালী মুসলমানদের আর কোন দুর্দশা থাকবে না।

১৯০৫ ও ১৯৪৫-এর ইতিহাসের একটি জায়গায় মিল সবচাইতে বেশি, সেটি বিত্তবানদের স্বার্থরক্ষার্থে বিত্তহীনদের রাজনৈতিক ধাপ্পার ব্যাপারে।

মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ইসলামের নামে দোহাই পেড়ে যে নিম্ন-বিত্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় পাকিস্তান দাবিকে রাজনৈতিক জুয়াখেলার ময়দান থেকে জিতিয়ে নিয়ে গেলেন সেটি যে কতবড় মিথ্যা কথা ছিল সেটা পাকিস্তান সৃষ্টির দু-এক বছরের মধ্যেই পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

যে 'দুই জাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির পরই সেই তত্ত্বের আড়ালে পূর্ববাংলার 'বাঙ্গালী' সংস্কৃতিকে লোপাট করে দিয়ে সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা 'মুসলমানীকরণের' স্টিমরোলার চালাতে উদ্যত হলেন। 'মুসলমানীকরণ' এইজন্য যে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলমানগণ বাঙালী মুসলমানদের খাঁটি মুসলমান বলে কোনদিনও স্বীকার করেন না। আর এই মুসলমানীকরণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাগণ বাঙালী মুসলমানদের কাঁধে উর্দু ভাষাকে জোর করে চাপাতে চেষ্টা করলেন। বাঙালী মুসলমানদের সংবিৎ ফিরল, তাঁরা বুঝতে পারলেন ইসলামের নামে অতি শীঘ্রই তাঁদের কাঁধে চেপে বসতে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই ভাষা আন্দোলনই যে বর্তমানের 'জয় বাংলা' আন্দোলনের' মূল ভিত্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। এই ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে বিপ্লব সূচিত হয়েছিল সেটির ধীর আত্মপ্রকাশ ঘটে পরবর্তীকালে। এই মানসিক বিপ্লবের রূপ বর্ণনা করতে

গিয়ে পূর্ববাংলার প্রখ্যাত লেখক বদরুদ্দিন উমর তাঁর 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' বইটিতে 'মুসলমানদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন' অধ্যায়ের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটি এই আলোচনায় বিশেষ ভাবে উপযোগী হবে। প্রবন্ধটি নিম্নরূপ :

"পূর্ব পাকিস্তানী মধ্যবিত্তের মধ্যে যে সংস্কৃতি-চেতনার উন্মেষ হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ নতুন অথবা অপ্রত্যাশিত নয়। উপরন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাকৃতিক জগতের মতো মানুষ এবং তার সমাজ কতকগুলো অলঙ্ঘনীয় নিয়মের অনুবর্তী। কিন্তু এ চিন্তাধারা নতুন না হলেও তার মধ্যে এই হিসাবে অনেকখানি নতুনত্ব আছে যে, আজ এ চিন্তাধারার বিকাশ যাদের মধ্যে ঘটেছে তারা এজাতীয় চিন্তা করতে এতদিন অভ্যস্ত অথবা প্রস্তুত ছিলো না।

এ কথার অর্থ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে, ধর্মগতভাবে মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানীরা, প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা, ভারতবর্ষ অথবা বাংলাদেশকে উচিতমতোভাবে কখনো এদেশ মনে করেন নি। শ্রেণীস্বার্থের কারণে এদেশের সাথে আন্তরিক যোগাযোগ স্থাপনে তাদের বরাবরই আপত্তি ছিলো এবং এই আপত্তি ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতির ফলে অধিকতর ঘোরতর আকার ধারণ করে।

নিজের দেশকে স্বদেশ মনে না করার জন্যে মানুষের জীবনে যে দুর্যোগ স্বাভাবিক মুসলমানরা সে দুর্যোগকে রোধ করতে পারেন নি। পাক-ভারত উপমহাদেশের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের যে কারণে এদেশের সংস্কৃতিক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান নেই অনেকখানি সেই কারণেই মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনও হয়েছে পঙ্গু ও সৃষ্টিহীন।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা এদেশের সাথে আত্মীয়তা বোধ করতে না পারার কারণ প্রধানত তিনটি। ধর্মগতভাবে তারা ছিল খ্রীষ্টান,

তাদের ভাষা ছিলো ইংরেজী এবং তাদের দেহে প্রবাহিত ছিলো ইংরেজদের রক্ত। ইংরেজরা যেহেতু এ দেশের শাসনকর্তা ছিলো এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানেরা ছিলো সেই শাসকদের ধর্মাবলম্বী, তাদের ভাষা-ভাষী এবং তাদের রক্তগত আত্মীয়, কাজেই তারা নিজেদেরকে মনে করতো ভারতবর্ষের লোকেদের থেকে উচ্চশ্রেণীর ও উচ্চবংশীয়। তাছাড়া ধর্মগত, ভাষাগত এবং রক্তগত ঐক্য এবং সম্পর্কের জন্যে তারা নিজেদেরকে ভারতবর্ষের অগণিত মানুষের মতো বিদেশীশাসিত মনে না করে মনে করতো এ দেশের শাসনকর্তা—রাজার জাতি। কাজেই ইংরেজী ছিলো তাদের ভাষা, ইংলণ্ডের ইতিহাস ছিলো তাদের জাতীয় ইতিহাস এবং অ্যাংলিকান চার্চ ছিলো তাদের জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠান।

বিদেশের সাথে কৃত্রিম আত্মীয়তা এবং স্বদেশের সাথে এই অনাত্মীয়তা বোধের ফলে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থা সংস্কৃতি ও রাজনীতিগতভাবে এক শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয় ইংরেজদের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের পর। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের অবস্থার সাথে এসব দিক দিয়ে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা অনেকাংশে তুলনীয়। সামন্তশ্রেণীর মুসলমানেরা মোগল রাজত্ব এমনকি ইংরেজ রাজত্ব পর্যন্ত, বাংলায় কথা না বলে ফারসী-উর্দুতে কথা বলতেন, নিজেদেরকে জাতিগতভাবে মনে করতেন আরবীয়, ইরানী, তুর্কী, খুরাসানী অথবা সমরকন্দী এবং তাঁদের ধর্ম ছিলো ইসলাম। তাই বৈদেশিক ভাষা, রক্ত ও ধর্মের প্রভাব সামন্ত-তান্ত্রিক এবং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে এ দেশের মাটির সাথে মুসলমানদের আত্মিক যোগ স্থাপনকে করলো বাধাগ্রস্ত। দেশের মাটির সাথে এই সম্পর্কহীনতার ফলে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক চেতনার উপযুক্ত উন্মেষ সম্ভব হলো না,

তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাও বাধাগ্রস্ত হলো বহুতরভাবে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ দেশকে বাতিল করে সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা আকাশ কুসুম রচনার মতো অবাস্তব ও বন্ধ্যা হতে বাধ্য।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধর্মভেদ থাকলে তাদের সাংস্কৃতিক দৈন্য এতখানি উৎকট আকার ধারণ করতো না। কিন্তু ধর্মভেদ অন্যান্য ভেদাভেদের ভিত্তিস্বরূপ কাজ করার ফলে অবস্থার অবনতি ঘটলো এবং সে অবনতিকে রোধ করা গেলো না। মুসলমান উচ্চশ্রেণীর নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার জন্যে মোগলযুগোত্তর বাংলা দেশে ধর্মের দোহাই দিয়ে এদেশের সাথে এদেশের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহের অন্ত রইল না। এর ফলে বাংলা ভাষায় ধর্মচর্চা করাও তাদের পক্ষে হলো অসম্ভব। এবং উনিশ শতকে ধর্মচর্চার ক্ষেত্র থেকে মুসলমানের বাংলা ভাষাকে বাদ দেওয়াই হয়ে দাঁড়ালো তাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক দৈন্যের অন্যতম মূল কারণ। হিন্দুদের সাথে এদিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা বিশেষভাবে তুলনীয়। মুসলমানদের থেকে ধর্মচর্চার তাড়না উনিশ শতকে হিন্দুদের মধ্যে কম ছিল না। উপরন্তু এক হিসেবে বেশিই ছিলো। সে সময় হিন্দু সমাজে বহু ধর্মান্দোলনের উৎপত্তি এবং প্রয়াস হয়েছিলো। হিন্দুদের সংস্কৃতি চর্চা এই আন্দোলনের ফলে সমৃদ্ধ হলো কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা হলো না। এর প্রধান কারণ মুসলমানদের চিন্তা বাংলা দেশ এবং বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয়ে আবর্তিত হলো আরব, ইরান, তুর্কির চতুর্দিকে, অনেকখানি যেমন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের চিন্তা আবর্তিত হচ্ছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে কেন্দ্র করে।

মাত্র কিছুসংখ্যক ব্যতীত বাংলার সমস্ত মুসলমানেরই পূর্বপুরুষরা এদেশের অধিবাসী এবং হিন্দু। কাজেই ধর্মীয় কারণ ব্যতীত অন্য

কোনো কারণে বাংলা দেশকে পুরোপুরি স্বদেশ মনে না করার কোন কারণ তাদের ছিল না। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা নিজেদের সুবিধামতো এক-জাতি তত্ত্ব আবিষ্কার করে ক্রমাগত প্রচার করলেন যে সৎ-বংশজাত মুসলমান মাত্রেরই পূর্বপুরুষ আরব, ইরান, তুর্কী থেকে আগত। এর ফলে মুসলমানরা নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নত হওয়া মাত্র সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বংশতালিকা রচনা করে সচেষ্ট হলেন নিজেদের বংশপরিচয় পরিবর্তনে। এভাবেই মুসলমানরা আত্মিক দিক থেকে স্বদেশে থাকলেন পরবাসী হয়ে।

মুসলমানদের এই মানসিকতার পরিবর্তনের শুরু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এবং এই পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ ভাষা আন্দোলনে। পূর্বে উর্দু না জানলে কোনো মুসলমানই সৎ-বংশজাত বলে পরিচিত হতেন না। শুধু তাই নয়, বাংলা তাঁর মাতৃভাষা একথা স্বীকার করলেও তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত। পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাঙালী মুসলমান 'মুসলমান বাঙালী'তে রূপান্তরিত হতে শুরু করল এবং সমস্ত সংস্কার বর্জন করে, উর্দুকে নিজের ভাষা হিসাবে বাতিল করে, বাংলাকে স্বীকার করল মাতৃভাষারূপে। এইভাবে বাঙালী মুসলমানের জীবনে সূত্রপাত হল এক অভূতপূর্ব চেতনার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা দ্বারা মুসলমানদের মনে যদি কোনো সত্যিকার বিপ্লব ঘটে থাকে তাহলে এই হল তার সঠিক পরিচয়।

মুসলমানদের যে দৃষ্টি দেশের প্রতি এতকাল ছিল মমতাহীন, সেই দৃষ্টিই আচ্ছন্ন হল স্বদেশের প্রতি প্রেম ও মমতায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ভাষা ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম তাই আসলে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনেরই সংগ্রাম। যে মধ্যবিত্ত মুসলমান নিম্ন অবস্থা থেকে উন্নতি লাভ করে দেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্বিগ্ন হত, এর

পর থেকে তার সে উদ্বেগের অবসান হতে শুরু হল। বাঙালী পরিচয়ে সে আর লজ্জিত হল না। যে চিত্ত ছিল পরবাসী, সে চিত্ত সচেষ্ট হল স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে। প্রতিকূল শক্তি এবং সংস্কার এ পরিবর্তনকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও ঘরে ফেরার এ সংগ্রাম রইল অব্যাহত এবং তারা জয় করে চলল একের পর এক ভূমি—স্বীকৃত হল রাষ্ট্রভাষা বাংলা, বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ঐতিহ্য; স্বীকৃত হল রবীন্দ্রনাথ ও পহেলা বৈশাখ। এ স্বীকৃতির কোনো কোনোটি এল সরকারী ঘোষণাপত্রে কিন্তু তার সত্যিকার ক্ষেত্র হল পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমান মধ্যবিত্তের বিস্তীর্ণ মানসলোক। এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে তাই নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে মুসলমান বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।"

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে জনগণ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যে রায় দিলেন তার দ্বারা তাদের গোপন বিদ্রোহী মনোভাবটির হঠাৎ এই ধরনের প্রকাশ হয়ে পড়ায় কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূদের বিচলিত করে তুলল। অচিরেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে দিলেন এবং শেরে বাংলা ফজলুল হককে দেশদ্রোহী বলে ঘোষণা করলেন।

১৯৫৪ সালে জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাকে ফ্যাসিস্ট কায়দায় বরখাস্ত করবার পরই কিন্তু পূর্ববাংলার জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ১৯৪৭ সালের পর থেকে উর্দু ভাষাকে বাঙালীর কাঁধে চাপিয়ে দেবার মধ্য থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ দেশের পূর্বাঞ্চলকে

উপনিবেশ করে তোলাবার যে ফন্দি আঁটছিলেন ১৯৫৪ সালে সেই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই রাজনৈতিক অভিব্যক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ল।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ কি ভাবে দেশের পূর্বাঞ্চলকে (বাংলাকে) উপনিবেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন তার প্রমাণ মেলে পূর্ব বাংলার সমগ্র অর্থনীতির উপর পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসাদারদের একাধিপত্য থেকে এবং সমগ্র দেশের অর্থনীতিকে 'ডলার নির্ভর' করে তোলার মধ্যে থেকে।

১৯৫৪ সালে, যখন পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগণ বরখাস্ত করে আধা-মিলিটারি শাসনের দিকে ঠেলে দিলেন (ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ববঙ্গের লাট হলেন), সেই সময়কার পাকিস্তানের অর্থনীতির রূপ ও স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করলে চোখে পড়ে দেশের পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিমের উপনিবেশ গড়ে তোলবার কু-মতলবের স্বরূপ।

এখানে একটু পিছন দিককার ইতিহাস আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করেন। "ভবিষ্যতে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতার উদ্দেশ্যে মার্কিন ফৌজের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য." সেখানে তিনি ১০ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত সলাপরামর্শ করেন। মার্কিন যুদ্ধবাজদের সঙ্গে পাকিস্তানী সরকারী কর্মচারীর আলাপ আলোচনার পূর্ণ বিবরণ অবশ্য কোনদিনই প্রকাশ পায় নি। তবে কাজ শেষ হবার পর মার্কিন সরকারের অন্যতম মুখপাত্র 'নিউইয়র্ক টাইমস্' মারফত তিনি যে বিবৃতি প্রচার করেন সেটি উল্লেখযোগ্য। এই বিবৃতিতে বলা হয় :

"আমরা যারা পাকিস্তানে বাস করছি তারা এই আশা পোষণ করছি যে বিশ্বে শান্তি বজায় থাকবে। এবং যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীকে যদি সর্বদা প্রস্তুতির অবস্থায় রাখা যায় তবে শান্তি বজায় থাকবেই।" [নিউইয়র্ক টাইমস্—২৪ জুলাই, ১৯৪৯]

একজন পাকিস্তানী রাজপুরুষের এই ধরনের মন্তব্য সেদিন অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, কিন্তু মার্কিন যুদ্ধবাজের সহযোগিতা লাভের প্রয়াস এবং মার্কিন ফৌজের প্রতি এই স্তুতি-বাক্যের মধ্যেই পাকিস্তান সরকারের ভবিষ্যত কার্যকলাপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

এটি মোটেই কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, সেই রাজপুরুষটি ছিলেন মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা। তখন তিনি ছিলেন পাকিস্তানের দেশরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী। ১৯৫৪ সালে জনপ্রিয় মন্ত্রিসভাকে গদীচ্যুত করে ইনিই হয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের ভাগ্যবিধাতা। পূর্ববঙ্গের জবরদস্ত জঙ্গীলাট। মীর্জা পূর্ববঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হবার পর থেকেই শুরু হয় সমগ্র পূর্ববঙ্গব্যাপী গণতন্ত্রের উপর নিষ্পেষণের ইতিহাস। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আদেশে তিনি সমগ্র পূর্ববাংলায় নির্মম অত্যাচার শুরু করেন। ঐতিহাসিক ভাবে এই সময় থেকেই পূর্ববাংলার ঘাড়ে ব-কলমে মিলিটারি শাসন চেপে বসল, যার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটল ১৯৫৮ সালে আয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে।

আয়ুবের আবির্ভাবের পূর্বেকার দশটি বছরের পাকিস্তানের রাজনীতির যদি একটি পূর্ণ সমীক্ষা তৈরী করা যায় তবে তার মধ্যে চোখে পড়বে কতকগুলি ঘটনা, আর এই ঘটনাগুলি দীর্ঘকাল ধরে সংঘটিত হবার ফলেই সেখানকার স্বৈরাচার আয়ুবের প্রতীকের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হতে পেরেছিল। আয়ুব-পূব পাকিস্তানে দেখা গেছে সৈন্যবাহিনী ও উচ্চতর সরকারী মহল সব সময়ই দেশের অর্থ-নীতি, রাজনীতি ও বৈদেশিক নীতির রূপায়নের ক্ষেত্রে শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। পাকিস্তানের শুরু থেকেই সেখানকার স্বৈরাচারী শাসকগণ কোন সময়ই সাধারণ মানুষের সুখসুবিধার কথা চিন্তা না করে বড় বড় জমিদার এবং জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে আঁতাত করে তাদের স্বার্থ-রক্ষা করে চলেছে, এবং যাদের বেশির

ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবী মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে জনস্বার্থ বিরোধী শক্তি ধীরে ধীরে দেশের সমস্ত ঘটনাকেই নিজের খুশিমতো চালাবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। এই ভাবে ক্রমে সৈন্যবাহিনী, স্বৈরাচার ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে একটি মোর্চা গড়ে উঠেছে। পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় এখনও কিন্তু এই যুক্ত মোর্চাই পাকিস্তানকে শাসন করে চলেছে। এ কথাও এখানে স্মরণ করা উচিত যে পাকিস্তানে বর্তমানে যে ২০টি একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবার পাকিস্তানের সমগ্র অর্থ-নীতির উপর কর্তৃত্ব করছে সেটাও কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক অবস্থা চলবার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলেন। ২৮ অক্টোবর তিনি প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। এই মন্ত্রিসভায় পূর্ব বাংলার বাঙালী যাঁরা স্থান পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন—জনাব আবুল কাশিম খান, জনাব হবিবুর রহমান, জনাব হাফিজুর রহমান ও মৌলভী মহম্মদ ইব্রাহিম।

ক্ষমতালাভ করবার পরই নতুন প্রেসিডেন্টের প্রধান কাজ হল পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল ও নেতাদের সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা, যাতে দূর-ভবিষ্যতেও আর কোনদিন তাঁরা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারেন। তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলিকে শুধু নিষিদ্ধ করে দিলেন তাই নয়, সভা, সমিতি, শোভাযাত্রা এবং ছাত্র বা শ্রমিক ধর্মঘট করার সমস্ত মৌলিক অধিকার হরণ করে নিলেন। সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতি ছাড়া সংবাদপত্রে পাক-রাজনীতির সমস্ত সংবাদ প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। এছাড়া 'পোডো' ও 'এবডো' নামে দুই নির্দেশনামা জারি করে তিনি পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতাদের 'রাজনৈতিক জবাই' করার ব্যবস্থা করলেন। এই দুটি আদেশের দ্বারা পাকিস্তানের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হবার

বা কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হবার অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হল। আয়ুব এই সময় সদম্ভে বলেছিলেন : '১৩০০ বছরের ইতিহাসে মুসলমানরা যা করে উঠতে পারেনি তিনি তা করতে দেবেন না'— সংক্ষেপে সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার চলবে না।

এরপর আয়ুব হাত দিলেন ভূমিসংস্কারে। সেটি নিয়ে প্রথম খুব জোর প্রচার চালালেন তিনি। 'লাঙ্গল যার জমি তার'—এই জাতীয় আওয়াজকে আয়ুব খান পাগলের চীৎকার বলে মনে করতেন। পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা নাকি সে রাজ্যে চাষ আবাদকে তছনছ করে দিয়েছেন—আয়ুব খান এই অভিযোগ আনলেন প্রগতিশীল পূর্ববাংলার নেতাদের বিরুদ্ধে। ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলায় জমির মালিকানার উচ্চতম সীমা বা সিলিং নির্ধারিত হয়েছিল ৩৩ একর—আয়ুব খান সেটিকে বাড়িয়ে করলেন ১২০ একর। জোতদার শ্রেণীকে এইভাবে মদত জোগালেন তিনি। পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্টের হাতে মুসলিম লীগের ওই ধরনের পতনকে আয়ুব খান কখনই শুভ সূচনা বলে মেনে নিতে পারেন নি। তিনি জানতেন প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে আবার জাগাতে হলে মুসলিম লীগকে জাগাতে হবে। এই কারণেই গ্রামে গ্রামে মুসলিম লীগের যে জোতদারি ভিত্তি সেটিকে শক্ত করতে হবে, আর তারাই হবে পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ।

চার বছর প্রবল প্রতাপে ফৌজী শাসন চলার পর আয়ুব ভাবলেন যে পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। পূর্ববাংলার পক্ষে আর মাথা তুলে দাঁড়ান সম্ভব নয়। তাই তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাস বারবার এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, চরম নিষ্পেষণের মধ্যে দিয়েই তৈরি হয় কঠিন জনমত, আর এই জনমতই

নির্ধারণ করে দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস। পূর্ববাংলার ইতিহাস আবার এই সত্যটিকে প্রমাণ করে দিয়েছে অতি পরিষ্কার ভাবে। সেই ইতিহাস বলবার আগে আবার ফিরে যেতে হবে ১৯৪৭ সালে। যখন শুধু পাকিস্তান বলে পূর্ব দিগন্তে একটা নূতন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হ'ল না, সেই সঙ্গে আবির্ভাব ঘটলো আর এক নূতন সূর্যের—সেই সূর্য মুজিবুর রহমান।

আয়ুব খানের রাজত্বকালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা যেমন স্বৈরাচারে পর্যবসিত হয়েছিল, অন্যদিকে তারই ফল হিসাবে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। যদিও আয়ুবের রাজত্বে শিল্প ও বাণিজ্যের হিসাব মাফিক অনেক প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু সারা পাকিস্তানের মাত্র কুড়িটি ভাগ্যবান পরিবার এই শিল্পের শতকরা ৬৬ ভাগ, ইনস্যুওরেন্স কোম্পানিগুলির শতকরা ৭৯ ভাগ এবং ব্যাঙ্কের শতকরা ৮০ ভাগ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। এই পরিবারগুলির মধ্যে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের পুত্র জনাব গওহর আয়ুব অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের নিজের পরিবার পাকিস্তানের অর্থনীতিতে ২০টি পরিবারের সঙ্গে সমান ভাবে অংশীদার হয়ে উঠেছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরো প্রকট। হিসাবে চিরকাল বৈদেশিক মুদ্রার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ অর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান কিন্তু কার্যত তার সবটুকুই ভোগ করে এসেছে পশ্চিম পাকিস্তান। সরকারী চাকুরিতেও পশ্চিম-পাকিস্তানের লোকের সংখ্যা পূর্ব-পাকিস্তানের লোকের চাইতে পাঁচগুণ বেশি যদিও পশ্চিমের তুলনায় পূর্ব অংশে লোকসংখ্যা অনেক বেশি।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত চার বছরে শুধু মাত্র আয়ুব

পরিবারের মোট সম্পদ ১৫ কোটি টাকারও বেশি হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

পাকিস্তানের ২০টি বৃহৎ পুঁজিপতি পরিবারের মধ্যে আদমজী ও ইস্পাহানী প্রাক্ দেশবিভাগ কালেও ব্যবসা জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং মুসলিম লীগের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

ইস্পাহানী বর্তমানে প্রধানত ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স ও নৌ পরিবহণ ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং আদমজী বিশেষত পাট ও ইনজিনিয়ারিং শিল্পে একাধিপত্য বিস্তার করেছেন।

পূর্ব-বাংলার মানুষ যে ফৌজী শাসন আর বরদাস্ত করবেনা সেটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ১৯৬২ সালেই। এই সালের ১৭ই সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সমাবর্তন সভায় ভাষণ দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তখনই সামনের ছাত্র সমাবেশ থেকে বহুকণ্ঠে আওয়াজ উঠল: 'প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার চাই', 'প্রত্যক্ষ নির্বাচন চাই', 'পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চাই'। এই দিন নির্মম ভাবে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে তাদের সাময়িকভাবে শান্ত করলেও এই জোয়ারই পরবর্তী বছরগুলিতে আরো প্রবল ভাবে আয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি করে আয়ুবের মত মিলিটারি ডিক্টেটরকে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল।

১৭ সেপ্টেম্বর তারিখটি প্রতি বছরই পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে 'ছাত্রদিবস' হিসাবে। ১৯৬৪ সালের এই দিনটিকে বানচাল করবার জন্য ফৌজী কর্তারা মরীয়া হয়ে উঠলেন। পূর্ব-বাংলার সব বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্কুল-কলেজ, ছাত্র হোস্টেল সব এক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। ছাত্রনেতাদের গ্রেপ্তার করা হল এবং বহু ছাত্রের ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হল। কমপক্ষে ১৯টি সমাবেশে ১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্রদের উপর লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস বর্ষণ

করল। তবুও ভয়-ভীতিহীন ঢাকার ছাত্র সমাজ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৪৪ ধারা অমান্য করে শোভাযাত্রা করল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ খ্যাপা কুকুরের মতো ছাত্রদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অকথ্য অত্যাচার চালাল। ছাত্ররা গিয়ে আশ্রয় নিল আবাসিক হলে—উন্মত্ত পুলিস সেখানেও ছাত্রদের তাড়া করে নিয়ে গেল। কিন্তু ছাত্রগণ এবার জবাব দিল খুব কঠিন ভাষায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় তিন দিন ধরে চলল ছাত্র পুলিশের মুহুর্মুহু খণ্ডযুদ্ধ।

১৭ সেপ্টেম্বরের ছাত্রদমনের প্রতিবাদে সর্বদলীয় নেতারা যুক্ত ভাবে ২৯ সেপ্টেম্বর সারা পূর্ব বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও দমননীতি বিরোধী দিবস পালন করা হবে বলে ঘোষণা করলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে যে হরতাল অনুষ্ঠিত হল তা অভূতপূর্ব—অবিশ্বাস্য। এই দিন বিকেলে পল্টন ময়দানের জনসভায় যে মনুষ্য-সমাগম হয়েছিল ইতিপূর্বে তা অবিশ্বাস্য ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি কথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে একযুগের অধিক কাল ধরে সাধারণ পাকিস্তানীরা যে নিষ্পেষণের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন সেই নিষ্পেষণের আত্মজ্বালার প্রদীপ্ত বহ্নিতে আয়ুবের সুখের সিংহাসন টলে গিয়েছে, তাকে হার স্বীকার করতে হয়েছে জনমতের কাছে।

দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর কি ধরনের ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়েছে তার একটুখানি হিসাবের প্রয়োজন আছে।

প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকটা দেখা যাক :— ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার ৫ শত। ১৯৬২-৬৩ সালে এই সংখ্যা বেড়েছে মোটে আড়াই হাজারের মতো। ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১ হাজার। ১৯৬১-৬৩ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯ হাজার ৫ শতে। অর্থাৎ বেড়েছে

৪৮ হাজার ৫ শর মতো। মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে, পূর্ব বাংলার অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। ১৯৫০-৫১ সালে পূর্ব-বাংলায় মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার। ১৯৬৩ সালে অর্থাৎ বারো বছরে আটশো স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪ হাজার ২ শতে। ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল—মাত্র ২৭ হাজার পাঁচশো। ১৯৬২-৬৩ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৬ হাজার। এমনকি পাকিস্তানের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব-বাংলার শিক্ষার জন্য যে ১২৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল তার মধ্যে তারা খরচা করেছিলেন মোটে ৪২ কোটি টাকা, বাকী গোটা টাকাটাই ফিরে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।

[illegible] গত দশ বছরে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব-বাংলার উপর যে ভাবে অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েছে সেটি সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসেও বিরল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা গত দশ বছরে পূর্ব-বাংলা থেকে ৯০০ কোটি টাকার মূলধন পশ্চিম-পাকিস্তানে চালান করেছে। এ বাদে এতাবতকাল পূর্ব-বাংলার নামে যে ২৯,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য এসেছে তার মোটে ২৮ ভাগ পূর্ব-বাংলায় ব্যয় হয়েছে এবং ২৮ ভাগের মধ্যেকার সিংহ ভাগ আত্মসাৎ করেছে পশ্চিম-পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী।

সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে যে আশার সঞ্চার করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন বিভক্ত ভারতের ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, পূর্ব-বাংলার উপর পশ্চিমীদের দীর্ঘ নিষ্পেষণের ইতিহাস সেই আশাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষ ফৌজী শাসনের উপর কি ধরনের ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় মেলে আয়ুব খানের রাজত্বের শেষ পাঁচ মাসের গণ-আন্দোলন থেকে।

কোটি প্রাণ এক সাথে
জেগেছে অন্ধ রাতে
নূতন সূর্য ওঠার
এইতো সময়।

পাকিস্তানের তিন শত্রু—হক, শহিদ, মুজিব। হক সাহেব ৩০শে এপ্রিল ১৯৫৪ সালে জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন, "দুই বাংলার মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর, আমার জীবনের শেষ লগ্নে আমি যেন তা দূর করতে পারি। আপনারা আমাকে দোয়া করুন।" এর পরই হক সাহেব ঘোষিত হয়েছিলেন দেশের শত্রু রূপে।

শহিদ সোহ্‌রাবর্দী সাহেব জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ সালে বলেছিলেন, "আদতে ভারত বিভাগের প্রয়োজনেই আমাদের যুক্তিকে জোরদার করবার জন্যেই আমরা দাবি করেছিলাম আমরা এক জাতি, বাদবাকী অন্যেরা আলাদা জাতি। এটা ছিল পুরোপুরি অযৌক্তিক।"

আর মুজিব বলেছেন, "পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনি হিসাবে অবাধ শোষণের ক্ষেত্র হিসাবে থাকতে চায় না, পূর্ব বাংলা স্বায়ত্তশাসন চায়।"

যেদিন ফজলুল হককে দেশদ্রোহী ঘোষণা করা হয় সেইদিন হকসাহেবের পাশে ছিলেন মুজিব। যেদিন সোহ্‌রাবর্দীকে দেশের শত্রু ঘোষণা করা হয় সেদিনও তাঁর পাশে ছিলেন মুজিব।

আর আজ যখন মুজিবুর রহমানকে দেশের শত্রু বলে ঘোষণা করা হল সেদিন হক সাহেব নেই, অনেকদিন আগে নিজ গৃহে অন্তরীণ থেকে তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। আজ সোহ্‌রাবর্দী নেই, অনেক দিন আগে বাংলা দেশ থেকে অনেক দূরে এক নিভৃত, নির্জন হোটেল-

কক্ষে স্বজনহীন পরিবেশে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মুজিব—তাঁকে যেদিন দেশদ্রোহী, দেশের শত্রু ঘোষণা করা হল, সেদিন তাঁর পাশে আছে বাংলা দেশের সাত কোটি মানুষ।

৩০শে মে ১৯৫৪ সাল। ঠিক ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর মতো তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি এক বেতার ভাষণে বললেন, জনাব ফজলুল হক পাকিস্তানের শত্রু। তিনি বিশ্বাসঘাতক। তিনি পূর্ববঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করবার ষড়যন্ত্র করছিলেন। আজ ইয়াহিয়া খাঁর যে অভিযোগ মুজিবের বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়েছে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে, সেই ১৭ বছর আগে একই অভিযোগ ঘোষিত হয়েছিল হক সাহেবের বিরুদ্ধে। সেদিনের ইতিহাস ছিল মর্মান্তিক।

বহু রাজনৈতিক উত্থান পতনের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা বর্ষীয়ান মৌলভী ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট দলপতি হিসাবে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন এবং তেসরা এপ্রিল (১৯৫৪) তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় বিরাশি বছর। ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তার প্রায় ১১ বছর পরে তিনি পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে এসে বিভক্ত পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন। সমগ্র পূর্ববঙ্গ-বাসীদের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষও এ ঘটনাকে স্বাগত ও আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন, কারণ বাঙ্গালী মাত্রের অন্তরেই—হিন্দু মুসলমান, পশ্চিম বা পূর্ববঙ্গবাসী নির্বিশেষে—হক সাহেবের জন্য একটি বিশেষ স্নেহ, শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন পাতা ছিল।

৩০শে এপ্রিল শুক্রবার—অর্থাৎ ঢাকায় ফজলুল হক সাহেবের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণের সাতাশ দিন পরে—কলকাতার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি একটি সুখবর পরিবেশন করল যে সেদিন অপরাহ্নে

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছাবেন। সংবাদে আরও জানা গেল যে তাঁর পায়ে গুরুতর এক ধরনের ব্যথায় হক সাহেব বেশ কিছুদিন ধরে যন্ত্রণা ভোগ করছেন। হাঁটা চলা করতে তাঁর খুব কষ্ট তো হয়ই, এমনকি অনেক সময় তাঁকে ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে চলাফেরা করতে হয়। তিনি তাঁর পায়ের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসছেন। তাঁর আ-যৌবন বন্ধু ও সহযোগী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে হক সাহেব তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা তো করাবেনই, এমনকি প্রয়োজন বোধে একজন সার্জেনের সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করবেন। তাঁর পায়ের যন্ত্রণার বিষয়ে হক সাহেব পরে কলকাতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে খাজা নাজিমুদ্দিনের শাসনকালে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃতি দেবার আন্দোলন যখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, তখন শোভাযাত্রীদের উপর বহুবার পুলিশ নির্দয়ভাবে লাঠিচালনা করে। এ ধরনের একটি শোভাযাত্রায় হক সাহেব নিজেও ছিলেন এবং তিনি পায়ে গুরুতর লাঠির আঘাত পান। হক সাহেব বলেন যে তাঁর পায়ের যন্ত্রণা সেই আঘাতজনিতই।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৪, শুক্রবার বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজের একটি বিমানে মৌলভী ফজলুল হক সাহেব সদলবলে দমদমে উপনীত হলেন। সঙ্গে তাঁর পত্নী ও দশ বছর বয়স্ক পুত্রও ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বাংলার প্রিয় নেতা ফজলুল হক সাহেবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কলকাতায় হক সম্বর্ধনা সমিতি গঠিত হয়েছিল। এ সমিতির কার্যালয় ছিল ৭নং ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে।

বিমান বন্দরে হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এক বিপুল জনতা। তাঁরা পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে হক

সাহেবকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে যান। অনেকে তাঁর পাদস্পর্শ করে শ্রদ্ধা জানান। এ সময় হক সাহেবকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং তিনি সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর পূর্ব পরিচিত অনেককে চিনতে পারলেন। পূর্ব পাকিস্তানে দীর্ঘদিন কারাভোগ করবার পর মুক্ত শ্রীধীরেন ভৌমিক হক সাহেবকে মালাদান করতে গেলে তিনি তাঁকে চিনতে পারেন। হক সাহেবের পায়ের যন্ত্রণার দরুণ পাক ডেপুটি হাইকমিশনার জনাব নসরুল্লার গাড়ি বিমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং জনাব হক গাড়ি করে বিমানঘাটির লাউঞ্জ পর্যন্ত আসেন। সেখানে তাঁকে অনেকে মালাভূষিত করেন এবং সমবেত সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি। তাঁর কলকাতায় আগমনের উদ্দেশ্য কি এ প্রশ্নের জবাবে জনাব হক বললেন যে, তাঁর পায়ের চিকিৎসা করানই তাঁর কলকাতা ভ্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। "এখানে আমার পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও দেখা করতে এসেছি। এই কলকাতা শহরে ৬০ বছরেরও বেশী আমি আমার জীবনের সেরা আনন্দময় দিনগুলি কাটিয়েছি। সে সব দিনগুলির কথা আজ বড় মনে হচ্ছে। সে সব পুরনো স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে এবং সম্ভব হলে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করতে আমি কলকাতায় এসেছি। ভবিষ্যতেও আবার আসব।"

সমবেত সাংবাদিকদের কাছে একটি বিবৃতিও দিলেন হক সাহেব। বিবৃতিতে তিনি বললেন: "আপনাদের সকলের সহৃদয় ব্যবহারে আমি এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছি যে কথা বলবার এবং মনের ভাব যথাযথ প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। আল্লার কৃপায় আমি সংগ্রামে জয়লাভ করেছি। তবে আমি এ কথা দিচ্ছি যে আমি যাই লাভ করে থাকি না কেন, তা আপনাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে গ্রহণ করব। যথার্থ অংশ আপনাদের দিতে কখনই কার্পণ্য করব না। দুই বাংলার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়েও উপযুক্ত সময়ে আমি

সব বলব। সে এক বিরাট কাহিনী। আমি আমার বন্ধু ডাঃ রায়ের সঙ্গেও উভয় বঙ্গের সমস্যা নিয়ে আলোচনা, করবার ইচ্ছা রাখি।"

জনাব হক আরো জানান যে সম্ভবত ৫ই মে বুধবার তিনি ঢাকায় ফিরবেন।

এরপরে জনাব নসরুল্লা ও পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব আজিজুল হকের সঙ্গে ফজলুল হক সাহেব পার্কসার্কাসে তাঁর কড়েয়া রোডের বাসভবনে চলে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কড়েয়া রোডের এ বাড়িটি বহুদিন হলো হস্তান্তরিত হয়েছে।

সেদিনই রাত্রে হক সাহেব আনন্দবাজার পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের সময় কথাপ্রসঙ্গে এই আশা প্রকাশ করলেন যে, সংশ্লিষ্ট সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করলে অদূর ভবিষ্যতে উভয় বঙ্গের মধ্যে ভ্রমণ-ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের পথ বর্তমানের তুলনায় অনেক সুগম হবে।

পরদিন অর্থাৎ শনিবার সকালে জনাব হক রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ডাঃ রায় এগিয়ে এসে দোতলার সিঁড়ির মুখে হক সাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন এবং রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বহু সরকারী কর্মচারী তাঁদের প্রাক্তন প্রভুকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। ডাঃ রায় অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে হক সাহেবের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন এবং যথোপযুক্ত পরামর্শ দিলেন। ঠিক হলো যে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জনাব হকের রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষা করান হবে। হক সাহেবের চিকিৎসক বিশিষ্ট সার্জেন রায় বাহাদুর ডাঃ সতীশচন্দ্র ঘোষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

উভয় মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দুই বাংলার নানা সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি

আলোচনা হল অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে। মোটামুটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করলেন :

(১) দুই বঙ্গের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা প্রথা বিলোপের প্রসঙ্গ।

(২) উভয় বঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(৩) উভয় বঙ্গের মধ্যে ভ্রমণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করা ও যাত্রীদের কষ্ট লাঘবের জন্য থ্রু টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা।

(৪) সামান্ত ব্যবসা সংক্রান্ত বিধিনিষেধগুলি শিথিলকরণ।

(৫) পূর্ববঙ্গের যে সব বাস্তুহারা সে সময়ে ভারতে ছিলেন তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন।

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে যাতে আস্থা সঞ্চারিত হতে পারে, সেজন্য ঐ রাজ্যে যে সব পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুদের ধর্মীয় মনোভাবে আঘাতমূলক গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা হয়েছে, আলোচনার সময় ডাঃ রায় হক সাহেবের দৃষ্টি তার প্রতি আকর্ষণ করলেন। জনাব হক ডাঃ রায়কে জানালেন যে তিনি কার্যভার গ্রহণ করবার পর ইতিমধ্যেই এ ধরনের বই বাজেয়াপ্ত করেছেন।

হক সাহেব ডাঃ রায়কে জানান যে ঢাকার বর্ধমান হাউসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি বাংলা অ্যাকাডেমি গঠন করা হয়েছে। হক সাহেব আরো বললেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের জন্য উভয় বঙ্গের মধ্যে বাঙ্গালী পণ্ডিত, অধ্যাপক ও সাহিত্যসেবীদের বিনিময় করতেও তাঁরা প্রস্তুত আছেন।

ডাঃ রায়ের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা শেষ হবার পর জনাব হক রাইটার্স বিল্ডিংস-এর রোটাণ্ডাতে সমবেত সাংবাদিকদের বললেন যে : "দুই বাংলার মধ্যে পাসপোর্ট ও ভিসা প্রথা প্রবর্তনের যৌক্তিকতা আমি বুঝি না। দুই দেশের মধ্যে এই

ব্যবধান কৃত্রিম। দুই বঙ্গের মধ্যে" জনাব বলেন, "অবাধ যোগাযোগের সব বাধানিষেধ অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং আমি আমার এ প্রচেষ্টায় আমার বন্ধু বিধানবাবুর সহযোগিতা কামনা করি।"

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে হক সাহেব বললেন যে, তিনি তাঁদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তিনি অবিলম্বে বর্ণ হিন্দু ও তফসিলী হিন্দুদের মধ্যে দুজনকে তাঁর মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করবেন ও পরে আরও দুজন হিন্দুকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করবার পরিকল্পনা তাঁর আছে।

জনাব হক আরো বললেন যে, তিনি সারাজীবন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের দরিদ্র জনসাধারণের ও কৃষককূলের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সংগ্রাম করছেন। তাদের দু মুঠো অন্ন ও বস্ত্র যোগানই হলো তাঁর জীবনের ব্রত।

হক সাহেব যখন রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে বিদায় নিলেন, ডাঃ রায় নীচে এসে গাড়ি পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁদের দুজনকেই অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। হক সাহেব গাড়ীতে ওঠবার আগে ডাঃ রায়ের দিকে তাকিয়ে প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, "ঢাকায় যাওয়ার আগে আপনার লগে আবার দেখা হইব।"

ডাঃ রায় সহাস্যে জবাব দিলেন : "নিশ্চয়ই।"

অশীতিপর নেতা শনিবার দিনটি অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত করেন। বহু পুরনো বন্ধু, সহকর্মী ও পরিচিত ব্যক্তি কড়েয়া রোডে তাঁর বাসভবনে দেখা করতে আসেন। দুটি সম্বর্ধনা সভাতেও তিনি যোগ দেন, তার মধ্যে একটি ময়দানে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তাঁবুতে।

রবিবারও কলকাতায় ফজলুল হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

করবার জন্য কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সভাতেই তিনি উভয় বঙ্গের মধ্যে ভিসা প্রত্যাহার, সীমান্তের উভয় দিকের বাস্তুহারাদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সুদৃঢ় করার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সময় গঠিত শান্তি সেনা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মিডলটন রোডে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ রাধাবিনোদ পাল। এই সভায় সম্বর্ধনার উত্তরে এক আবেগময় ভাষণে জনাব হক বললেন যে, "জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে তাঁর আর কোন আশা বা আকাঙ্খা নেই—উভয় বঙ্গের মধ্যে যে মিথ্যার প্রাচীর রচিত হয়েছে তা অপসারিত করবার কাজ যদি তিনি আরম্ভ করে যেতে পারেন, তাহলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন।" বৃদ্ধ ফজলুল হক ভাবাকুল কণ্ঠে বলে চললেন : "দুই বাংলার মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা একটা স্বপ্ন ও ধোঁকা মাত্র। করুণাময় খোদাতাল্লার দরবারে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা এই যে তিনি যেন এই ব্যবধান দূর করতে পারেন। আমার এই আকাঙ্ক্ষা যাতে পূরণ হয় সেজন্য আপনারা আমাকে দোয়া করুন।" জনাব হক আরো বললেন যে, "মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে সংগঠিত শান্তি সেনার বাণী পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক—এও তাঁর কামনা।"

সেদিনই অর্থাৎ রবিবার খিদিরপুরে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটি মিলিত সম্বর্ধনা সভায় জনাব হক আবার বললেন যে,—"বাঙ্গালীরা পূর্ব বা পশ্চিম যে যেখানেই থাকুক না কেন তাঁরা অখণ্ড এবং তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতেই হবে।" জনাব হক আরও বললেন : "বাংলাদেশ রাজনৈতিক দিক থেকে দু-ভাগ হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উভয় বঙ্গের কোন পার্থক্য নেই। রাজনীতিকরা দেশটাকে দু-ভাগ করে

এই সাংস্কৃতিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেননি, ভবিষ্যতেও কোনদিন পারবেন না।" হক সাহেব বললেন যে, "জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি যেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার ব্রতে অতিবাহিত করতে পারেন এই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।" তিনি উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানদের প্রতি এই আবেদন জানালেন যে, "তাঁরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে প্রকৃত ভাই-ভাই'এর মতো মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করেন।"

ট্রেড ইউনিয়ান নেতা মৃণালকান্তি বসুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত শ্রমিক প্রতিনিধিদের একটি সভায় জনাব হক জানালেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যে সব পাঠ্যপুস্তকে অপ্রয়োজনীয় আরবী ফারসী উর্দু শব্দ দিয়ে সুমধুর বাংলাভাষাকে বিকৃত করা হয়েছে, সেগুলি বাতিল করবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তিনি ইতিমধ্যেই অবলম্বন করেছেন।

পরদিন সোমবার তেসরা মে সকালে কলকাতার বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে জনাব হকের ভাষণ প্রথম পৃষ্ঠায় সবিস্তারে প্রকাশিত হল।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা শিরোনামা দিলেন : "Haq Hopes End Artificial Barrier."

আনন্দবাজার পত্রিকা শিরোনামা দিলেন : "উভয় বঙ্গের মধ্যে মিথ্যার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলার সংকল্প—সম্বর্ধনা সভায় মিঃ হকের ভাষণ।"

যুগান্তর পত্রিকা 'হক-যোগ' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনাব ফজলুল হকের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে লিখলেন :

"রাজনৈতিক জীবনের বহু বৈচিত্র্যের, বহু বাধা বিপত্তি অতিবাহিত করিয়া অবিভক্ত বঙ্গের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মৌলভী ফজলুল হক সাহেব আবার দীর্ঘকাল পরে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীরূপে কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। উভয়বঙ্গে হক সাহেবের অনুরাগী

ও গুণগ্রাহীর অভাব নাই। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক আকর্ষণই জনসাধারণকে চিরকাল তাই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। এখনও সে অবস্থার বিন্দুমাত্র অন্যথা হয় নাই,—পূর্ববঙ্গের বিগত সাধারণ নির্বাচনে তাঁহার বিপুল জয় ও পশ্চিমবঙ্গ আগমন উপলক্ষে তাঁহার বিরাট সম্বর্ধনাই উহার প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই উপলক্ষে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরাও আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। ভারত বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্ববঙ্গের শাসনভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হওয়ায় তৎসম্পর্কে সকলের মনেই নতুন আশা জাগিয়াছে।

...হক সাহেব উভয় বঙ্গের জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থক করিয়া তুলুন, দুই ভাগের অধিবাসীদের মধ্যে যে দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহার অবসান করুন, আমাদের শুধু এইটুকুই প্রার্থনা।".

তেসরা মে, এলগিন রোডে নেতাজী ভবনের সভায় যোগ দিতে এসে জনাব হকের মনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও পরলোকগত শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের স্মৃতি ও অতীতের নানা ঘটনার কথা জেগে উঠল। তিনি স্মৃতিচারণ করে বললেন যে, এই ভবনে অতীতে তিনি কত বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কত বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং ভারতের এই দুই শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাছে মাতৃভূমির সেবায় নিঃস্বার্থ কর্মের প্রেরণা লাভ করেছেন। সাম্প্রদায়িক দানবের ঊর্ধ্বে ওঠবার মত শক্তি তিনি তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই অর্জন করেছেন। তিনি সুভাষবাবু ও শরৎবাবু এই মহান ভ্রাতৃদ্বয়ের কাছে এই সত্যই শিক্ষা করেছিলেন যে, জাতি হিসাবে বাঙ্গালী দল এবং সাম্প্রদায়িক বিবেচনার ঊর্ধ্বে। (আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ফজলুল হক সাহেব বলতে থাকেন যে, "একটি দেশের রাজনৈতিক বিভাগে

আমি বিশ্বাস করি না। প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুস্থান' ও 'পাকিস্তান'—এই দুটি বিভেদার্থক শব্দের সঙ্গে আমি এখনও পর্যন্ত সুপরিচিত হতে পারিনি। ভারত বলতে আমি এখনও হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয় অংশকেই বুঝি। যারা আমাদের এই সোনার দেশকে দু'ভাগ করেছে তারা দেশের দুশমন। আমার মতে পাকিস্তান বলতে কিছুই বোঝায় না,—এই শব্দটি বিভ্রান্ত সূচনা করবার ও স্বার্থসিদ্ধির একটি পন্থা মাত্র।")

জনাব হক আরও বললেন যে, "এই উপ-মহাদেশের মুসলমানদের এ ধরনের চিন্তা করতে বাধ্য করা হয়েছে যে, তারা যেন আশমান থেকে কিছু পেয়ে গিয়েছে এবং প্রতিবেশীদের জন্য তাদের কিছুই করবার নেই। কিন্তু—" জনাব হক বলে চললেন, "আমি এই দর্শনে বিশ্বাস করি না। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আন্তরিকতার সঙ্গে দেশের সেবায় ব্রতী হয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভবপর। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ আমাকে ভারতের ইতিহাস গঠন করতে হচ্ছে। আশা করি ভারত কথাটি ব্যবহার করায় আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আমি ভারত-এর দ্বারা পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ উভয় অংশকেই বুঝিয়েছি। অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগের প্রায় এগার বছর পর আমি আপনাদের আশীর্বাদে আবার শাসন ক্ষমতা লাভ করেছি,—এই সময়ের মধ্যে পাক-ভারত রাজনীতির ঘটনাস্রোত অথবা ভারতের প্রতি পাকিস্তানের নীতি পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা আমার ছিল না। আবার আমি কাজ আরম্ভ করলাম এবং ভারত পাকিস্তানের যুক্ত ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে আমার কর্তব্যে আমি সর্বদা সচেতন থাকব। সারা পৃথিবী জুড়ে যে নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে ভারতকে যদি তাতে যোগ্য অংশ গ্রহণ করতে হয়, তবে আল্লা যদি আমায় বাঁচিয়ে রাখেন, আমি ভারতের এই অংশের নেতাদের সঙ্গে একত্রে

দাঁড়িয়ে ভারতকে—অর্থাৎ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান এই মিলিত ভূখণ্ডকে—বিশ্বের দরবারে একটি বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব।" জনাব হক পরিশেষে বলেন যে, "পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক নন, তাঁদের অধিকাংশ দরিদ্র ও অজ্ঞ, কিন্তু তাঁদের মন ও দিল খোলা। তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের বাঙ্গালী ভাইদের সঙ্গে সুখে শান্তিতে ও মৈত্রীতে বাস করতে চান। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আমার প্রথম প্রধান কর্তব্য হবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সাম্প্রদায়িকতার নির্বাসন এবং দুই বাংলার মধ্যে মধুর সম্পর্ক স্থাপন।")

হক সাহেব আরও বলেন যে, শ্রীঅমিয়নাথ বসু তাঁকে নেতাজী ভবনে আহ্বান জানিয়ে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য পালন করেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে শরৎ বসু অ্যাকাডেমী যে কোনো প্রয়োজনে তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তার কাজে তখনই হাজির হবেন।

সেদিনই, অর্থাৎ সোমবার সকালে, বালিগঞ্জে ৬৭নং সাদান অ্যাভিনিউতে আইনজীবী শ্রীঅজিত দত্তের বাসভবনে 'ভারত-পাক মৈত্রী সমিতি' জনাব ফজলুল হক সাহেবকে একটি সম্বর্ধনা জানান। এ সম্বর্ধনার উত্তরেও জনাব হক উভয় বঙ্গের মধ্যে সহযোগিতা ও সংপ্রীতির আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে, "সমগ্রভাবে দেখলে ধান, পাট ও কয়লা ইত্যাদিতে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দুই বাংলার মধ্যে রাজনৈতিক বিভাগ যাই থাকুক না কেন, উভয় অংশের জনসাধারণ ও সরকার যদি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সহযোগিতা করেন তবে এ সব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর কোন অভাব কখনও ঘটতে পারে না।"

(জনাব হক আরও বলেন যে, "বাঙ্গালী এক অখণ্ড জাতি, তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং তাদের আদর্শ এক, জীবনের উদ্দেশ্য

এক এবং জীবন ধারণের পদ্ধতিও এক। দেশ বিভাগ সত্ত্বেও দুই বাংলা মিলিত ভাবে অনেক বিষয়ে সারা দেশকে পথ দেখাতে পারে।"

হক সাহেব আরও বলেন, "তাঁর রক্তে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নেই এবং তিনি সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসও করেন না।"

পাক-ভারত মৈত্রী সংঘের পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রীধীরেন ভৌমিক জনাব হককে সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি মানপত্র অর্পণ করলেন। এই মানপত্রে জনাব হককে "বাংলার ইতিহাস স্রষ্টা পুরুষ" এবং "গরিবের রাজা" বলে উল্লেখ করা হয়। কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, "মৌলভী হক বাংলার কৃষকের বন্ধু।"

এই দিনই অর্থাৎ তেসরা মে অপরাহ্ণে হক সাহেব সস্ত্রীক ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ঘুটিয়ারী শরীফের দরগায় তাঁদের পারিবারিক মানত পালনের জন্য যান।

৪ঠা মে মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকাও 'মিথ্যার প্রাচীর' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জনাব ফজলুল হককে অভিনন্দিত করলেন।

৪ঠা মে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় 'ফজলুল হক সম্বর্ধনা সমিতি'র উদ্যোগে গ্র্যাণ্ড হোটেলের প্রিন্সেস হলে হক সাহেবের সম্মানে একটি প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার বহু শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইন সভার সদস্য, মন্ত্রী, কূটনীতিক প্রতিনিধিরা এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট নাগরিক যোগদান করেন। শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এই রবীন্দ্র সংগীতটি গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন। সমিতির পক্ষ থেকে হক সাহেবকে মাল্যভূষিত করা হয়। হক সাহেবের বয়স অনুসারে ঐ মালাটি বিরাশিটি চাঁপা ফুলে গাঁথা হয়। একটি রম্য আধারে একটি সুদীর্ঘ

অভিনন্দনপত্র এবং কৃষক প্রজা পার্টির আদর্শের প্রতীক স্বরূপ রৌপ্য নির্মিত একটি ক্ষুদ্র আকারের লাঙ্গল জনাব হককে উপহার দেওয়া হয়।

জনাব হক অভিনন্দন বাণীর উত্তরে বলেন যে, "সমবেত সুধীবৃন্দের কেউ কেউ তাঁকে ইংরাজীতে, আবার কেউ কেউ বাংলায় ভাষণ দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রাণের ভাষা বাংলাতেই কথা বলবেন।"

গ্র্যাণ্ড হোটেলের সভায় জনাব হক বললেন, কলকাতায় আসবার আগে তিনি কেবল একটি কথাই ভেবেছেন যে, যাঁরা চিরকাল তাঁকে স্নেহ করেছেন, ভালবেসেছেন, দুঃসময়ে সাহায্য করেছেন, নিরাশার সময় উৎসাহ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেই তিনি যাচ্ছেন এবং তাঁদের প্রীতি তিনি নিশ্চয় লাভ করবেন ; কিন্তু তিনি যে এরূপ বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করবেন তা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাঁর অতি প্রিয় কলকাতা শহরে, যেখানে কৈশোর থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তিনি অতিবাহিত করেছেন, সেখানে যে সহৃদয়তার পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি অভিভূত।

পরিশেষে সমবেত জনমণ্ডলীর অন্তর স্পর্শ করে হক সাহেব বললেন :

"কলকাতা শহরের প্রতি, আপনাদের প্রতি আমার যে ঋণ তা আমি কোনদিন পরিশোধ করতে পারব না। আপনাদের সেবা, আপনাদের খেদমতই আমার লক্ষ্য। বাংলার মঙ্গল, বাংলা ভাষার সেবা, বাঙ্গালী জাতির উন্নতিই আমার জীবনের পথে একমাত্র কাম্য, একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সত্যপথে, ন্যায়ের পথে আমি যাতে চলতে পারি, আপনারা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করুন, দোয়া করুন এবং বিশ্বাস করুন সে আমি আপনাদের চৌকিদার হয়েই পূর্ববঙ্গে আছি।"

জনাব হকের এই মর্মস্পর্শী ভাষণে অনেকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে

ওঠে এবং মুহুর্মুহু করতালির দ্বারা অভিনন্দন জানান হয়। সভান্তে অনেকে তাঁকে আলিঙ্গন করেন।

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের গাওয়া 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি দিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত হয়।

সেদিনই বঙ্গীয় প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি আয়োজিত একটি সম্বর্ধনা সভায় জনাব হক বলেন যে, "পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষার জন্য উৎসাহ ও দরদ পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও বেশী। এমনকি পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র শিশুও বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেবার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।" তিনি সমবেত সংবাদপত্রসেবীদের আবেদন জানিয়ে বলেন : "আসুন, আমরা রাজনীতি ভুলে আমাদের মহান সংহতি ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করি।"

কমিটির পক্ষ থেকে একটি মানপত্রে বলা হ'ল : 'আপনি অতীতে যে সব জনকল্যাণমূলক কার্য করিয়াছেন এবং বর্তমানে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের উভয় বঙ্গের সম্পর্কে উন্নতির আশা জাগিয়াছে।'

মঙ্গলবার সকালে ক্লাইভ রো-তে 'মুসলিম চেম্বার অব কমার্স' জনাব হককে একটি প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। রাত্রে তিনি রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নৈশভোজ করেন।

৫ই মে বুধবার সকালে জনাব হক প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উভয় বঙ্গের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিকালে ৫২নং বিডন স্ট্রীটে সাধনা ঔষধালয়ের কলকাতা শাখায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে জনাব হক বললেন, "দেশের অবস্থার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি,···আজ আর কিছু বলব না। সাধনার ঔষধগুলি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তৈরী হয় বিরাশি বছরেও আমার

মাথায় যে কাঁচা চুল দেখছেন তা সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ মাথার ফল বলেই মনে করি।”

বুধবার ৫ই মে থেকেই জনাব হক ‘দেশের অবস্থার সম্বন্ধে’ আর বিশেষ কোন কথা প্রকাশ্যে বলেন নি, কারণ ইতিমধ্যে ঢাকা ও করাচীর প্রতিক্রিয়াশীল মহলে তাঁর কলকাতার ভাষণগুলির মর্মার্থ অত্যন্ত বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল, এবং তাঁকে ‘বিশ্বাসঘাতক’, ‘পাকিস্তানের পয়লা নম্বরের শত্রু’ ইত্যাদি অবমাননাকর আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছিল। কলকাতায় হক সাহেবের কানে সে সংবাদ পৌঁছেছিল।

৬ই মে বৃহস্পতিবার সকালে হক সাহেব রাইটার্স বিল্ডিংস-এ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে পুনরায় দেখা করলেন। কলকাতায় আসবার পর ডাঃ রায়ের সঙ্গে এই তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁরা নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করলেন এবং অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বিরাশি বছরের হক সাহেব তাঁর বাহাত্তর বছর বয়সের বন্ধু বিধানবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যদিও তাঁরা দুজনেই নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আবার তাঁদের মধ্যে দেখা হবে এই আশা প্রকাশ করলেন, কিন্তু ইহজগতে তাঁদের মধ্যে আর কোনদিন সাক্ষাৎ ঘটেনি।

কলকাতায় স্মরণীয় একটি সপ্তাহ কাটিয়ে ফজলুল হক সাহেব ঢাকায় ফিরলেন। যাত্রার পূর্বে তিনি একটি বিদায় বাণীতে বললেন : “বিষাদ ভারাক্রান্ত অন্তরে কলকাতায় আমার অগণিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীকে আমি বিদায় জানাচ্ছি। আমি বহুবার বলেছি যে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আমি প্রথম কলকাতায় আসি এবং আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই মহানগরীতেই অতিবাহিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের ঐতিহ্য, শিক্ষা দীক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও

যোগসূত্র এতই গভীর ও দৃঢ় যে রাজনৈতিক বিভাগ তা বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কলকাতায় আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলবার সময়ে আমি খোলাখুলি মন নিয়েই আমার অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছি।

আমি অবশ্য একথা শুনে বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইনি যে ঢাকায় একদল লোক, বিশেষ করে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আমার কথার কদর্থ করে নানারূপ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আমি তাদের কোন সমালোচনার কোন জবাব দিতে চাই না, শুধু বলব, আমার দলের কাছে নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে তাদের পক্ষে জনসাধারণের প্রতিনিধি সেজে কথা বলা সাজে না।

...আমি অবশ্যই একজন পাকিস্তানী, এবং আমি নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম লীগপন্থীর থেকে উৎকৃষ্ট পাকিস্তানী। কিন্তু আমি একজন পাকিস্তানী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে যেন কোনো রাজনৈতিক বিচ্ছেদ হয়নি এমন ভেবে তাঁদের সম্পর্ক উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ করার চেষ্টায় কোন দোষ দেখতে পাই না।

আমার এই বিবৃতি শেষ করার আগে আমি পুনরায় কলকাতার অধিবাসীদের তাঁদের সাদর ও আন্তরিক অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা রাখি ও বিশ্বাস করি যে দুই বাংলা মিলেমিশে কাজ করে তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধি ও সুখের পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে।"

১৯৫৪ সালের নির্বাচন নিছক ভোটের লড়াই ছিল না। সাত বছর ধরে মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব-বঙ্গের উপর যে নির্মম শাসন ও শোষণ চালিয়েছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তার সক্রিয় প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ পেল।

এই নির্বাচনের তাৎপর্য করাচী-লাহোর নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং পূর্ব-বাংলার বিদ্রোহী রূপে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে পূর্ব-বঙ্গে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিত্ব গঠন করবার সুযোগ দেওয়া হলে পূর্ব-বাংলা বিদ্রোহ করবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পূর্ববঙ্গ থেকে পাঞ্জাবী ও অবাঙ্গালী অফিসাররা অনবরত রিপোর্ট পাঠাতে থাকে যে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিত্ব গঠন করবার সুযোগ দিলে ব্যাপক অরাজকতা শুরু হবে, আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে, অবাঙ্গালীদের জীবন ও জীবিকার কোন নিরাপত্তা থাকবে না।

করাচী থেকে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ পূর্ব-বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জমানকে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিত্ব গঠন করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অবিভক্ত ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন লীগ নেতা কেন্দ্রের এই পরামর্শকে যথাযথ মনে করতে পারেন নি। তিনি যুক্তফ্রন্টের নেতা ফজলুল হক সাহেবকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই মন্ত্রিত্ব গঠনের কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা জেলে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ওয়ার্ডারদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার জন্য আবার পূর্ব-বঙ্গের আমলাতন্ত্র কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট পাঠায়। পূর্ববঙ্গের অবাঙ্গালী আমলাতন্ত্র যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কাজ বানচাল করার জন্য নানা ভাবে

মন্ত্রীদের আদেশ ও নির্দেশ অমান্য করে সরাসরি কেন্দ্রের কাছে নানা মনগড়া উদ্দেশ্যপ্রসূত রিপোর্ট পাঠিয়ে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দিল।

পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেই অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বার্থচক্র শিল্পক্ষেত্রকেই বেছে নিল। পূর্ব-বঙ্গের পাঞ্জাবী ও অবাঙ্গালী শাসকগোষ্ঠী এবং আদমজী মিলের অবাঙ্গালী কর্তৃপক্ষ এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ১৯৫৪ সালের মে মাসে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড দাঙ্গা বেঁধে গেল। অবাঙ্গালী মিল কর্তৃপক্ষ অবাঙ্গালী শ্রমিকদের লাঠি, তরবারি, এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত সরবরাহ করে বাঙ্গালী শ্রমিকদের আক্রমণ করার জন্য উসকিয়ে দিয়েছিল। এই দাঙ্গায় প্রায় শতাধিক শ্রমিক নিহত হয়, বহু নারী ও শিশুর মৃতদেহ শীতলক্ষ্যা নদীর জলে ভাসতে দেখা যায়। আদমজী জুট মিলে প্রধানত বাঙ্গালী শ্রমিকদের যে ইউনিয়ন ছিল তার সভাপতি ছিলেন মৌলানা ভাসানী সাহেব। সাধারণ নির্বাচনের সময় ইউনিয়নভুক্ত সদস্যরা যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের ভোট দিয়েছিলেন। সেজন্য মালিক পক্ষ আগে থেকেই তাঁদের উপর বিক্ষুব্ধ ছিলেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সাফল্যের পর তারা যখন কেন্দ্রীয় স্বার্থচক্রের উসকানি পেল, তখন বাঙ্গালী শ্রমিকদের 'উপযুক্ত শিক্ষা' দেবার জন্য তারা এগিয়ে এল। তার ফলেই এ হাঙ্গামা।

আদমজী জুট মিলে দাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের করাচী শাখা জিগির তুলল : পূর্ব-বাংলায় আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। সেখানে কারও জান-মান আর নিরাপদ নয়। সেখানে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শাসন চালু কর।

কোন রকম তদন্তের আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ফতোয়া জারী করলেন : এ হাঙ্গামার জন্য দায়ী কম্যুনিস্ট ও একশ্রেণীর দেশদ্রোহী।

কম্যুনিস্টদের পাকড়াও কর। সীমান্তে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের দিকে নজর রাখো।

এই সময়কার ঘটনাপ্রবাহের দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে যে পূর্ব-বাংলার নবজাত মন্ত্রিসভাকে খতম করবার উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ও তাঁর পশ্চিম-পাকিস্তানী সাঙাতের দল কি অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিলেন।

আদমজী জুট মিলের ঘটনায় তৎক্ষণাৎ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা না হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমে পূর্ব-বাংলার প্রাদেশিক পুলিস বাহিনী—যার নাম ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলস—তাকে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে এনে তার মাথার ওপর বসিয়ে দেওয়া হোল পূর্ববঙ্গের পাঞ্জাবী জি-ও-সিকে অর্থাৎ সামরিক কর্তৃপক্ষকে। পূর্ববঙ্গ সরকারের হোমরা-চোমরা অবাঙ্গালী দু-হাজার চার-হাজারি অফিসাররা প্রাদেশিক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এ সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চললেন। তাদের কাছ থেকে মদৎ পেয়ে কোন কোন থানার দারোগা পর্যন্ত মন্ত্রিসভার নির্দেশকে অমান্য করে চললেন।

অন্যদিকে মুসলিম লীগওয়ালাদের মালিকানায় পরিচালিত (পাকিস্তানের অধিকাংশ সংবাদপত্রই তখন এদের খপ্পরে) সংবাদ-পত্রগুলি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে এমন জোরে গলা ফাটাতে লাগল যে পারলে তারা তখনই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শূলে চড়িয়ে দেয়।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে চারিদিকে যখন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছিল সে সময় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব কলকাতায় এলেন। হক সাহেবের কলকাতা সফরের কাহিনী আগেই শুনিয়েছি।

ফজলুল হক কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরে যাবার কয়েক দিন পরেই গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী তাঁকে করাচীতে জরুরী তলব করলেন। হক সাহেব ২১শে মে শুক্রবার করাচীতে উপস্থিত হলেন। গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জনাব হকের সপ্তাহব্যাপী বাগবিতণ্ডাময় আলোচনা হল। শেরে-ই-বঙ্গাল ফজলুল হক পূর্ব-বঙ্গের জন্য স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করলেন। ৩১শে মে রবিবার গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ জনাব ফজলুল হক ও তাঁর যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে পূর্ব-পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত করলেন। জবরদস্ত সেনাপতি, সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব, মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠানো হল। তৎকালীন গভর্নর বৃদ্ধ চৌধুরী খালিকুজ্জমান অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। ইস্কান্দার মির্জা তাঁর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারী করে নিয়ে এলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ সিভিলিয়ান জনাব নিয়াজ মহম্মদ খানকে (এন. এম. খান নামে কুখ্যাত এই পাঞ্জাবী আই-সি-এস অফিসার অবিভক্ত বাংলার নানা জেলায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন)।

৩০শে মে সন্ধ্যায় জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলী জনাব ফজলুল হককে পাকিস্তানের শত্রু ও পূর্ব-বঙ্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করলেন। করাচী থেকে ঘটা করে প্রচার করা হল যে যুক্তফ্রণ্ট পূর্ব-বঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিল তাই পাকিস্তানকে অন্তর্ঘাতীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যই পূর্ব-বঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা খারিজ করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হলেন।

পদচ্যুত মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব ৩০শে মে সকাল সওয়া নটা নাগাদ করাচী থেকে ঢাকায় ফেরবার পথে ঘণ্টাখানেক তাঁর

বিমানটি দমদম বিমানঘাটিতে থেমেছিল। হক সাহেবের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য—জনাব আজিজুল হক, জনাব আতাউর রহমান খান, যিনি পরে কিছুদিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, এবং শেখ মুজিবুর রহমান খান (সে সময় তরুণ নেতা, বর্তমানে পাকিস্তানের রাজনীতির অন্যতম নায়ক)।

যথারীতি সমবেত সাংবাদিকরা হক সাহেবকে ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। কিন্তু উদ্বিগ্ন ও পরিশ্রান্ত জনাব হক কিছু বলতে অস্বীকৃত হলেন। তিনি শুধু বললেন: "আমার কাছে এসে আর কোন লাভ নেই। আমি কিছুই বলতে পারব না। আমার মুখ বন্ধ।"

করাচীর সঙ্গে হক সাহেবের রাজনৈতিক লড়াইয়ের খবর কলকাতার সাংবাদিকরা পেয়েছিলেন—সুতরাং তাঁরা আর পীড়াপীড়ি করলেন না। প্রবীণ নেতাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ঠিক বেলা ১০টা বেজে ১৫ মিনিটে হক সাহেবের বিমান দমদমের মাটি ছেড়ে, কলকাতার মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল। তাঁর প্রিয় কলকাতার মাটিতে শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হকের পা আর কোন দিন পড়েনি। ঢাকায় ফিরে তিনি হলেন অন্তরীণ, কিন্তু তিনি চিরদিন অমর হয়ে আছেন হিন্দু-মুসলমান পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙ্গালীর অন্তরে।

অন্তরীণ হবার পর প্রায় ছ-মাস জনাব ফজলুল হক ঢাকায় তাঁর কে এম দাস লেনের বাড়ির বাইরে পা ফেলেন নি। অত্যন্ত নিকট আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কারো তাঁর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি ছিল না। হক সাহেবের বাড়ীর বাইরে ২৪ ঘণ্টার জন্য সশস্ত্র প্রহরী বসানো হয়েছিল—এ ছাড়াও গোয়েন্দা পুলিশ ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্-এর অফিসাররা তাঁর বাসভনের একতলাটা প্রায় দখল করেই রেখেছিল। তাদের মধ্যে একজন সব সময় দোতলায় ওঠবার

সিঁড়ি আগলে বসে থাকত যাতে কেউ হক সাহেবের ঘরে যেতে না পারে। এমনকি ওরা জুন ঈদের জমায়েতে নামাজ পড়তে ফজলুল হক সাহেবকে যেতে দেওয়া হল না। তিনি বোধ হয় জীবনে এই প্রথম বাড়ীতে ঈদের প্রার্থনা করলেন।

পূর্ব-বঙ্গের যিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, যিনি তিন যুগ ধরে বাংলা দেশের কৃষক সমাজের সেবা করেছেন, যাঁকে ১৯৪৬ সালে পর্যন্ত মুসলিম লীগের পক্ষে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি এবং বাংলা দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যাঁর জনপ্রিয়তা কায়েদ-ই-আজমের চেয়েও কম ছিল না, বাংলা দেশের সেই প্রবীণতম জননেতাকে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিতে করাচীর সাম্রাজ্যবাদীরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। করাচীর নেতাদের এই আচরণে পূর্ব-বাংলার জনগণ সেদিন ঘৃণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। মৌলানা ভাসানী তখন লণ্ডনে। তিনি একটি বিবৃতি দিয়ে বললেন যে যুক্তফ্রণ্টের নেতারা যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তা হলে পূর্ব বাংলার শতকরা ৯৫ ভাগ লোকই বিশ্বাসঘাতক—কারণ তারা ব্যাপকভাবে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন জানিয়েছে।

দেশভাগের সিদ্ধান্ত পাকা হবার পরই মুসলিম লীগের সামনে সমস্যা হিসাবে দেখা দিল. পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী এই পদের দাবিদার হলেন। শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিন। কলকাতায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল, সোহরাওয়ার্দী বিপুল ভোটে পরাজিত হলেন এবং নাজিমুদ্দিন জয়যুক্ত হলেন। সেই দিন নাজিমুদ্দিনের সমর্থনে ছিলেন মৌলনা আক্রাম খাঁ ও ইস্পাহানী শিল্পপতি গোষ্ঠী। সোহরাওয়ার্দীর বিশ্বস্ত অনুগামী আবুল হাসেমও শেষ সময়ে সোহরাওয়ার্দীর পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই

দেশ ভাগের পর মুসলিম লীগের সকলেই ঢাকায় গিয়ে নাজির উজির হয়ে বসলেন কিন্তু পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা এবং ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রূপকার সোহরাওয়ার্দীর ঢাকা যাওয়া হল না। শুধু ঢাকা যাওয়া বন্ধ নয়, পাকিস্তানে সোহরাওয়ার্দী নিতান্তই অনাথ শিশুর মত আচরণ পেলেন। তাই বেশ কিছুকাল তাঁকে কলকাতা-দিল্লীতে গান্ধীজির পিছনে পিছনে ঘুরতে হল।

১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম চেষ্টা করলেন ঢাকা প্রবেশের। স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছলেন কিন্তু স্টিমার থেকে নামবার আগেই পুলিশ এসে সোহরাওয়ার্দীকে ঘিরে ধরল এবং ফেরত স্টিমারে কলকাতার একখানা প্রথম শ্রেণীর রিটার্ন টিকিট হাতে দিয়ে কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে লিয়াকৎ আলি খানের এই সময়কার বিখ্যাত উক্তি "The mad dog let loose by India."

সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তান প্রবেশে বাধাদানে মুখ্য নায়ক ছিলেন নাজিমুদ্দিন। আর নাজিমুদ্দিন এই কাজ করছিলেন পাঞ্জাবী চক্রের অঙ্গুলি হেলনে। কারণ '৪৮ সাল থেকেই অবাঙালী চক্র পূর্ববঙ্গকে গ্রাস করতে শুরু করে। নাজিমুদ্দিন ও অবাঙালী চক্র যতই নিষ্পেষণ বৃদ্ধি করে ততই মুসলিম লীগ বিরোধী জনমত গড়ে উঠতে থাকে।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দীকে পিছনে রেখে সোহরাওয়ার্দীর অনুগামীরা ঢাকায় মুসলিম লীগের উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। ডেমোক্রেটিক ইউথ লীগ গঠিত হল '৪৮ সালে। এই সংগঠনের মধ্যে যুব ও তরুণ সম্প্রদায় নিজেদের সমবেত করে।

কিন্তু নাজিমুদ্দিন চক্র অঙ্কুরেই বিনাশ করতে সচেষ্ট হন এই সংগঠনকে। ব্যাপক গ্রেপ্তার করা হয়, এমন কি গুণ্ডা নিয়োগ করেও যুব লীগের সংগঠনকে নির্মূলের চেষ্টা করা হয়। ঢাকায় মুসলিম লীগ

নেতা খাজা আসারুল্লার নেতৃত্বে গুণ্ডা বাহিনী অনেক কিছু তছনছ করে। মুজিবুর রহমান এই সময় ঢাকায় নাজিমুদ্দিন পন্থী মুসলিম লীগের বিরোধিতায় ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতৃত্বে প্রথম সারিতে এগিয়ে আসেন। মুজিবুর রহমানই এই সময় থেকে সোহরাওয়ার্দীকে ঢাকায় এনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন। প্রথম চেষ্টা হয় সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় আসবেন এবং হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করবেন, কিন্তু নাজিমুদ্দিন চক্র সোহরাওয়ার্দীকে কোনক্রমে ঢাকায় ঢুকতে দেয় না। পরে সোহরাওয়ার্দী পূবের আশা ত্যাগ করে পশ্চিমে করাচী চলে যান। তখন নাজিমুদ্দিন বিরোধীদের নজর পড়ে মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানীর উপর। মৌলানা ভাসানী আসাম প্রদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং দেশভাগের সময়ে ও পরে তিনি আসাম জেলে বন্দী ছিলেন। ভাসানী সাহেবের জিন্না বিরোধী হিসাবে নাম ছিল। সোহরাওয়ার্দীকে যখন রিটান টিকিট কেটে নারায়ণগঞ্জ থেকে কলকাতা পাঠানো হয় ঠিক সেই সময়েই ভাসানীকে আসাম জেল থেকে মুক্তি দিয়ে ভারত সীমান্ত পার করে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মৌলানা ভাসানী ঢাকায় আসতেই মুসলিম লীগের তরুণ অংশ এবং কিছুটা প্রগতিশীল অংশ ভাসানীকেই তাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করে।

ঢাকায় সোহরাওয়ার্দীপন্থী ও জিন্না বিরোধী বলে সেদিন যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন মহম্মদ আলি, তফজ্জল আলি, ডাঃ এ এম মালি, খাজা নসুরুল্লা, খয়রাৎ হোসেন, আমেদ আলি খান, আনোয়ারা খাতুন। এই জিন্নাবিরোধী নেতৃত্বের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটল জিন্নার ঢাকা আগমনের মুহূর্তে। সেইদিন এমন একটা অঘটন ঘটে গেল যা বিদ্যুৎস্পর্শের মত গণতান্ত্রিক কর্মীদের ঝাঁকানি দিল। সমগ্র পূর্ববাংলাকে তা অবাক করল।

পাকিস্তান স্রষ্টা কায়েদে আজম ১৯৪৮ সালের ১৯শে মার্চ গভর্নর জেনারেলের পতাকা উড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তান সফরে ঢাকা পৌঁছালেন। সেদিন রাত্রে ঢাকা শহর বিচিত্র আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়েছিল। জাতির পিতাকে জানানো হল সাদর অভ্যর্থনা। সারা পূর্ববাংলা থেকে রেল, স্টিমার, নৌকা ও হাঁটা পথে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের কায়েদে আজমকে শুধুমাত্র একবার চোখের দেখা দেখে জীবনের সাধ পূরণের জন্য ঢাকায় জমায়েত হয়েছিল। অগনিত মানুষ যেন জনসমুদ্র—এবং তারা মুহুর্মুহু মাত্র দুটি ধ্বনি উচ্চারণ করছিল। 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'।

মহম্মদ আলি জিন্না তখন স্বভাবতই পাকিস্তানে জনসাধারণের চোখে অবিসংবাদী নেতা। তাঁর যে কোন কথাই পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের অন্তরের কথা—তিনি যা বলবেন, যা করবেন, তাই ধ্রুব সত্য। অথচ ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে এসে বললেন, প্রিয় ছাত্রগণ, আমি তোমাদের জানাতে চাই উর্দু ই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। সে সময় কয়েকজন ছাত্র একযোগে প্রতিবাদ করে উঠলেন—না, না, না। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বরিশালের মেধাবী ছাত্র ফজলুল করিম। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। মুসলিম লীগের ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে এ যেন এক চ্যালেঞ্জ। অপমানিত কায়েদে আজম তাড়াতাড়ি ভাষণ শেষ করে স্থান ত্যাগ করলেন। সমাগত ছাত্ররা ধ্বনি তুললেন, 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।' মেজর জেনারেল আয়ুব খান পূর্ব-পাকিস্তানের তৎকালীন সাব এরিয়া কমাণ্ডারের পাশে বসে দেখলেন সব।

পল্টন ময়দানে জনসভা। লক্ষ নরনারীর সমাবেশ। কায়েদে আজম জিন্না জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু ই হবে। অন্য কথা যে বলবে সে পাকিস্তানের শত্রু।" কিন্তু সমাবেশের অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ উঠল No, No, No. We

Want Bengali. সেদিন We Want Bengali ধ্বনি যিনি তুলেছিলেন তিনি ছিলেন মুজিবুর রহমান আর সেদিন কায়েদে আজম জিন্না যাদের শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিলেন ২৩ বছর পর সেই মুজিবুর খুন করলেন পাকিস্তানের দ্বিজাতি তত্ত্বকে। ২৩ বছর পর জিন্নার আসনে উপবিষ্ট ইয়াহিয়া খাঁ ঘোষণা করলেন মুজিবুর পাকিস্তানের শত্রু।

কায়েদে আজম জিন্নাকে এর আগেও একবার শুনতে হয়েছিল, No, No, No.

"কায়েদে আজম জনাব মহম্মদ আলি জিন্না বহরমপুরের মুসলিম কাউন্সিলের প্রাদেশিক কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করছেন। যেমন পোশাক পরিচ্ছদে তেমনি মেজাজে তিনি ঘোর ইউরোপীয়ান। মিটিং-এ হাজার হাজার পল্লীগ্রামস্থ বাঙালী মুসলমান উপস্থিত কায়েদে আজমকে দেখতে, তাঁর বক্তব্য শুনতে। কর্মকর্তারা বাংলাদেশের রীতি অনুযায়ী যে প্রোগ্রাম করেছেন তাতে প্রথম স্থানই দেওয়া হয়েছে উদ্বোধন সঙ্গীতের। গায়ক আর কেউ নয়, আব্বাসউদ্দিন। কায়েদে আজম প্রোগ্রামখানা হাতে তুলেই প্রোগ্রাম ঘোষণা করলেন—"নো মিউজিক।" প্রতিক্রিয়া ঘটতে মিনিট খানেক সময় লাগল—"নো মিউজিক" তো "নো সভা।" কায়েদে আজম তানও দৃঢ়। সমবেত জনতা উঠে দাঁড়িয়েছে। সভা পণ্ড হতে চলেছে দেখে কায়েদে আজম নরম সুর কাটলেন। আব্বাস ভাটিয়ালী ধরলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে জনতা আবার আসন গ্রহণ করল। একটি নয়, তিনটি গান শোনাবার পর আব্বাস ছুটি পেলেন। তারপর শুরু হল সভার কাজ।

রাইটার্স বিল্ডিংএ দেশ বিভাগের শ্রাদ্ধকৃত্যের জন্য মিলিত হয়েছেন শেষ বারের মতো ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান সরকারের প্রধানরা। একদিকে দুই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী আর স্যার গোলাম মহম্মদ, অপর দিকে পশ্চিম বাংলার বিধান

চন্দ্র রায় ও পূর্ববাংলার খাজা নাজিমুদ্দিন। শ্রাদ্ধ তর্পণ কার্য সুসম্পন্ন হল রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দায়। চারজনই দু একটা কথা বলেছিলেন। তিন জনের ভাষা মন্তব্য ছেঁদো আটপৌরে ধরনের ছিল কিন্তু একজন ঘা দিলেন এক অপ্রত্যাশিত জায়গায়। গোলাম মহম্মদ আশা প্রকাশ করলেন যে বাঙালী হিন্দু মুসলমানেরা ভবিষ্যতে ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ অটুট রাখতে পারবেন, কেননা, This is the land of Swami Vivekananda and Rabindranath Tagore.

চমকে উঠেছিলাম। এক পাঞ্জাবী স্মরণ করিয়ে দিলেন সে নাম দুটো। এবং সে পাঞ্জাবী হিন্দু নন, মুসলমান।"

[যুক্তবাংলার শেষ অধ্যায়—কালীপদ বিশ্বাস]

লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে যাঁরা পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁরা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নি বাংলাদেশ ভাগ হবে। পাকিস্তান হবে দুই বাংলার হৃৎপিণ্ড চিরে। যখন পাকিস্তান কায়েম হতে চলেছে তখন লাহোর প্রস্তাবে "স্টেট্স্" কথাটি সংশোধন করে "স্টেট" করা হল দিল্লীতে লীগের কনফারেন্সের সভায়। বাংলাদেশে লীগের সেক্রেটারী আবুল হাসেম জিন্নাকে প্রশ্ন করলেন, "লাহোর প্রস্তাবে একাধিক স্টেট বাড়ানোর অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এখন সে অধিকার অস্বীকার করে পাকিস্তান কেবলমাত্র একটি 'স্টেট' হবে ঘোষণা করা হচ্ছে কেন?" কায়েদে আজম জানালেন, "ছাপার ভুলে স্টেটকে স্টেটস্ বলে লেখা হয়েছিল।" আবুল হাসেম তখন বললেন, "আমি তো 'সাবজেক্টস্ কমিটি'তে ছিলাম।" তিনি চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে সাক্ষী মানলেন। পরে যখন ভারতবর্ষের মত বাংলা দেশকেও দু টুকরো করার সিদ্ধান্ত হল তখন আবুল হাসেম প্রমুখরা

ডুবাডুবি হতে পরিত্রাণের আশায় গান্ধীজির মাধ্যমে শরৎচন্দ্র বসুর সহযোগিতায় "সভারেন বেঙ্গল" দাবি এনেছিলেন। [সভারেন বেঙ্গল ও শরৎ বসু ফর্মুলা অন্যত্র আছে]। সেই দেশ ভাগ হল। অনেকেই ভারতবর্ষ ছেড়ে পাকিস্তানে গেলেন। রাতারাতি নেতা হলেন, মন্ত্রী হলেন, কিন্তু অকুল পাথারে সম্প্রদায়ের লোকেদের ফেলে পালাতে পারলেন না সোহরাওয়ার্দী। সেই ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়ে গান্ধীজির সহযোগিতায় যে আশ্বাস প্রদানের জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন তা চিরকালের জন্য ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। কিন্তু সেদিনকার সেই আতঙ্কগ্রস্ত মুসলমান নরনারীদের পাশে থেকে তাদের সেবা করার পরিণতিতে পাকিস্তানের অবাঙালী নেতৃত্বের কাছে সোহরাবর্দীকেও দেশদ্রোহী আখ্যা পেতে হয়েছিল। সেই সময়ে চৌধুরী খলিকুজ্জমানকে এক পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন, "We did not expect Bengal to be partitioned"

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। হক সাহেব, সোহরাবর্দী কি চেয়েছিলেন আর কি পেয়েছিলেন সে বিচার ইতিহাস করবে। কিন্তু হক-সোহরাবর্দীর স্বপ্ন ও সাধনার সমাধিতে আবির্ভূত হলেন উভয়েরই প্রিয় স্নেহধন্য মুজিবুর রহমান।

"বেত মেরে কি মা ভুলাবি আমি কি মায়ের সেই ছেলে, দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি কে পালাবে মা ফেলে।"

মায়ের সেই ছেলে মুজিবুর। ফরিদপুর জেলায় টুঙ্গীপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে মুজিবুরের জন্ম। জমি, বন্যা, ঝড়, ফসল নষ্ট, দারিদ্র্য—এ সব নিয়েই পূর্ববঙ্গের গ্রামীন সমাজ গঠিত। মুজিবুরের মনে এই জীবনের সুস্পষ্ট ছাপ আমরা লক্ষ্য

করি। তাঁর পিতা শেখ লুৎফর রহমান আদালতের একজন সেরেস্তা-দার। পরিবারে যা জমিজমা ছিল তাতে মোটামুটি ভাবে তাঁদের ভালই চলে যেত। মুজিবুর তাঁর পিতার নীতিনিষ্ঠ ও সরল জীবনাচরণে যে অনেক পরিমাণে অনুপ্রাণিত, তিনি নিজেই সেকথা বলেছেন। তাঁর স্নেহশীলা দয়ালু মাতার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। মুজিবুর তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তান এবং তাই স্বভাবতই তাঁদের স্নেহের ভাগ তাঁর উপর বিশেষ ভাবে বর্ধিত হয়। এই পরিবারের ধর্মীয় আবহাওয়ায় মুজিবুরের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। মুজিবুরের দুই ভাই চার বোন। সাত বৎসর বয়সে ভর্তি হলেন গোপালগঞ্জের ইস্কুলে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ফজলুল হক আর সোহরাবর্দী সাহেব গোপালগঞ্জে সভা করতে আসবেন। সেই সভার উদ্যোগ আয়োজন করতে গিয়ে জেলে যেতে হল মুজিবুরকে। সাত দিনের জেল হল মুজিবুরের। ইতিহাসের এক নূতন মহালগ্ন সূচিত হল সেইদিন। হক সাহেব ও সোহরাবর্দীর সাথে ছাত্র কিশোর মুজিবুরের নাম প্রথম উচ্চারিত হল। তাই আজ দীর্ঘ ২৩ বছর পরে হক সাহেব-সোহরাবর্দীর আত্মা মূর্ত হয়ে উঠেছে মুজিবুরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এই গোপালগঞ্জেই সোহরাবর্দীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপর সেই ছাত্র মুজিবুর পেল তারুণ্য, পেল যৌবন, হলেন সোহরাবর্দীর সংগ্রাম সাথী, হলেন হক সাহেবের সহকর্মী। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগকে পূর্ব পাকিস্তানের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে যে নৌকো পাল তুলে যাত্রা শুরু করে তার কাণ্ডারী ছিলেন হক সাহেব আর সঙ্গে ছিলেন মুজিবুর। ১৯৫৪ সালে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রিসভায় হক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী আর মুজিবুর বাণিজ্যমন্ত্রী।

গোপালগঞ্জে ছাত্র বয়সে সাত দিনের জেল হয়েছিল মুজিবুরের। সে সাত দিনের অভিজ্ঞতা জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল মুজিবুরের।

গোপালগঞ্জ থেকে কোলকাতা। ১৯৪২ সালের কথা। '৪২ থেকে '৪৭ এই কটি বছর মুজিবুরের জীবনের স্মরণীয় বছর। বেকার হোস্টেল, ইসলামিয়া কলেজ, ফজলুল কাদের চৌধুরী, কাজী আহমেদ কামাল, জহীরুদ্দিন প্রভৃতির সাহচর্যে সংগঠন ও রাজনীতির পাঠ প্রভৃতির মধ্যে এসে যায় ১৯৪৬ সাল। '৪৬ সালের নির্বাচনে সোহরাবর্দী ফরিদপুর জেলার পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দিলেন মুজিবুরের হাতে। ফরিদপুর জেলায় নির্বাচনের কাজে ঘুরে বেড়ালেন গ্রাম থেকে গ্রামে। শুধু ফরিদপুরই নয়, যশোর, খুলনা বরিশাল জেলাতেও তদারকী করলেন নির্বাচনের। এই নির্বাচন কেন্দ্র করে পরিচিত হলেন সব দলের নেতাদের সঙ্গেই। তমিজুদ্দিন খাঁ, লাল মিয়া, হুমায়ুন কবির প্রমুখ নেতাদের সাথে। কোন্ দল করেন, কোন্ দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা—সেই বিচারে নয়, ফরিদপুর জেলার একজন উদ্যোগী কর্মী হিসাবে সকলের সঙ্গে পরিচয়। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে বেকার হোস্টেলের অদূরে গুলি চলল। নিহত হল আবরুস সালাম। আজাদ হিন্দ ফৌজের অভ্যুত্থান ও বীরগাথা উদ্দীপ্ত করল তরুণ মুজিবুরকে। নেতাজীর জীবন সংগ্রাম উদ্দীপ্ত করল মুজিবুরের তরুণ প্রাণকে। আবরুস সালামের মৃত্যুবরণে মুজিবুরের জীবনে আরও বেশী করে সঞ্চারিত হল আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজীর নাম। দেশ ভাগ হল। মুজিবুর কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে ঢাকায় এসে ভর্তি হলেন ল' কলেজে।

৩রা জুন বৃটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর রোয়েদাদ ঘোষণা করার পরেই মুসলিম লীগের কয়েকজন বামপন্থী কর্মীর উদ্যোগে ঢাকায় গণ আজাদী লীগ নামে এক ক্ষুদ্র সংগঠন তৈরী হয়। 'আশু দাবি ও কর্মসূচি' নামে তাঁরা একটা স্মারকলিপি প্রকাশ করেন, তাতে বলা হয় "সত্যিকার পাকিস্তান অর্থে আমরা বুঝি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, সুতরাং

আমাদের কর্তব্য এই নবীন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা, মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী আনয়ন করা।" ভাষা সম্পর্কে বলা হয়, "বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"

ঢাকায় যখন গণ আজাদী লীগ গঠিত হয়েছে তখন কলকাতার কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে ঠিক করেন তাঁরা ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি তা বিবেচনা করে পাকিস্তানে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। পরবর্তী কালে এই ছাত্র রাজনৈতিক কর্মীরা ঢাকায় এসে গণতান্ত্রিক যুব লীগ গঠন করেন। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামে একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়। এই মজলিস থেকেই একটা পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় যার নাম ছিল "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু"। তমদ্দুন মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম রাষ্ট্র ভাষা প্রসঙ্গে লেখেন, "ইংরাজরা এক সময় জোর করে আমাদের ঘাড়ে ইংরাজী ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল। সেই ভাবে কেবল মাত্র উর্দু অথবা বাংলাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্বের সেই সাম্রাজ্য-বাদী অযৌক্তিক নীতিরই অনুসরণ করা হবে।" তিনি উল্লেখ করেন যে কোন কোন মহলে সেই চেষ্টা চলছে এবং তাকে প্রতিহত করার জন্যে আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

আর একবার কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর প্রবন্ধে লেখেন, "পূর্ব বাংলার মুসলমানদের আড়ষ্টতার দুটি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা আর দ্বিতীয় ধর্মীয় ভাষা সম্পর্কিত মনে করে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ।

বাঙালী মুসলমানের সত্যিকার সভ্যতা বলতে যেন কোন জিনিসই

নাই। পরের মুখের ভাষা পরের শেখানো বুলিই যেন তার একমাত্র সম্পদ। স্বদেশে সে পরবাসী, বিদেশীই যেন তার আপন।

তাই তার উদাসী ভাব পশ্চিমের প্রতি অসহায় নির্ভর আর নিজের প্রতি নিদারুণ আস্থাহীনতা। পশ্চিমী চতুর লোকেরা এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা জানে যে বৃহৎ পাকড়ী বেঁধে বাংলা দেশে এলেই এদের পীর হওয়া যায়। কমের পক্ষে মৌলবীর আসন গ্রহণ করে বেশ দু পয়সা রোজগারের যোগাড় হয়। শহুরে দোকানদার যেমন গ্রাম্য ক্রেতাকে ঠকিয়ে লাভবান হতে পারে, এ যেন ঠিক সেই অবস্থা। বাস্তবিক বাঙালী মুসলমান বাঙ্গাল বলেই শুধু পশ্চিমা কেন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সর্বভূতের কাছেই উপহাস ও শোষণের পাত্র।

আমি উর্দুভাষাকে নিন্দা বা অশ্রদ্ধা করি না কিন্তু বাঙালী মুসলমানের উর্দুর মোহকে সত্য সত্যই মারাত্মক মনে করি। যখন দেখি উর্দু ভাষায় একটা অশ্লীল প্রেমের গান শুনেও বাঙ্গালী সাধারণ ভদ্রলোক আল্লাহের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে মনে করে ভাবে মাতোয়ারা অথচ বাংলাভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীতও হারাম্ বলে নিন্দিত, তখনই বুঝি এইসব অবোধ উক্তি বা অবোধ নিন্দার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই।

এতদিন মুসলমান কেবল হিন্দুর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে বসে বলেছে যে হিন্দুরা বাংলাভাষাকে হিন্দুয়ানীর ভাবে ভরে দিয়েছে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তো তা চলবে না। এখানে ইসলামী ঐতিহ্য পরিবেশন করার দায়িত্ব মখ্যত মুসলমান সাহিত্যিকদেরই বহন করতে হবে। তাই আজ সময় এসেছে মুসলমান বিদ্বজ্জন পুঁথি সাহিত্যের স্থলবর্তী বাংলা সুসাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপন করবেন তবেই মাতৃভাষা সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ হবে এবং ইসলামী ভাবধারা

যথার্থভাবে জনসাধারণের প্রাণের সামগ্রী হয়ে তাদের দৈন্য ও হীনতা-বোধ দূর করবে। উর্দুর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে আমাদের কোন কালেই যথার্থ লাভ হবে না।"

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সব কথা বলবার আগে একটি কাহিনী বর্ণনা করে নিই। যে কাহিনীটি সুসাহিত্যিক শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। কাহিনীটি শহীদুল্লাহ সম্পর্কে। শহীদুল্লাহ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন ছিলেন। স্যার আশুতোষের চেষ্টাতেই বিদেশে গিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ভাষার উপর গবেষণা করে ডক্টরেট পান।

শহীদুল্লাহ-র এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক্‌পাল ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ভট্টশালী মশায়ের বাড়ীতে প্রায়ই আসতেন শহীদুল্লাহ সাহেব। একদিন ওঁরা সকলে খেতে বসেছেন, শহীদুল্লাহ তাঁর অতীতের অপমানের কাহিনী বর্ণনা করছিলেন, কেমন করে কিছু হিন্দু তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, কাছে আসতে দেননি। ভট্টশালীমশায় ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুনতে শুনতে হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। বললেন, "শহীদ, কয়েকটা লোকের ভুলের জন্যে সবাইকে ভুল বুঝো না। সব হিন্দুই যে তোমাকে সরিয়ে রাখতে চায় না তার প্রমাণ দেবার জন্যে এই দেখো আমি তোমার এঁটো খাচ্ছি।" এই বলে সত্য সত্যই নলিনীবাবু শহীদুল্লাহর মুখ থেকে ভাত তুলে নিলেন। তারপর এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। শহীদুল্লাহ নাকি সেদিন শিশুর মত কেঁদেছিলেন।

এই মানসিকতা, এই পরিবেশ, যার মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না, জাতিগত অভিমান ছিল না। সেই পূর্ববঙ্গের মানুষ প্রথম দিন থেকেই পাকিস্তান সৃষ্টির পর মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাংলাভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে ব্রতী হয়। ১৯৪৮ সালের

৩১শে ডিসেম্বর পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে শহীদুল্লাহ যে ভাষণ দেন সে কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' যে ভাষণের পর শহীদুল্লাহ সাহেবকে প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে নিগৃহীত হতে হয়েছিল, এমন কি একদিন রাতের অন্ধকারে বৃদ্ধ শহীদুল্লাহ ঢাকা ত্যাগ করে কলকাতা চলে আসার পরিকল্পনাও করেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণে শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি লুঙ্গি দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।"

শহীদুল্লাহর আরও কয়েকটি বক্তব্য :

"স্বাধীন পূর্ববাংলার স্বাধীন নাগরিক রূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য।···এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়, পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারে নি···স্বাধীন পূর্ববাংলায় কেউ আরবী হরফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫ জন নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষর জ্ঞান বিস্তারের জন্য চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ববাংলার বাইরে বাংলাদেশ না থাকতো আর যদি গোটা বাংলাদেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকতো তবে এই অপর প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে, কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না।" শহীদুল্লাহ আরও বলেন, "পূর্ববাংলা জনসংখ্যায় গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, পর্তুগাল, আরব, পারস্য, তুর্কি প্রভৃতি দেশের

চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধন ধান্যে, জ্ঞানে গুণে, শিল্প বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করে তুলতে হবে। তাই কেবল কাব্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগে বাংলাকে উচ্চ আসন দিতে হবে।"

১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত করাচীর কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে সর্বপ্রথম দাবি জানান যে উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও সরকারী কাজে ব্যবহার করতে হবে। তিনি বললেন যে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসাবে বাংলা তার যোগ্য মর্যাদা পাবার দাবি নিশ্চয়ই জানাতে পারে।

উত্তরে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খান ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জানান যে, 'একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে একমাত্র উর্দু এবং অন্য কোন ভাষা নয়।' পূর্ববাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন জনাব লিয়াকতের আরেক ডিগ্রি উপরে গিয়ে বলেন যে, 'পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ লোক উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দেখতে চান। বাংলার রাষ্ট্রভাষা হবার কোন যৌক্তিকতাই তাঁরা দেখতে পান না।'

খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪৮-এর ৪ঠা মার্চ কলকাতায় একটি বিবৃতিতে বললেন :—"I am sure nobody excepting a handful of persons in East Bengal demand that Bengali should be the official language of Pakistan." লিয়াকৎ-নাজিমুদ্দিনের উক্তি পূর্ববঙ্গে ধিকৃত হল,

কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত হলেন বিপুল ভাবে অভিনন্দিত। করাচীর লীগ পাণ্ডারা ভেবেছিলেন যে 'হিন্দু' ধীরেন্দ্রবাবুর ঔদ্ধত্যের জন্য পূর্ববঙ্গ তাঁকে 'হিন্দুস্থানের দালাল' বলে উপহাস করবে।

পূর্ববঙ্গের সর্বত্র বাংলাভাষার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্বেষমূলক অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। বাংলাকে অন্যতম সরকারী ভাষা করবার দাবি জানিয়ে জনসভা, মিছিল অনুষ্ঠিত হল, পথে পথে পোস্টার পড়ল। গঠিত হল ভাষা সংগ্রাম কমিটি। পূর্ববঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হল। ভাষা সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন ছাত্রনেতা মুজিবুর তাঁদের অন্যতম। শোভাযাত্রা বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল সারা পূর্ববঙ্গে, পুলিশী হামলায় আহত হলেন শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হক। একটি শোভাযাত্রা নিয়ে রাজপথে যাচ্ছিলেন ৭৬ বৎসরের বৃদ্ধ হক সাহেব, পুলিশ লাঠিপেটা করল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী যাবৎ মানুষকে। লাঠির আঘাত থেকে নিস্তার পেলেন না হক সাহেবও। পায়ে আঘাত লাগল—সেই আঘাত জনিত বেদনার নিরাময়ের জন্যে ১৯৫৪ সালে ছুটে এসেছিলেন কলকাতায়, বন্ধু বিধানচন্দ্র রায়কে দেখাতে।

ভাষা আন্দোলনের বিক্ষোভ যখন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে তখনই জনাব জিন্না এলেন ঢাকায়। ঢাকার ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন : "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" সেই দিন রাত্রেই সভা বসল ছাত্র নেতাদের। শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ, শামসুল হক ও আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত গণতান্ত্রিক যুব লীগ। সকলের এক কথা : 'উর্দুকে কখনোই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মানা হবে না।' মুজিবুর রহমান বললেন, "না, কখনই নয়, বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।" এই

সভাতেই ঠিক হল ২০শে মার্চ কার্জন হলে যে সভা হবে সেখানে প্রতিবাদ করা হবে। কার্জন হলের সভাতে জিন্না যখন আবার বললেন, উর্দু'ই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, তখন হলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের 'না—না' ধ্বনিতে জিন্নার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। পাকিস্তানের স্রষ্টা, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, যাঁর ব্যক্তিত্ব অতীতে বহুবার গান্ধী, নেহরু, প্যাটেলকে পর্যন্ত মূক করে দিয়েছে, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে এই 'না' ধ্বনি তোলবার স্পর্ধা প্রকাশ করেছিল যে সে হল আজকের মুজিবুর রহমান। ক্ষোভে, রাগে, অপমানে জিন্না সভাকক্ষ ত্যাগ করে গেলেন।

পাকিস্তান-স্রষ্টা জিন্নার জীবনে তাকে প্রথম অপমান ও বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে হল পূর্ব পাকিস্তানে। জিন্নার তাঁকে 'না' করবার প্রথম আওয়াজ তুললেন মুজিবুর রহমান।

এই সময়ে একদিন জনাব লিয়াকৎ আলি খান আতাউর রহমানকে বলেছিলেন : "বাংলা ভাষা হিন্দু সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, সেই ভাষার পক্ষে দাবি তুলে আপনারা পাকিস্তানের মূল আদর্শ-টাকেই ধ্বংস করে দিচ্ছেন।" আতাউর জবাব দিয়েছিলেন, "আদর্শ! বাংলা দেশকে লুঠ করাই আদর্শ নাকি? বাংলাকে কেবল হিন্দুর ভাষা এ কথা বলা শুধু অন্যায় নয়—অপরাধ।" জনাব লিয়াকৎ আলি খান বলেন, "বুঝেছি আপনাদের মতলব। আপনারা চান আলাদা হয়ে যেতে। বাংলা দেশকে স্বাধীন করতে।"

কথাটা চাপা থাকেনি। লিয়াকৎ আলি খাঁর সন্দেহের কথা ছড়িয়ে পড়ে পাঁচজনের মধ্যে। মুজিবুর বাংলা ভাষা নিয়ে সংগঠিত করলেন ছাত্র সমাজকে। সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল নিপীড়ন। প্রথমে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হল কলেজ থেকে, তারপর গ্রেপ্তার। ১৯৪৮ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মুজিবুরকে গ্রেফতার করা হল।

এল ১৯৪৮ সাল। মার্চ মাসে মুজিবুরকে আবার জেলে পোরা

হল। লীগ সরকারের আশা মুজিবুরকে জেলে পুরে ভাষা আন্দোলনের নামে সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনকে বিনষ্ট করতে হবে। মুজিবুর সম্পর্কে অভিযোগ: কমিউনিস্টদের সঙ্গে মিশে বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু সম্ভব হল না বেশীদিন জেলে রাখা। জেল থেকে মুক্তি পেলেন মুজিবুর। তখন তিনি শুধু ছাত্র-নেতা নয়, মুজিবুর জননেতার আঙ্গিনায় পা দিলেন।

১৯৪৮ সালে গঠিত হল আওয়ামী লীগ। জেলে থেকেই নেতৃপদে নির্বাচিত হলেন মুজিবুর। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন মুজিবুরকে বের করে দেওয়া হয় তখন একটা শর্ত দেওয়া হয়েছিল যদি সে ভবিষ্যতে ভাল হয়ে চলবার মুচলেকা লিখে দেয় তবেই সে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাবে। কিন্তু মুজিবুর সেই মুচলেকা লিখে দেননি। সেদিন তিনি বলেছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি আবার ফিরে আসব, তবে ছাত্র হিসাবে নয়। মুজিবুর তাঁর কথা রেখেছিলেন। ১৯৪৯ সালে মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার আড়াই বৎসর পরে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু সেদিন মুজিবুর আর ছাত্রও নন, ছাত্র-নেতাও নন, তিনি তখন আওয়ামী লীগের নেতা।

মুসলিম লীগ যখন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন তখনই পূর্ববাংলার তরুণ ও প্রবীণ রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে পারলেন মুসলিম লীগের দিন শেষ হয়ে গেছে, মুসলিম লীগ এখন শুধু কতিপয় নেতার ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার।

মৌলানা ভাসানী ঢাকা আসবার পর প্রথম এক বৈঠকে মিলিত হলেন মিঃ মহম্মদ আলি, ডাঃ মালেক ও তোফাজ্জল আলি প্রমুখের সঙ্গে। এই বৈঠকে সকলে কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁরা নাজিমুদ্দিন ও আক্রাম খাঁর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। ঢাকায় আসার পর থেকেই মৌলানা ভাসানী তরুণদের নেতৃত্বে নিয়ে

আসবার চেষ্টায় ব্রতী হন। "Maulana Bhasani embarked on the uphill task of building up popular leaders from among uncorrupted younger people. The Maulana pinned his hope on a student leader, Shaikh Mujibur Rahman. While in London in 1954, Maulana Bhasani had told Khondakar Mohammed Elias, a young leftist journalist, that Pakistan's prosperity was assured if Mujibur could grow into a man."

[Eclipse of East Pakistan]

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন নারায়ণগঞ্জে এক সম্মেলনে গঠিত হল আওয়ামী মুসলিম লীগ। মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খাঁ, শামসুল হক, মুজিবুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিরা এই নতুন দলের নেতৃত্ব নিলেন।

মৌলানা ভাসানী সভাপতি, আতাউর রহমান খা, আবদুস সালাম খান, আবদুল মনসুর আহম্মদ সহ-সভাপতি, শামসুল হক নির্বাচিত হলেন সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমান, রফিকুল আহসান ও খোন্দকার মুস্তাক আমেদ নির্বাচিত হলেন সহকারী সম্পাদক হিসাবে। মুজিবুর জেলে থেকেই সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। পাকিস্তানের রাজনীতি যখন মুসলিম লীগের উঁচু মহলের কোন্দলে দূষিত, সেই সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করে আওয়ামী লীগ প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় কৃষক নেতা, শ্রমিক নেতা ও ছাত্র নেতাদের দলে টেনে নেয়।

এই নতুন দলে আরও যাঁরা এলেন প্রধানত তাঁরা হলেন মুসলিম লীগ রাজনীতিতে বিক্ষুব্ধ, আর যাঁরা পাকিস্তানে প্রকৃতই

গণতন্ত্র চান। মুসলিম লীগের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর আপাত লক্ষ্য ছিল নতুন দলের মাধ্যমে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করা। অপর দলের লক্ষ্য শুধু ক্ষমতা দখল নয়, গণতান্ত্রিক শাসনই হবে প্রধান কথা। তাই দলের নামকরণ নিয়েই সম্মেলনে বেশ কিছুটা গণ্ডগোল হল। মহম্মদ তোয়াহা, মিঃ ওয়ালী আহাদ দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেবার দাবি জানালেন, এমন কি এক সময় তাঁরা বিষয় নির্বাচনী কমিটির সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন। মৌলানা ভাসানী দেখলেন মুসলিম লীগের নেতাদের রাতারাতি প্রগতিশীল করবার চেষ্টা করা হলে সম্মেলনই ভেস্তে যাবে, তাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত সভাপতির আসন থেকে রুলিং দিতে হল : প্রথম—জমিদারী প্রথা বিলোপ করতে হবে, দ্বিতীয়—গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পার্টির পোড় খাওয়া নেতারা তখনকার মানুষের মেজাজটা বুঝতে পারেন। তাই ভাষা ও স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন দুটিকেই সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মুখে কেউ না বললেও পূর্ব পাকিস্তান বাঙালীদের জন্য এই মনোভাব জনমনে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে।

এসে গেল ১৯৫০ সাল। '৫০ সালে লীগ সরকারের দমননীতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসে লীগ সরকারের কারসাজিতে দাঙ্গা শুরু হল সারা পূর্ববঙ্গে। লিয়াকৎ আলি খান পূর্ববঙ্গে এসে বললেন, 'পূর্ববঙ্গের হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা পূর্ববাংলায় স্বাধীনতা ঘোষণার ষড়যন্ত্র করেছিল, তারই বিরুদ্ধে মুসলিম জনগণের এই অভ্যুত্থান। লিয়াকৎভাষ্য এই অভ্যুত্থানে শিকার হলেন শ্রীমতী ইলা মিত্র, শিকার হলেন রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলের খাপরা ওয়ার্ডের বন্দীরা।

১৯৫০ সাল। নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হয়েছেন, লিয়াকৎ আলি খান প্রধান মন্ত্রী। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে পূর্ববঙ্গ। প্রায় ২০ হাজার লোক অনাহারে মারা গেছে। লিয়াকৎ আলি খাঁ ঢাকায় এলেন। বর্ধমান হাউসে অবস্থান

করছেন লিয়াকৎ আলি খান। বিরাট এক ভুখা মিছিল নিয়ে এগিয়ে চললেন মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান ও শামসুল হক। রমনার কাছে পুলিশ প্রথমে গতিরোধ করল শোভাযাত্রার, তারপর নির্মম ভাবে লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিল শোভাযাত্রাকে। গ্রেপ্তার করল ভাসানী, মুজিবুর ও শামসুল হককে। জেলে বসেই ভাসানী, মুজিবুর, শামসুল হক দিনের পর দিন আলোচনা করলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি, কর্মসূচি। মুজিবুর জানালেন, মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনা দরকার। এখানে উল্লেখযোগ্য মুজিবুর জেলে আসবার আগেই লাহোরে গিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন।

এর পরেই সোহ্‌রাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানে আসতে সুযোগ পেয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে পুনর্বাসন পেয়েছিলেন এবং পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। পাকিস্তান রাজনীতিতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর পুনর্বাসন সম্ভব হয়েছিল একমাত্র মৌলানা ভাসানী ও মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে। যদিও পরে ভাসানীর সঙ্গেও সোহ্‌রাওয়ার্দীর ঝগড়া বাঁধে এবং উভয়কে উভয়ের বিষ নজরে পড়তে হয়। কিন্তু সে কথা পরে। তার আগে '৫০ সালে পাকিস্তান জেলের অভ্যন্তরের কিছু কাহিনী বলে নিই। সে কাহিনী হল খাপরা ওয়ার্ডের কাহিনী।

এই বর্ণনা তুলে ধরছি সেদিন খাপরা ওয়ার্ডের বন্দীদের জবানবন্দী থেকে :

খাপরা ওয়ার্ডে : ২৪শে এপ্রিল—১৯৫০

১৯৫০ সালের এই অগ্নিক্ষরা দিনে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলের খাপরা ওয়ার্ডে রাজবন্দীদের উপর গুলি চলে। ফলে সাতটি প্রাণ ঢলে পড়ে মৃত্যুর মুখে, প্রায় ২০।২৫ জন হয় মারাত্মক ভাবে আহত,

এবং এর সঙ্গে সঙ্গে নির্মম লাঠিচার্জের ফলে ৩।৪ জন আজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়।

একটু পটভূমিকা দিয়ে ওইদিনকার ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরতে চাই।

জেলে তখন চলছিল রাজবন্দীদের মর্যাদা আদায়ের লড়াই। ঢাকা জেলের বন্ধুরা প্রায় দেড়শ দিন অনশন ধর্মঘট শুরু করে যে সামান্য সুবিধাটুকু আদায় করেছিল, যে সংগ্রামে কুষ্টিয়ার শিবেন রায় জেলখানাতেই আত্মাহুতি দিল, নানাভাবে সরকার সেটুকুও কার্যকরী করতে গাফিলতি দেখাতে লাগল।

স্বভাবতই প্রায়ই এটা ওটা নিয়ে জেলার সুপারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হতো। কথা কাটাকাটি অনেক সময় চরম তিক্ততা সৃষ্টি করত।

এসময় আমরা বাধ্য হলাম জেলখানায় কয়েদীদের দুর্দশার দিকে নজর দিতে। আমাদের সবচেয়ে যেটা পীড়া দিত সেটা হলো বৃটিশ আমল থেকে কয়েদীদের শাস্তিস্বরূপ ঘানির লোহার রড কাঁধে করে গরুর মত ঘুরে তেল ভাঙ্গা। আমরা এই অমানুষিক ব্যবহারের অবসান দাবি করলাম। এছাড়া কয়েদীদের আরও কিছু দাবি উত্থাপন করায় তারাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে উঠল। এমন কি একবার কয়েক শত কয়েদী কোন একটা দাবি আদায়ের ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে অনশন ধর্মঘটেও যোগ দিল। সাধারণ কয়েদীদের এরূপ অবাধ্যতা সরকার ও জেল কর্তৃপক্ষকে উৎক্ষিপ্ত করে তুলল।

এ সময় আই জি পি জেল পরিদর্শন করতে চাইলে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। তিনি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন কিন্তু যাবার সময় সুপারকে ডেকে আমাদের খাপরা ওয়ার্ডে একত্রে থাকার উপর আক্রমণ চালালেন এবং ওখান থেকে ১৫।১৬

জনকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যত্র ১৪ নং কনডেমনড বা খারাপ সেলে নেবার আদেশ দিয়ে গেলেন।

এ থেকেই ঘটনা চরমে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তা রক্তাক্ত সংঘর্ষে পরিণত হয়।

আমরা জেলখানার খাপরা ওয়ার্ডে একত্র থাকা আমাদের একটি মৌলিক অধিকার বলে মনে করি এবং কোন মতেই আমরা সে অধিকারকে খর্ব করতে পারি না। তাছাড়া ১৪ নং হলো শাস্তি প্রাপ্তদের সেল বা কনডেমনড সেল। সেখানে আমরা যাব কেন? তাই আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিই—আমরা অন্য সেলে যাব না।

মাত্র একজন খোলাখুলি এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করার কথা বলেছিলেন। তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় ডাঃ গুণেন সরকার, বাড়ী খুব সম্ভব দিনাজপুরে। যশোরের ফরওয়ার্ড ব্লক মার্ক্সিস্ট পার্টির সদস্য কমরেড হীরেন সেন বলেছিলেন, দেখ এ সিদ্ধান্তের পরিণতি অতি মারাত্মক হতে পারে—কিন্তু তখন কে শোনে কার কথা। পরবর্তী সময় নেতৃবৃন্দের মুখে শুনেছিলাম যে তাঁরা বড় জোর এর পরিণতিতে লাঠি চার্জ পর্যন্ত ভেবেছিলেন—এবং তাঁরা তার মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিলেন।

যাই হোক, যেদিন আমাদের জেলে যাবার কথা সেদিন সকাল থেকে আমরা নিজেদের মধ্যে কোন এক বিষয় আলোচনা বৈঠক করছি। কমরেড হানিফ আলোচনা পরিচালনা করছেন, বক্তৃতা করেছেন কমরেড মনসুর হাবিব। বেলা তখন নটার কাছাকাছি হবে—সভাপতি হানিফ তাই মনসুর হাবিবের বক্তৃতা সংক্ষেপ করতে বলছেন—কারণ তার কয়েক মিনিটের মধ্যে সুপার তার সাপ্তাহিক জেল পরিদর্শনে আসবেন। দেখতে দেখতে তিনি এসেও গেলেন। সঙ্গে বেশ কয়েক জন সিপাহী, দু জন ডেপুটি জেলার প্রায় ৬০।৬৫

জন মেট কয়েদী নিয়ে খাপরায় ঢুকে পড়লেন। আমরা আমাদের মুখপাত্র জনাব আবছুল হককে সামনে ঠেলে দিলাম কথা বলতে। সুপার বিল এগিয়ে এসে আমাদের তখনই ১৪ নং সেলে যেতে বলায় হক সাহেব আপত্তি জানাতেই সে বাহির থেকে দরজা বন্ধ করতে আদেশ দেয় এবং নিজে বিদ্যুৎবেগে ওয়ার্ডের বাইরে চলে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল দেয়। আমাদের কমরেডরা ইতিমধ্যেই গেটটি বন্ধ করে দেয়।

তারপর ১৫ মিনিট পর্যন্ত বাইরে সিপাহী আর আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। এ সময় সুপার ফায়ার বলে চিৎকার করে উঠতেই চকিতে চেয়ে দেখি প্রায় ৩০।৪০টি বন্দুকের নল খাপরার জানলার ফাঁকে তাক করা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি শুয়ে পড়ি, বালিশের তলায় মাথা গুঁজে দি। বন্দুকের শব্দে আমার কানের পর্দাই ছিড়ে যেতে চাইল। বালিশের বাইরের অংশ আমার কনুইতে এবং হাঁটুতে গুলি লাগল—মাথায় একটা স্পিল্‌নটার লাগল। ওই সময় এক মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ল মেঝের দিকে রক্তের ঢেউ খেলছে। যেন মনে হ'ল আমার পাশেই কমরেড হানিফের বাহুর মাংসটা ছিঁড়ে কোথায় ছুটে গেছে। যতদূর মনে পড়ে কমরেড আনোয়ারের মুখের একটা অংশ বুলেট লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হতে দেখেছি। ততক্ষণে আমি চৈতন্য হারিয়েছি।

ঘটনার বিবরণ বাড়াবনা, যখন হুঁশ হলো দেখলাম রক্তের মধ্যে ডুবে আছি। পরে আমাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওখানে প্রায় এক মাস চিকিৎসা চলে। পরে আবার আমাদের পূর্বকথিত ১৪ নং সেলেই নিয়ে যায়। সরকার তার জেদ পুরো করে। আমাদের সাত-সাতটি প্রাণ নিয়েও তাঁর আদেশ রক্ষা করতেই হবে।

যাই হোক, যারা মারা যায় সেই সাতটি রক্ত-তারকা হলো—কমরেড বিজন সেন, ইনি আন্দোলন থেকে ফিরে এখানের গণতান্ত্রিক

আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কমরেড হানিফ শেখ, ইনি দীর্ঘদিন কৃষক শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। কমরেড সুধীন ধর, ইনিও দীর্ঘদিন সৈয়দপুর শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন। কমরেড সুখেন ভট্টাচার্য, ময়মনসিংহ জেলার কোন এক কলেজের সুযোগ্য ছাত্র নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এরপরে কমরেড আনোয়ার, তিনি ছিলেন খুলনা জেলা স্কুলের ছাত্র, ম্যাট্রিক পাস করে রাজনীতিতে ঢুকেছিলেন। এছাড়া কমরেড দেলওয়ার, ইনি করতেন কুষ্টিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন। এছাড়া রয়েছেন কমরেড কম্পরাম সিং, দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনের অন্যতম বীর সৈনিক।

যা হোক আজ এদেশে বিপ্লবী আন্দোলনে যে প্রাণ দেওয়া নেওয়ার খেলা চলেছে, দেশকে মুক্ত করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, অকাতরে রক্ত ঢেলে দেওয়ার যে প্রতিযোগিতা চলেছে, এই সাত সাতটি বীরই তার পথপ্রদর্শক। এখানেই তাদের আত্মাহুতির বৈশিষ্ট্য।

২৪শে এপ্রিলের ঘটনা আমাদের কাছে দুটো দিক তুলে ধরে। একটা হলো চরম আত্মত্যাগে বিপ্লবীরা কোনদিনই ভয় পায় না। দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য অকুতোভয়ে এগিয়ে যায় বন্দুক বেয়নেটের সামনে। আর একটি হলো ফাসিস্ত সরকার বেশীদিন তার গণতান্ত্রিক মুখোস পরে থাকতে পারে না। গণশক্তিকে রোধ করার জন্য তাকে সশস্ত্র হামলা চালাতে হয় জনতার উপর, জনতার অগ্রবাহিনীর উপর। ২৪শে এপ্রিল ঘটেছিলও তাই।

দেশ ভাগের পর বাইরে যেমন তাকে রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে উলঙ্গভাবে উর্দুকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলতে হয়েছিল ঠিক ভিতরেও তেমনি গণ আন্দোলনের অগ্রবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য চালাতে হয়েছিল সশস্ত্র আক্রমণ।

২৪শে এপ্রিলের বীর শহিদদের প্রতি এবং ঐ সময়কার

নেতৃবৃন্দের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেও আমার জিজ্ঞাসা থেকে যায় যে ২০শে এপ্রিলের ঐ দুঃখজনক ঘটনা কি আমরা এড়াতে পারতাম না।

আমরা কি তখন বাইরের পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছিলাম? তখন ১৯৫০ সাল। কায়েদে আজমের সর্বপ্রধান উত্তরাধিকারী লিয়াকত আলির তখন দেশবাসীর উপর অপ্রতিহত প্রভাব। '৪৮ সনে কাশ্মীর সমস্যার কথা লোক তখনও ভোলেনি। মোজাহের সমস্যা মূলতঃ ভারতীয়দের সৃষ্টি বলে মনে ক'রে তখন দেশবাসী চরমভাবে ভারত বিদ্বেষী, দেশের প্রকৃত মুক্তিকামী বিপ্লবীদের সম্পর্কে দেশবাসীর ধারণা তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা তাদের পঞ্চম বাহিনী বলে মনে করত।

হায়দ্রাবাদ, জুনাগড়, কাশ্মীর প্রশ্নে সমগ্র দেশ তৎকালীন শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ছিল সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত। তখন সমস্ত দেশে সাম্প্রদায়িকতা উগ্ররূপে বিরাজমান।

বাইরের এরূপ পরিস্থিতি থাকাকালীন ভিতরে আমাদের দাবি দাওয়া আদায় সম্বন্ধে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল তা আজ ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

তা ছাড়া জেলখানা একটা বিশেষ এলাকা। সেখানের প্রতিটি পদক্ষেপ সেখানের বাস্তব অবস্থা বিচার করেই নিতে হবে। মাও সে তুঙ-এর কথা উল্লেখ করে বলতে হয়, আমাদের জীবন দিতে হবে, সেজন্য আমরা যতটা পারি যেন অনাবশ্যক জীবন ক্ষয় এড়িয়ে চলি।

এ কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে জেলখানায় রাজবন্দীদের মর্যাদা আদায়ের সংগ্রামের একটা বৃহত্তম সময় আমরা সম্পূর্ণ সঠিক ছিলাম। অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিকই ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কয়েদীদের দাবি আদায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রস্তুতি ছিল মূলত ভুল।

আমার মনে হয় ২৪শে এপ্রিলের জন্য শোক না করে বা সেই দিন শুধু সুর্ধশপথের তীব্রতা প্রকাশ না করে ঐ দিনটিকে বিরাট জিজ্ঞাসার দিনে পরিণত করা দরকার।

২৪শে এপ্রিলকে যেমন আমরা একটা মহৎ আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জ্বল দিন বলে স্মরণ করব, তেমনি তাকে একটা বিরাট জিজ্ঞাসার দিনে পরিণত করব। মনে রাখতে হবে ২৪শে এপ্রিলকে আমাদের কঠোর সমালোচনা, আত্মসমালোচনার দিনে পরিণত করতে হবে।

ফ্যাসিস্তদের তীক্ষ্ণ বেয়নেটের, সঙ্গীনের সামনে আমাদের বীর সন্তানগণ যে ভাবে লড়াই করে চরম বিপ্লবী নিষ্ঠা এবং অকল্পনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে গেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিনই অম্লান থেকে বিপ্লবীদের প্রাণে অপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। আবার অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষয়িষ্ণু যুগে সর্বোচ্চ মুনাফাখোররা কী বীভৎস উন্মত্ততায় দেশবাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তারও নজির এখানে রয়েছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২।

"অস্থিরভাবে নিজের ঘরে কার্পেটের উপর উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করছেন লিয়াকত আলী। একটু আগে নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে কথা হয়েছে টেলিফোনে। যে করেই হোক কালকের হরতালকে পণ্ড করতে হবে। কিছুতেই আন্দোলন করতে দেওয়া হবে না। ফোন তুলে ইংরাজীতে চীফ সেক্রেটারীকে বললেন ১৪৪ ধারা জারী করুন। আর্মি তৈরী থাকতে বলুন। পুলিশী শক্তি জোরদার করুন।

চীফ সেক্রেটারী দু মুহূর্ত কি ভাবলেন। তারপর ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দিলেন। দ্রুত একটার পর একটা ফোন করে চললেন তিনি। ডাকলেন পুলিশ কমিশনারকে। ক্যামেরা মীটিং-এ বসলেন সরকারী প্রশাসন বিভাগের চাঁইরা।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঢাকা বেতার থেকে ঘোষিত হল ১৪৪ ধারা।

দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেল। আটটার মধ্যে ঢাকা শহরে গভীর নীরবতা নেমে এল।"

এদিকে ফোনে যোগাযোগ করে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সভা বসল। এ অবস্থায় কি করা উচিত? কর্তব্য নির্ধারণ নিয়ে সদস্যদের মধ্যে তীব্র মত-পার্থক্য দেখা দিল। রাজনৈতিক দলের নেতারা জানালেন, এ অবস্থায় আমাদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা উচিত নয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে গেলে ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিতে পারে। লীগ সরকার সেই অজুহাতে আগামী সাধারণ নির্বাচন বন্ধ করে দিতে পারেন।

নির্বাচন বন্ধ হবার ভয়ে ভাষা-আন্দোলন স্থগিত থাকবে? সাড়ে ৪ কোটি মানুষের প্রাণের দাবি থেকে গদির মোহ বড় হলো। অবাক হলেন ওলি আহাদ? ওলি আহাদ মানলেন না ১৪৪ ধারা।

তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, নির্বাচন পণ্ড এবং মামুলি ১৪৪ ধারার ভয়েই যদি পিছিয়ে পড়ি আমাদের আন্দোলন থেকে তাহলে কোনদিনই আমাদের দাবি আদায় হবে না। লীগ সরকারের বেয়নেট আর টিয়ার গ্যাসকে ভয় করলে আন্দোলনে নামা বৃথা। আমরা তো জানি লীগ সরকার আমাদের ওপর সব রকম দমন নীতিই চালাবে। বিনা সংঘর্ষে আমাদের দাবি তারা মেনে নেবে যদি কেউ মনে করে থাকি তাহলে মূর্খের স্বর্গে বাস করছি।

১৪৪ ধারা অমান্য করতেই হবে। তা অমান্য না করার অর্থ হবে, সরকারী দমন-নীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করা এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

এমন সময় সলিমুল্লাহ হলে মিটিং শেষ করে এসে দুইজন ছাত্র প্রতিনিধি জানাল, কাল তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারী দমন-নীতির কাছে কিছুতেই তারা মাথা নোয়াবে না।

কিন্তু সর্বদলীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা অমান্য না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং আরও বলা হলো এই সিদ্ধান্ত অমান্য করে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে এই কর্মপরিষদ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল বলে ধরে নেওয়া হবে।

ওদিকে ছাত্ররা তাদের সিদ্ধান্তে অটল। গভীর রাত পর্যন্ত হলগুলিতে আলোচনা চলল। ছাত্ররা রক্ত দিতেও প্রস্তুত। কখন ভোর হয় এরই প্রতীক্ষা তারা করছে।

বেশীর ভাগ দোকান পাট বন্ধ। রাস্তায় যানবাহন কম। যে সব দোকান খুলেছে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধে তা বন্ধ করে দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ভ্যানের পর ভ্যান পুলিস জমায়েত হতে লাগল। কোমরে টিয়ার গ্যাসের বাক্স। কারো হাতে লাঠি, কারো বা বেয়নেট লাগানো রাইফেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে

ব্যারিকেড করে দাঁড়িয়েছে তারা। বেলা দশটা থেকে জমায়েত হতে লাগল ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে।

বারোটায় সভা শুরু হলো গাজিউলের সভাপতিত্বে। বেলতলায় দাঁড়িয়ে ছাত্র নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ গিসগিস করছে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীতে। মহাসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্‌গ্রীব সবাই।

বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ভাইসব, ফ্যাসিস্ট লীগ সরকার আমাদের দাবি বানচাল করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেছে। কিন্তু কাপুরুষের মতো আমরা পিছিয়ে যেতে পারি না। মায়ের অপমান মুখ বুজে সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়। মরণে আমাদের ভয় কী? রক্ত ছাড়া কবে কোন্ আন্দোলন হয়েছে। বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক আমাদের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে। আম্মা সজল চোখে তার অপমানের প্রতিকার করতে ডাক দিয়েছে। বলুন, আপনারা সে ডাকে সাড়া দিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবেন, না ঘরে ফিরে যাবেন?

সহস্র কণ্ঠে চীৎকার ওঠে: আমরা ১৪৪ ধারা মানব না, মানব না।

এমন সময় সর্বদলীয় কর্মপরিষদ থেকে শামসুল হক এলেন। ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন কেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা উচিত নয়।

কাপুরুষের কথা শুনতে চাই না। বসে পড়ুন। হাজার কণ্ঠের চিৎকার ওঠে। কেউ কেউ টিপ্পনী কাটে: ঘরে গিয়ে চুড়ি পরে বসে থাকুন। শামসুল হক অগত্যা বসে পড়লেন।

এই সময় ছাত্র নেতা আবদুল সাত্তার একটা প্রস্তাব দিল। বলল, দশজন দশজন করে বেরুলে একদিকে আইনও অমান্য করা হবে, অন্যদিকে ব্যাপক গোলযোগ এড়ানো যাবে।

এ প্রস্তাব মেনে নিতে আপত্তি নেই। সকলেই এতে সায় দিল।

দশজন দশজন করে এক একটা দল তৈরী হলো। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। নাজিম-নুরুল নিপাত যাক। ১৪৪ ধারা মানি না—মানব না। চলো চলো অ্যাসেম্বলি চলো। ধ্বনি দিতে দিতে প্রথম দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

পুলিশ বাহিনী সচকিত হয়ে উঠল। হুইসল বাজে। মাইকে জনৈক পুলিশ অফিসারের কণ্ঠ ভেসে এলো : আপনারা বেরুবেন না। বেরুলেই গ্রেপ্তার করব।

"রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে গেল প্রথম দশজনী মিছিলটি। গেটের বাইরে আসতেই এক ঝাঁক পুলিশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের উপর। টেনে হিঁচড়ে তুলল ট্রাকে। ট্রাকের উপর থেকে ওরা আওয়াজ দিতে লাগল : "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

এবার দ্বিতীয় দশজনী দলটি বেরুলো। তারাও গ্রেপ্তার হল। আবার দশজন বেরুলো। তারাও গ্রেপ্তার হল। এর কিছু বাদে মেয়েদের একটা দশজনী দল বেরুল। মুখে তাদের শ্লোগান : "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

এবারে শাহাবউদ্দিনের নেতৃত্বে আরেকটা দশজনী মিছিল এগিয়ে গেল। বিনা প্ররোচনায় একজন পুলিশ অফিসার একটা ছেলেকে এক লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। ছেলেটা তাড়াতাড়ি মাটি ছেড়ে উঠে পুলিশ অফিসারের মুখে থুথু দিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক পুলিশ ছেলেটির উপর নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। লাঠি পড়তে লাগল এলোপাথাড়ি। ছাত্ররা ক্রোধে ফেটে পড়ল। ঝাঁকে ঝাঁকে ঢিল ছুটে যায় ওদের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে টিয়ার-গ্যাসের একটা শেল এসে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও পুলিশ আক্রমণ চালালো। ছাত্রদের

উপর পুলিশের আক্রমণ দেখে জনতাও ক্ষেপে গেল। তারাও পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। পুলিশ তাড়া করল। অবশেষে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ চলল।

পুলিশ মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসেও টিয়ারগ্যাস ছুড়েছে। রোগীদের কথাও ওরা একবার ভাবেনি।

পুলিশ মেডিকেল কলেজে ঢুকতে চেষ্টা করছে। মরিয়া হয়ে সকল ছাত্র বাধা দিচ্ছে। পুলিশ সমানে টিয়ারগ্যাস ছুড়ে চলেছে।

মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের নীচে আবার ছাত্ররা জমায়েত হতে শুরু করেছে। তিনটে বাজে প্রায়। অধিবেশন বসার সময় এসে গেল। কয়েকজন সরকারী দলের এম এন এ-কে নিয়ে একটা জীপ ছুটে গেল। ছাত্ররা ধ্বনি দিতে লাগল: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

ছাত্ররা এবার মেডিকেল কলেজের দিকে এগিয়ে গেল। মুখে তাদের স্লোগান: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—চলো চলো অ্যাসেম্বলি চলো।

একজন পুলিশ অফিসার চীৎকার করে বলে উঠল, দু'জন প্রতিনিধি গিয়ে আপনাদের বক্তব্য অ্যাসেম্বলিতে বলে আসুন।

পুলিশ অফিসারের কথায় ছাত্ররা থমকে দাঁড়াল। এই সময় আতোয়ার চীৎকার করে বলে উঠল: ভাইসব, আন্দোলন বানচাল করার এটা একটা চাল। ওরা আমাদের নিষ্ক্রিয় করে রেখে নিজেরা তৈরী হয়ে নিতে চায়। প্রতারকদের কথায় ভুলবেন না। আওয়াজ তুলুন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

অদূরে সঙ্গে সঙ্গে টিয়ারগ্যাসের শেল ফাটল। কিন্তু তবুও তারা নির্ভীক। তাদের কণ্ঠে সেই স্লোগান, "পুলিশি জুলুম চলবে না। —রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে আবার টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটল এবং তার সঙ্গে

চলল গুলি। এমন সময় ছাত্রদের কে যেন বলল, বেইমানরা গুলি চালাচ্ছে, সাবধান, সাবধান। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররাও পাল্টা পুলিশকে আক্রমণ করল। ছাত্রদের একমাত্র অস্ত্র ইঁটের খোয়া।

গুলি চালাবার আগে 'লাল ফ্ল্যাগ' দেখানোর কথা। কিন্তু পুলিশ তা দেখালো না। তারা ছাত্রদের মারতে চায়।

পুলিশের গুলিতে শহিদ হল জব্বার, রফিক ও আরো অনেকে। পুলিশ ক্রমাগত টিয়ারগ্যাসের সেল ফাটানোর জন্য আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। এর কিছু বাদে আবার গুলি চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর এল আতোয়ারের পায়ে গুলি লেগেছে এবং বহু ছাত্র আহত হয়েছে।

কিন্তু তবুও তারা ভীত নয়। তাদের সকলের কণ্ঠে ঐ একই আওয়াজ : "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। জালিম মুসলিম লীগ সরকার নিপাত যাক।"

পরিষদ কক্ষেও পৌঁছায় সে খবর। মনোরঞ্জন ধর এবং গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম পরিষদ কক্ষে ঝড়ের বেগে ঢুকে খবর দিলেন, পুলিশের গুলিতে ছাত্র মারা গেছে। বিরোধী দলের সদস্যরা ফেটে পড়ে উত্তেজনা আর ক্রোধে। এই হত্যাকাণ্ডের জবাব চান নুরুল আমিনের কাছে। মুলতুবি প্রস্তাবের দাবি ওঠে।

নুরুল আমিন তো প্রথমে স্বীকার করতে চাইলেন না যে পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়েছে। তিনি বললেন, 'ইটস এ ফ্যানটাসটিক স্টোরি।' বিরোধীদলের চাপে কথাটা স্বীকার করে নিলেন নির্লজ্জের মত আত্মপক্ষ সমর্থন করে। (তিনি বললেন, 'উচ্ছৃঙ্খলতা দমানোর জন্য পুলিশ গুলি চালিয়েছে। এর পিছনে কম্যুনিস্টদের উসকানি আছে। আমরা তাদের নির্মূল করব।')

টেবিল চাপড়ে হৈ-হৈ করে উঠল বিরোধীদলের সদস্যরা। সরকার পক্ষের অনেক সদস্যও নুরুল আমিনের এই নির্লজ্জ উক্তির নিন্দা

করলেন। নিন্দা করলেন পুলিশের গুলি চালনায়। ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের এবং মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের নির্লজ্জ উক্তির প্রতিবাদে মুসলিম লীগ পার্টি থেকে সেই মুহূর্তে পদত্যাগ করলেন তাঁরা। পরিষদ কক্ষে দাঁড়িয়ে মৌলানা তর্কবাগীশ বললেন, আমাদের ছাত্ররা যখন শহিদত্ব বরণ করছেন, আমরা তখন আরামে পাখার হাওয়া খেতে থাকব—এ বরদাস্ত করা যায় না। চলুন, মেডিকেল কলেজে চলুন। এরপর তর্কবাগীশ এবং শামসুদ্দীন সাহেব খয়রাত হোসেনের সঙ্গে পরিষদ কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। শামসুদ্দীন সাহেব পরে পরিষদ কক্ষের সদস্যপদেও ইস্তফা দেন।

শহিদদের শেষ দেখা দেখবার জন্য হাজার হাজার মানুষ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিতরে, বারান্দায়, বাইরে রয়েছে। কয়েকজন রক্তমাখা ধূলি তুলে কপালে ছোঁয়াচ্ছে।

কাতারে কাতারে লোক আসছে বরকত, রফিক আর জব্বারকে দেখবার জন্য। মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ভবনে তোলা হয়েছে শহিদদের রক্তে ছোপানো পতাকা। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে শহিদদের নাম, ঠিকানা। মাইকে ঘোষণা করা হল, "পুলিশ আমাদের উপর গুলি চালিয়েছে। নৃশংসভাবে হত্যা করেছে রফিক, জব্বার, আর বরকতকে। লাঠি আর বেয়নেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে শত শত ছাত্রছাত্রীকে। আমাদের অপরাধ আমরা বলতে গিয়াছিলাম আমাদের মুখের ভাষা, আমাদের হৃদয়ের ভাষা কেড়ে নিতে দেব না। কতো রক্ত ওরা নেবে? বাংলাদেশের ছেলেমেয়ে রক্ত দিতে ভয় পায় না। আমাদের আন্দোলন চলবে। লিয়াকত-নাজিমকে আমরা বাংলা ছাড়া করবই।"

২১শের রক্তে স্নান করে ২২শে সূর্য উঠল। ভোরের নীরবতা ভঙ্গ করে মাইকে ছড়িয়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথের গান।

"চলো যাই চলো যাই চলো যাই
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে ॥"

মেডিকেল কলেজ ছাত্রবাসের মাইকে একজন ছাত্র বলে চলেছেন,

"জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কারো শেখীরা
শিশুহত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা
দেশে সোনার ছেলে খুন করে রোখে মানুষের দাবি
দিন লগনের ক্রান্তি লগনে তবু তোরা পার পাবি ?
না, না, না, খুন-রাঙা ইতিহাসে শেস রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেবরুয়ারী, একুশে ফেবরুয়ারী।
... ...
ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণাপদাঘাত এই বাংলার বুকে।
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্নবস্ত্র শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেবরুয়ারী, একুশে ফেবরুয়ারী
... ...
তুমি আজ জাগো, তুমি আজ জাগো একুশে ফেবরুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী।
আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালাবো ফেবরুয়ারী,
একুশে ফেবরুয়ারী, একুশে ফেবরুয়ারী।"

গায়েবী জানাজার সময় হল, হঠাৎ শোনা গেল লীগ সরকার শহিদদের লাস দেবে না। জনতা ক্ষুব্ধ। ক্রুদ্ধ গর্জন উঠল জনসমুদ্রে। শহিদদের লাস দাফনের সুযোগ পাবে না দেশবাসী এ হতেই পারে না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লাস পাওয়া গেল না। তখন লাস ছাড়াই গায়েবী জানাজা হবে। ইমাম সাহেব দু-হাত তুলে মোনাজাত করলেন, "আল্লাহ, জালিমের গুলিতে কচি ছেলেরা মারা গেছে, শিশুর খুনে রাঙা হয়েছে পথের ধুলো আর ঘাস। আল্লাহ, তুমি তো জানো ওরা নিরপরাধ। জালিমরা খালি করে দিল কতো মায়ের বুক, তোমার রোষের আগুনে নিশ্চিহ্ন কর জালিমদের দুনিয়ার বুক থেকে।" তারপর উপস্থিত জনতার কাছে ভাষণ দেবার জন্য উঠলেন ওলি আহাদ। তিনি বললেন, "বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করে, বাংলার সাড়ে চার কোটি মানুষকে পঙ্গু করে রাখার ষড়যন্ত্র চলছে অনেক দিন ধরে। সে চক্রান্ত ব্যর্থ করবই। রফিক, জব্বার, বরকতের রক্ত তুলে নিয়ে আপনারা শপথ নিন, আমরা সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ করবই।"

তারপর মিছিল বেরুল পথে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে লাখো জনতার মিছিল। বেরুল মৌন মিছিল। নবাবপুর রোডে গিয়ে পড়েছে মিছিলের প্রথম অংশ আর শেষ অংশ তখনও হাইকোর্টের কাছে। পুলিশ হাতে বন্দুক, লাঠি, বেয়নেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন—চার্জ। পরমুহূর্তে মিছিলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশ বাহিনী। চলল লাঠি, গুলি। পুলিশের লাঠিতে আহত হলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। নিহত হলেন ল-ক্লাশের ছাত্র। আরো কতো জন নিহত হল সে কথা জানা যায় না, কারণ পুলিশ লাসগুলি সরিয়ে ফেলেছিল। মিছিলের জনতা আছড়ে পড়ল অ্যাসেম্বলির সামনে। পরিষদের তখন অধিবেশন চলছে। বিরোধী দল থেকে বাংলা

ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কোণঠাসা নুরুল আমিন সেই প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের সামনে ছাত্ররা নিজ হাতে গড়ে তুলল শহিদ বেদী। শহিদ বেদীর আবরণ উন্মোচন করতে এলেন সফীকুরের পিতা। শহীদ পুত্রের ও তাঁর সতীর্থদের শহিদ বেদীর আবরণ উন্মোচন করে সফীকুরের পিতা বললেন, "আজ আমার সফীক নেই। সফীক, বরকত, রফীক, জব্বার সকলের আত্মা সেইদিন তৃপ্ত হবে যেদিন বাংলা ভাষা পাবে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। ঐ দেখ শহিদদের চোখ আকুল প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে তোমাদের দিকে। বাংলার চার কোটি মানুষের দিকে। হে খোদা, এই সব বুকের রক্ত যারা ঝরিয়েছে তাদের তুমি ক্ষমা করো না।"

শহীদ স্মৃতি তর্পণ চলছে। এই সময় পুলিশ ঢুকে পড়ল মেডিকেল কলেজে। ছাত্রাবাস ভেঙ্গে তছনছ করল।

আর একটা দিন কেটে গেল। হরতাল চলছে। রাত্রে পুলিশ গ্রেপ্তার করল আবুল হাসেন, খয়রাত হোসেন, মৌলানা তর্কবাগীশ, অধ্যাপক মুজাফৎ আমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনির চৌধুরী, অধ্যাপক পুলিন দে, সতীন সেন প্রমুখকে। মৌলানা ভাসানীকে তাঁর গ্রামের বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করে আনা হলো।

রাইফেলের কুঁদো আর পুলিশের বুটের আঘাতে ভেঙ্গে ফেলা হল শহিদ মিনার। আলাউদ্দীন আল-আজাদ লিখলেন,

"ইটের মিনার ভেঙ্গেছে ভাঙুক। একটি মিনার গড়েছি
আমরা চার কোটি কারিগর
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।
পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়

দ্বীপ হয়ে ভাসে যাদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহিদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে
তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্র শিখরে সূর্যের মতো জ্বলে
শুধু এক শপথের ভাস্কর।"

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন জনজীবনে যে তুফান তুলল সেই তুফান ধসিয়ে দিল মুসলিম লীগের স্বপ্নসৌধ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩০৯টি আসনের মধ্যে তারা পেল মাত্র ৯টি আসন। বাংলার প্রবল প্রতাপান্বিত নুরুল আমিন নিজের জেলায় নিজের এলাকায় একজন ছাত্র খালেক নাওয়াজের কাছে পরাজিত হলেন। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এমন নির্বাচনী প্রচারের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে শুধু ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সর্বশ্রেণীর জনতাই এই প্রচারে অংশ গ্রহণ করে নি, সরকারী কেরানী, পদস্থ বাঙালী কর্মচারী এবং চাপরাসীরা পর্যন্ত যুক্তফ্রন্টের প্রচারে পথে বেরিয়ে পড়েন। সে এক অসাধারণ জনজাগরণ, এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা। ঢাকার পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় পাক প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলির পক্ষে ভাষণ দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং সভা ভেঙ্গে যায়। নির্বিচারে পুলিশের লাঠি চলতে থাকে। নির্বাচনের আগে প্রায় ১৪০০০ যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেব তাঁর নিজের কেন্দ্রে একটি পঁচিশ বছরের যুবকের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং

বহু মুসলিম লীগ নেতার জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্ববঙ্গের জাতীয় জীবনে হয়ে উঠল এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা।

যুক্তফ্রন্টের এই ঐতিহাসিক বিজয়ের পিছনে ছিল তাদের একুশ দফা প্রোগ্রাম যার মর্মকথা হোল বাংলাভাষার মর্যাদা ও অধিকার সহ পূর্ব বাংলার বাঙালীদের পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। একুশ দফা দাবির মধ্যে একটি ছিল শহিদ মিনার নির্মাণ করা এবং যে বর্ধমান হাউস থেকে বাংলাভাষা আন্দোলনকারীদের উপর নুরুল আমিন গুলি ছোড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই বাড়ীটিকে 'বাংলা অ্যাকাডেমিতে' পরিণত করা। একুশ দফাতে আরও দাবি জানান হয়েছিল যে সশস্ত্র বাহিনী, মুদ্রা ও পররাষ্ট্র ছাড়া আর সব বিষয় পূর্ব বাংলা সরকারের হাতে থাকবে। এছাড়া পাক গঠনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে দাবি করা হয় যে পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ ও অখণ্ড অটোনমি দিতে হবে। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে অধিকার থাকবে পূর্ব বঙ্গের। দেশরক্ষার বিষয়েও পূর্ব বঙ্গের আঞ্চলিক বাহিনী গঠন, এই প্রদেশে অর্ডিনান্স কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পূর্ববঙ্গে নৌ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপনের দাবি জানান হয় নির্বাচনী ইস্তাহারে। যুক্তফ্রন্টের প্রচারের মূল ভিত্তি ছিল: "পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি কলোনীতে পরিণত করা চলবে না।"

'৫৪ সালের নির্বাচনে জনসমর্থন লাভের মূলে ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদারক্ষা ও পূর্ববঙ্গে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবি। পূর্ববঙ্গের উপরে পাশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের নামে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান—এই ধ্বনি মূর্ত হয়েছিল নির্বাচনী রায়ের মাধ্যমে। পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে পূর্ববঙ্গে ব্যাপক গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই সময়ে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে তার

বিবরণ দিয়ে 'কেন অটোনমি চাই' নামে একটি পুস্তিকা আওয়ামী লীগ থেকে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় বলা হয়: পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মৌলিক প্যাটার্নের পটভূমিতে ভূগোলের দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গের অটোনমির দাবিকে স্বীকার না করে উপায় নেই। পাকিস্তান একটি অখণ্ড ভৌগোলিক অঞ্চল নয়। এই রাষ্ট্রের দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল বিমান পথে ১,০০০ এবং জলপথে ৩,০০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ক্যানাডা ও বৃটেনের মধ্যে যে ব্যবধান, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান তার চেয়েও বেশী।

বাস্তব ক্ষেত্রে করাচী সরকারের কাছে পূর্ববঙ্গের কণ্ঠস্বর পৌঁছায় না এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অঞ্চলের বক্তব্যেরও কোন গুরুত্ব নেই। ১,০০০ মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সিদ্ধান্তে পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে তাই অবিচার হতে বাধ্য। পূর্ববঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং তার ফলে দুই ভূখণ্ডের জনসাধারণের পক্ষে পরস্পরকে জানা এবং পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

অর্থনীতির দিক দিয়েও পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অতি যুক্তিসঙ্গত। কারণ, পরস্পরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের অর্থনীতির ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে পৃথক। যোগাযোগের অভাব, উৎপাদন ব্যবহারে ভিন্ন প্রকৃতি এবং মূল্যমানের বিরাট পার্থক্যের ফলে এক অঞ্চলের পারম্পর্য রক্ষা করাও সম্ভব নয়।

পাকিস্তানের ফেডারেল রাজধানী ও পূর্ব বঙ্গের মধ্যে ১৪০০ মাইলের ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত স্থলপথে এই দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। বিমান বা স্থলপথে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য। খাদ্য, শস্য এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ববঙ্গের তুলনায় অনেক কম। প্রায় সমস্ত জিনিসই প্রথমে করাচীতে আমদানী করা হয় এবং তার পরে রপ্তানী করা হয় পূর্ববঙ্গে।

তার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানীকারীরা যে শুধু অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করে তাই নয়—পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাল রপ্তানী করার জন্যও অতিরিক্ত দাম ধার্য করে। সেজন্য বৈদেশিক জিনিস-পত্রের দামই যে পূর্ববঙ্গের চাহিদার তুলনায় অনেক কম পাওয়া যায় বলে পূর্ববঙ্গের বাজারে অত্যন্ত চড়া দামেও বিক্রি হয়। রাজনীতির দিক দিয়েও পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অনস্বীকার্য। বর্তমান যুগে সব দেশেই সরকারী কাজকর্ম জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে পরিচালিত করা হয়।

৩০০০ মাইল দূর থেকে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সামান্য যোগাযোগ রাখাও সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ করে তাই রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে এই রাষ্ট্রে সমস্ত কাজকর্ম 'ইউনিটারী' বা ঐকিক ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু তার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে কতখানি ঐক্যস্থাপন করা হয়েছে? জোর জুলুম করে অথবা পিস্তল দেখিয়ে কোন দেশে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব নয়।

পূর্ববঙ্গের ইতিহাস এক শোষণের ইতিহাস। এই অঞ্চলের জনসাধারণের আয় থেকে এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কাজে। এই অর্থ থেকে পূর্ববঙ্গের ভাগ্যে সামান্য অংশও জোটেনি। পাকিস্তান গঠনের পরে এই রাষ্ট্রের সমস্ত সামরিক সংগঠন স্থাপিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। মিলিটারী কলেজ, প্রি-ক্যাডেট স্কুল এবং অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরীর সবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে ও করাচীতে। এরূপ কাজে অথবা এরূপ সংগঠন তৈরীর ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ কোন অংশই পায় নি। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার ৬০-৭০ কোটি টাকা পূর্ববঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে কিন্তু তার প্রায় সবই ব্যয়

করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এরূপ এবং অন্যান্য শোষণের ফলে পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেণীর জনজীবন আজ এক শোচনীয় দারিদ্র্যের সম্মুখীন। পূর্ব ও পশ্চিম পাক ভূখণ্ড দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভূখণ্ড হওয়ায় এবং একটি অর্থনৈতিক সংগঠন বা অঞ্চল না হওয়ায় পূর্ববঙ্গের পুঁজি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়ে এই পূর্ব ভূখণ্ডের অর্থনীতিকে আজ এক চরম দুর্বিপাকের দিকে ঠেলে দিয়েছে। পাকিস্তানের দুই ভূখণ্ডের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য ও আমদানির ক্ষেত্রে এমন পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে যে তার ফলে পূর্ববঙ্গের জনজীবন গুরুতর ভাবে বিপন্ন হচ্ছে। পূর্ব বাংলা বহুবার এই অভিযোগ করেছে যে ব্যবসা বাণিজ্যের লাইসেন্স এবং বৈদেশিক আমদানীর সুযোগ পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের এমন পক্ষপাতিত্বের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে যে তার ফলে আমদানি প্রায় অধিকাংশই যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে। এরূপ পক্ষপাতিত্বের জন্য পূর্ববঙ্গের বাজারে জিনিসপত্র শুধু দুষ্প্রাপ্য নয় অগ্নিমূল্যও বটে। বর্তমানে পূর্ববঙ্গকে সমস্ত বৈদেশিক জিনিসপত্র আমদানি করতে হয় করাচী থেকে এবং তার ফলে প্রত্যেক জিনিসের জন্য পূর্ববঙ্গকে ৫০ শতাংশ বেশী দাম দিতে হয়। এই ভাবেও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের পুঁজি নিয়মিত ভাবে শোষণ করে নিচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মে কি ভাবে পূর্ববঙ্গকে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের কুক্ষিগত—কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কর্মচারীদের আঞ্চলিক বন্টনের তথ্যে তা অতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১। কেন্দ্রীয় সরকারের সিনিয়র গেজেটেড পোস্ট

ডিপার্টমেন্ট	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ববঙ্গ
কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট	৬৯২	৪২
শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	১৩২	৩

ডিপার্টমেন্ট	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ববঙ্গ
রেডিও	৯৮	১৪
সাপ্লাই ও ডেভেলপমেন্ট	১৬৪	১৫
রেলওয়ে	১৫৮	১৯
পোস্ট ও টেলিগ্রাফ	১৭৯	৫০
কৃষি অর্থনীতি কর্পোরেশন	৩৮	১০
সার্ভে	৬৯	১
বিমান বাহিনী	১,০১৫	৭৫

শিক্ষাক্ষেত্রে মেডিকেল সংগঠনেও পূর্ববঙ্গের অবস্থা একই রকম শোচনীয়। যথা :—

বিষয়	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ববঙ্গ
নতুন কলেজ	১	০
মেডিকেল কলেজ	৬	১
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৫	১
ইউনিভার্সিটি	৯	২
কলেজ	৭৬	৫৬
প্রাইমারী স্কুল	৬,২৯৬	১,১১৭
ডাক্তার	৮,৫০০	৩,৩৯৩
মেটারনিটি হাসপাতাল	১১৮	২১

"মুসলিম লীগ বহুদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে থাকে। অবশেষে তার প্রতিফল এল হিন্দুদের কাছ থেকে নয়, মুসলমানদের কাছ থেকে—যারা ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের উপর চরম আঘাত হানল। মুসলমানরা পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলিম লীগকে নিশ্চিহ্ন করে দিল বলা যায়—যেহেতু হিন্দুরা শুধু তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্যই ভোটদানের অধিকারী ছিল এবং মুসলমানরা

মুসলমানদের জন্য। পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের এই ধ্বস পশ্চিম পাকিস্তান এবং কেন্দ্রের মুসলিম লীগের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলল। এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় কর্তাদের সর্বপ্রকার হুমকি ও শাসানিই বাঙালী মুসলমানদের আত্মিক শক্তিকে বিনষ্ট করতে পারল না।

দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ আইনসভার আর নির্বাচন হয়নি। এই সময়ের আইনসভার সদস্যরা প্রকৃতপক্ষে দেশভাগের আগে নির্বাচিত। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় প্রথম আইনসভার অধিবেশনের পর থেকে এর কার্যকাল পাঁচবছর বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই মেয়াদ সংসদ কর্তৃক আরও একবছর বাড়ানো হয়েছিল। শাসক মুসলিম লীগ জানত নির্বাচন হলে কী হবে। এই বিষয়ে তারা প্রথম সতর্ক হয় টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে সরকার পক্ষীয় নির্বাচনপ্রার্থীর বিরুদ্ধে মৌলানা ভাসানীর বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভের ফলে।

মুসলিম লীগ সরকার ২৫টি উপনির্বাচন স্থগিত রাখল। সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগেই ১৭১ সদস্য বিশিষ্ট আইন সভার ৩৪টি আসন শূন্য ছিল।

তবে কোন্ সাহসে মুসলিম লীগ সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হল? এর কয়েকটা কারণ ছিল। তাদের হাতে ছিল শাসনযন্ত্র, প্রেস, অফুরন্ত ধনভাণ্ডার। ধনী, শিল্পপতি, জমিদার এবং ব্যবসাদাররা ছিল তাদের পক্ষে। আর সাধারণের মধ্যে তখনও পর্যন্ত যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল সেটাও তাদের একটা বড় পুঁজি। শক্তিশালী বিদেশী সাহায্যও ছিল তাদের পক্ষে। শাসক হিসাবে তারা শত শত কম্যুনিস্ট ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীকে জেলে রেখে দিয়েছিল। শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিষ্ঠান সমূহকে তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দিয়েছিল।

Dawn, Morning News, Azad, Sangbad প্রভৃতি পত্রিকার সহায়তায় তারা জোর প্রচার করতে থাকে যে যারা লীগের

বিরুদ্ধে ভোট দেবে তাদের দেশের শত্রুপক্ষের সহায়ক বলে গণ্য করা হবে। শাসকদলের জিগির হল পাকিস্তান বিপন্ন। কাশ্মীর প্রশ্নটি তুলে ধরা হল। ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ 'পূর্ববঙ্গকে ভারতীয় ইউনিয়নে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার' বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরার সম্বন্ধে সাবধান করে দিলেন। মিঃ নুরুল আমিন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বললেন, "মুসলিম লীগ যদি ক্ষমতায় ফিরে না আসে তবে সেটা হবে পাকিস্তান ও মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক।" নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে মিস ফতিমা জিন্নাও পাকিস্তানের অখণ্ডতা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দেন।

কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সর্বপ্রকার নির্বাচনী প্রচারের বিরুদ্ধেই জনমত মুসলিম লীগের বিপক্ষে গঠিত হতে থাকে। প্রত্যহ রাস্তায় ট্রাফিক জাম করে একাধিক বিরাট বিরাট মিছিল বের হতে থাকে, যাদের ধ্বনি ছিল, "হক ভাসানী জিন্দাবাদ"—"শহিদ ভাসানী জিন্দাবাদ।" ইতিমধ্যে সোহরাবর্দী ভারত থেকে ফিরে এসে পাকিস্তান রাজনীতিতে এক বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা খর্ব করার কাজের দ্বারা। ১৯৫৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর রংপুরের এক সভায় সোহরাবর্দী সাহেব বলেন, "মুসলিম লীগ যদি জনপ্রিয়তা হারিয়ে থাকে তবে তার কারণ এই যে সে যা হতে চেয়েছিল তা হতে পারেনি এবং এখন সে শুধু মুষ্টিমেয় লোকের ভোগের জন্য স্বাধীনতার ফল।"

এইভাবে মুসলিম লীগের মধ্যে ফাটল শুরু হয়। মিঃ নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে সরানোর পর তিনি ভগ্নমনোরথ হয়ে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ডন পত্রিকায় ১৯৫৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারী সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয় মুসলিম লীগকে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতার প্রতীক বলে।

পূর্ববঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের দিন স্থির হওয়ার পর ঐ প্রদেশের নেতারা মুসলিম লীগের বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এ কে ফজলুল হক সাহেব সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল পদ ত্যাগ করে বিপক্ষদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। হক সাহেবের এই কার্যের ফলে জনসাধারণ উল্লসিত হয়ে তাঁর নামকরণ করে—'শের-ই-বঙ্গাল'।

হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক দল এবং মৌলানা ভাসানী ও সোহরাবর্দীর আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। তারা যুক্তভাবে সমগ্র প্রদেশে এই বলে প্রচারকার্য শুরু করে যে মুসলিম লীগ আদর্শচ্যুত, অগণতান্ত্রিক এবং দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাকিস্তানকে পশ্চিমী শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা এই মুসলিম লীগ বিরোধী প্রচারের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হয়।

যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ার সময় নেতারা জানতে পারেন যে কেন্দ্রীয় সরকার মিঃ ফজলুল হককে পূর্ববঙ্গের গভর্নর করার প্রস্তাব দিয়েছে, তখন তাঁরা প্রস্তাব দেন যে যুক্তফ্রন্ট জিতলে মিঃ হকই হবেন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। একথার সত্যতা প্রমাণের জন্য ১৯৫৩ সালের ৬ ডিসেম্বর তাঁকে যুক্তফ্রন্টের নেতা নির্বাচিত করা হয়।

মুসলিম লীগের জয়লাভের আশা নেই দেখে নিজাম-ই-ইসলাম দল, মৌলানা আথার আলীর দল সকলেই যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়। এই সকল দলের যোগদান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ মতবাদ ও আদর্শের যথেষ্ট অমিল থাকা সত্ত্বেও তারা প্রত্যেকেই মুসলিম লীগকে পরাস্ত করতে চেয়েছিল। এই সময়ের সভাসমিতিগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নেতারা প্রত্যহ পাকিস্তানের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিরুদ্ধে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট নেতারা নির্বাচনী ইস্তাহারের আকারে পূর্ববঙ্গের জন্য এক ২১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন যা নির্বাচিত হলে তারা প্রথম

পাঁচবছরের মধেই কার্যকরী করার আশ্বাস দেন। এই ২১ দফা সূচির মুখবন্ধে বলা হল "প্রাদেশিক আইনসভায় এমন কিছু করা হবে না যা পবিত্র কোরাণের নীতির বিরোধী অথবা যার দ্বারা পাকিস্তান নাগরিকের ঐশ্লামিক একতা ও ভ্রাতৃত্ব ক্ষুন্ন হতে পারে।"

২১ দফা সূচি :—

১। বাংলা ভাষা হবে পাকিস্তানের অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা।

২। ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকে যে কোন প্রকারের জমিদারি বিলুপ্তি করণ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন। করের পরিমাণ হ্রাস।

৩। পাটশিল্পকে জাতীয়করণ, পাট উৎপাদকদের জন্য উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ। মুসলিম লীগ আমলের পাটশিল্পের দালালদের অনুসন্ধান করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।

৪। সমবায় শিল্পপ্রথা প্রতিষ্ঠার দ্বারা কুটিরশিল্প ও শ্রমশিল্পের উন্নতি।

৫। লবণশিল্পে পূর্ব পাকিস্তানের স্বনির্ভরতার জন্য এই শিল্পের পত্তন এবং পাট-দালালদের মত লবণশিল্পের দালালদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬। সর্বপ্রকার উদ্বাস্তু—বিশেষত কারিগর ও শিল্পশ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য সেচ পরিকল্পনা।

৮। পূর্ববঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্পশ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাবিধান।

৯। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতা ব্যবস্থা।

১০। সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থা বিলোপের দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন।

১১। ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কালাকানুন বাতিল করে তাদের স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরকরণ।

১২। প্রশাসনিক ব্যয়সঙ্কোচন, উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতনে সমতা আনয়ন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা ১০০ টাকার বেশী বেতন গ্রহণ করবেন না।

১৩। সর্বপ্রকার দুর্নীতি, আত্মীয় পোষণ, উৎকোচের অবসান এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের পরের সময়ের প্রত্যেক সরকারী অফিসার ও বাণিজ্যপতিদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ।

১৪। বিভিন্ন জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স কর্তৃক ধৃত সকল বন্দীদের মুক্তি এবং সভাসমিতি, প্রেস ও বাকস্বাধীনতা স্থাপন।

১৫। বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনব্যবস্থার পৃথকীকরণ।

১৬। বর্ধমান ভবনকে প্রথমে ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগারে পরিণতকরণ।

১৭। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহিদের স্মৃতিতে একটি শহিদস্তম্ভ নির্মাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ।

১৮। ২১শে ফেব্রুয়ারী "শহিদ দিবস" এবং ছুটির দিন ঘোষণা।

১৯। ঐতিহাসিক লাহোর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে পূর্ববঙ্গের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা। প্রতিরক্ষা বিষয়েও কেন্দ্রে যেমন থাকবে "আর্মি হেডকোয়ার্টার্স" তেমনি পূর্ববঙ্গে থাকবে "নেভি হেডকোয়ার্টার্স" এবং পূর্ববঙ্গকে অস্ত্র ব্যাপারে স্বনির্ভর করার জন্য পূর্ববঙ্গে "অস্ত্রকারখানা" প্রতিষ্ঠা। আনসারদের পুরোপুরি সৈনিকরূপে স্বীকৃতি।

২০। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন কারণেই আইনসভা বা মন্ত্রিসভার কার্যকাল বৃদ্ধি করবেন না এবং যাতে নির্বাচনী-কমিশনারের মাধ্যমে

স্বাধীন পক্ষপাতহীন নির্বাচন হতে পারে তার জন্য তাঁরা নির্বাচনের ছ'মাস পূর্বে পদত্যাগ করবেন।

২১। প্রত্যেকটি আইনসভা সদস্যের শূন্যপদ শূন্য হওয়ার তিনমাসের মধ্যে উপনির্বাচন দ্বারা পূর্ণ করা হবে এবং যদি যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পরপর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হয় তবে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববঙ্গের ৬০,০০০ হাজার মসজিদকে নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্র করে মোল্লাদের প্রচারকার্যে নিযুক্ত করে। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে বিপুল সমর্থন লক্ষ্য করে সরকার এই সময় প্রদেশব্যাপী দমননীতি প্রয়োগ করে ১৪৪ ধারা প্রবর্তন, সভাসমিতি নিষিদ্ধকরণ, বই কাগজ বাজেয়াপ্তকরণ এবং হাজার হাজার গ্রেপ্তারের দ্বারা।

১৯৫৪ সালের ৩রা জানুয়ারী ঢাকা পল্টন ময়দানের জনসভায় প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলি ভাষণ দিতে উঠলে জনতা ইংরাজীর পরিবর্তে বাংলা ভাষায় বলার দাবিতে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। তারা চীৎকার করতে থাকে "মুসলিম লীগ নিপাত যাক।" পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং সভা পণ্ড হয়ে যায়।

অগত্যা মুসলিম লীগ হাইকমাণ্ড জয়লাভের আশায় ক্ষমতাসীন এম এন এ-দের বাদ দিয়ে জনপ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের থেকে প্রার্থী নির্বাচন করতে থাকে।

এদিকে মৌলানা ভাসানী ও ফজলুল হক প্রতিটি জনসভায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হতে থাকেন। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে পাওয়ার দাবিই জনসাধারণের কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ তাদের কাছে ক্ষমতালোভী কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারকে উপেক্ষা করার প্রতিষ্ঠানরূপেই গণ্য হয়।

যদিও কেন্দ্রীয় শাসকদল অভিযোগ করেন যে যুক্তফ্রন্ট কম্যুনিস্ট

পরিচালিত দল তথাপি সোহরাবর্দীর নেতৃত্ব এবং ফ্রন্টের নির্বাচনী প্রস্তাবের মুখবন্ধই প্রমাণ করে যে এটা পুরোপুরি ইসলামী মতবাদের সমর্থক ছিল। কেন্দ্রীয় ক্ষমতাবানদের সবচেয়ে রাগের কারণ ছিল যুক্তফ্রণ্টের দুটি নীতি—জমিদারী লোপ ও কৃষকদের জমিবণ্টন। কারণ মুসলিম লীগ নেতারা অধিকাংশই ছিলেন জমিদার। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের জমিদারী বিলোপ নীতিই তাদের কম্যুনিস্ট বলার সবচেয়ে বড় কারণ, যদিও পাকিস্তান জন্মের সময় থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। অধিকাংশ কম্যুনিস্ট কর্মী ও নেতা ছিল জেলে বন্দী এবং তাদের কোন অর্থ সামর্থ্য কিছুই ছিল না।

পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, যুক্ত প্রগতিশীল দল এবং তফসিল দল মিলে আরও একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন এবং তাঁরা ৭২টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করান।

বর্ণ হিন্দুরাও একটি কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গঠন করে যাঁদের প্রার্থী ছিলেন বসন্তকুমার দাস, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, নেলী সেনগুপ্তা, মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ নেতারা। সংখ্যালঘিষ্ঠ যুক্তফ্রন্ট উক্ত প্রার্থীদের সমর্থন করেন সংখ্যালঘুদের প্রতি খসড়া শাসনতন্ত্রের অবিচার দূর করার দাবিতে এবং যুক্ত-নির্বাচন দাবিও ছিল এঁদের অন্যতম দাবি। এই দাবির স্বপক্ষে মনোরঞ্জন ধর এক ভাষণে বলেন, "একমাত্র এদ্বারা সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি ও দমন আইনের অপসারণ সম্ভব। যার ফলে গণতন্ত্রের উন্নতি সম্ভব।"

নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল স্পীকারসহ ৩১০ সদস্য বিশিষ্ট আইনসভার ২১৮টি আসনই যুক্তফ্রন্ট লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২১৮টি পেয়েছে। অবশিষ্ট ৭২টি আসনের তফসিলীদের জন্য সংরক্ষিত আসন, ৯টি মুসলিম লীগ, ১টি চট্টগ্রাম থেকে নির্দল প্রার্থী পরে যিনি মুসলিম লীগে যোগ দেন, ১টি খিলাফৎ-ই-রব্বানী এবং ৯টি নির্দল। সংখ্যালঘু সংরক্ষিত

আসনের মধ্যে কংগ্রেস ও তফসিলী ফেডারেশন প্রত্যেকে ২৪টি করে আসন পেয়ে বিপুল সংখ্যাধিক্য লাভ করে। যুক্ত প্রগতিশীল দল পায় ১২টি এবং তফসিলী সম্প্রদায় ফেডারেশনের নেতা শ্রী ডি এন বারুই পরিচালিত দল পায় ১টি আসন। সংখ্যালঘু আসনের চারটি কম্যুনিস্ট পার্টি, অমুসলমান আসনের ৩টি গণতন্ত্রী দলের হিন্দু, ২টি বৌদ্ধ আসনের ১টি শ্রীকামিলাকুমার দেওয়ান এবং অপরটি শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া লাভ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন নিছক ভোটের লড়াই ছিল না। সাত বছর ধরে মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের উপর যে নির্মম শাসন ও শোষণ চালিয়েছিল এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তার সক্রিয় প্রতিবাদ জানাবার সুযোগ পেল। এই নির্বাচনের তাৎপর্য করাচী লাহোর নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং পূর্ববাংলার বিদ্রোহী রূপ দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিত্ব গঠন করবার সুযোগ দেওয়া হলে পূর্ববাংলা বিদ্রোহ করবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। পূর্ববঙ্গ থেকে পাঞ্জাবী অবাঙালী অফিসাররা অনবরত রিপোর্ট পাঠাতে থাকে যে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিত্ব গঠন করবার সুযোগ দিলে ব্যাপক অরাজকতা শুরু হবে, আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়বে, অবাঙালীদের জীবন ও জীবিকার কোন নিরাপত্তা থাকবে না। করাচী থেকে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ পূর্ববঙ্গের তৎকালীন গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জমানকে যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিত্ব গঠন করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী অবিভক্ত ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন লীগ নেতা কেন্দ্রের এই পরামর্শকে যথাযথ মনে করতে পারেন নি। তিনি যুক্তফ্রন্টের নেতা ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই মন্ত্রিত্ব গঠনের কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকা জেলের বাঙালী অবাঙালী

ওয়ার্ডারদের মধ্যে এক সংঘর্ষ বেঁধে গেল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার জন্য আবার পূর্ববঙ্গের অবাঙালী আমলাতন্ত্র কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট পাঠায়। পূর্ববঙ্গের অবাঙালী আমলাতন্ত্র যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার কাজ বানচাল করার জন্য নানা ভাবে মন্ত্রীদের আদেশ ও নির্দেশ অমান্য করে, সরাসরি কেন্দ্রের কাছে নানা মনগড়া, উদ্দেশ্যপ্রসূত রিপোর্ট পাঠিয়ে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দিল। পূর্ববাংলায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেই অজুহাতে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বার্থচক্র শিল্পক্ষেত্রকেই বেছে নিল। পূর্ববঙ্গের পাঞ্জাবী ও অবাঙালী শাসকগোষ্ঠী এবং আদমজী মিলের অবাঙালী কর্তৃপক্ষ এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে. লিপ্ত হল। ১৯৫৪ সালের মে মাসে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে বাঙালী-অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড দাঙ্গা বেঁধে গেল। অবাঙালী মিল কর্তৃপক্ষ অবাঙালী শ্রমিকদের লাঠি, তরবারী এমন কি আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত সরবরাহ করে বাঙালী শ্রমিকদের আক্রমণ করার জন্য উসকিয়ে দিয়েছিল। এই দাঙ্গায় প্রায় শতাধিক শ্রমিক নিহত হয়, বহু নরনারী ও শিশুর মৃতদেহ শীতলক্ষ্যা নদীর জলে ভাসতে দেখা যায়। আদমজী জুট মিলে প্রধানত বাঙালী শ্রমিকদের যে ইউনিয়ন ছিল তার সভাপতি ছিলেন মৌলানা ভাসানী সাহেব। সাধারণ নির্বাচনের সময় এই ইউনিয়নভুক্ত সদস্যরা যুক্তফ্রণ্টের প্রার্থীদের ভোট দিয়েছিলেন। সেজন্য মালিক পক্ষ আগে থেকেই তাদের উপর বিক্ষুব্ধ ছিলেন। নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের সাফল্যের পর তারা যখন কেন্দ্রীয় স্বার্থচক্রের উসকানি পেল, তখন বাঙালী শ্রমিকদের 'উপযুক্ত শিক্ষা' দেবার জন্য তারা এগিয়ে এল। তার ফলেই এ হাঙ্গামা।

যুক্তফ্রণ্টের পিছনে যে আছে সাড়ে ৪ কোটি মানুষ, তাদের কথা ভেবেই কর্তারা অন্য পথ ধরলেন। সোহরাওয়ার্দীর ডাইরেক্ট

অ্যাকশনের পথ ধরে উত্তেজিত করে তুললেন আদমজীর অবাঙালী শ্রমিকদের। তারা ছোরা আর পেট্রোল নিয়ে আক্রমণ চালাল বাঙালী শ্রমিকদের ব্যারাকে। কী, এত বড় আস্পর্ধা! বাংলা দেশে বসে বাঙালী শ্রমিকদের উপর হামলা। রুখে দাঁড়াল বাঙালী শ্রমিকরাও। দাঙ্গা বেঁধে গেল দুই দলে। আদমজী জুট মিল এমন দুর্গ বিশেষ যে দিন কয়েক তো সে খবর বহির্জগতে পৌঁছলই না, শেষে খবর পেয়ে মুজিবুর রহমান ভ্যান ভ্যান পুলিশ নিয়ে গেলেন সেখানে। ছুটে এলেন মৌলানা ভাসানী। তিনি যে বাঙালী শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। তাঁরা গিয়ে দেখলেন কংক্রিটের রাস্তায় চাপ চাপ তাজা রক্ত। তখনো মৃতদেহ পড়ে রয়েছে এখানে সেখানে।

ছুরির আঘাতে ফেঁসে গেছে ভুঁড়ি। ভিতরের পুকুরটা লাশে গাদা হয়ে গেছে। শ'য়ে শ'য়ে নয় হাজারে হাজারে শ্রমিক মারা গিয়েছিল এ দাঙ্গায়? কেউ জানেনা কতো হাজার। লক্ষ্যার জলে ভেসে গেছে কত হতভাগ্যের দেহ। গোলাম মোহাম্মদ আর মহম্মদ আলির ষড়যন্ত্রের বলি ওরা। দৃঢ়হাতে মুজিবুর রহমান অবস্থা আয়ত্তে আনলেন। তাতে কী? আদমজীর জুট মিলে দাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের করাচী শাখা জিগির তুলল: পূর্ব বাংলায় আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে! সেখানে কারও জান মান আর নিরাপদ নয়। সেখানে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শাসন চালু কর। কোন রকম তদন্তের আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ফতোয়া জারি করলেন: এ হাঙ্গামার জন্য দায়ী কমিউনিস্ট ও একশ্রেণীর দেশদ্রোহী। কমিউনিস্টদের পাকড়াও কর। সীমান্তে ভারতীয় অনুপ্রবেশ-কারীদের দিকে নজর রাখ। এই সময়কার ঘটনা প্রবাহের দিকে একটু সতর্ক দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাবে যে পূর্ববাংলার নবজাত মন্ত্রিসভাকে খতম করবার উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ ও

তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী সাঙাতের দল কি অদ্ভুত কৌশলের সঙ্গে ষড়-যন্ত্রের জাল বিস্তার করছিলেন। আদমজী জুট মিলের ঘটনায় তৎক্ষণাৎ যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করা না হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুমে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনী—যার নাম ইস্ট পাকি-স্তান রাইফেলস্—তাকে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে এনে তার মাথার উপর বসিয়ে দেওয়া হল পূর্ববঙ্গের পাঞ্জাবী জি ও সি-কে অর্থাৎ সামরিক কর্তৃপক্ষকে। পূর্ববঙ্গ সরকারের হোমরা চোমরা অবাঙালী দু-হাজারী, চার-হাজারী অফিসাররা প্রাদেশিক যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে এ সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চললেন। তাঁদের কাছ থেকে মদৎ পেয়ে কোন কোন থানার দারোগা পর্যন্ত মন্ত্রিসভার নির্দেশকে অমান্য করে চললেন। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ওয়ালাদের মালিকানায় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ তুলে এমন জোর গলা ফাটাতে লাগল যে পারলে তারা তখনই যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে শূলে চড়িয়ে দেয়। যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে চারিদিকে যখন চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হচ্ছিল, সে সময় মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব কলকাতায় এলেন। ফজলুল হক কলকাতা থেকে ঢাকা ফিরে যাবার কয়েকদিন পরেই গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ এবং প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলি তাঁকে করাচীতে জরুরী তলব করলেন। হক সাহেব ২১শে মে শুক্রবার করাচীতে উপস্থিত হলেন। গভনর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জনাব হকের সপ্তাহব্যাপী বাকবিতণ্ডায় আলোচনা হল। শের-ই-বঙ্গাল ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবি করলেন। ৩১শে মে রবিবার গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ, জনাব ফজলুল হক ও তাঁর যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করে পূর্ব-পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন প্রবর্তিত করলেন। জবরদস্ত সেনাপতি (সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব) মেজর জেনারেল ইস্কান্দার

মির্জাকে পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর করে পাঠান হোল। তৎকালীন গভর্নর বৃদ্ধ চৌধুরী খালিকুজ্জমান অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। ইস্কান্দার মির্জা তাঁর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের চীফ সেক্রেটারী করে নিয়ে এলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ সিভিলিয়ান জনাব নিয়াজ মহম্মদ খানকে (এন এম খান নামে কুখ্যাত এই পাঞ্জাবী আই-সি-এস অফিসার অবিভক্ত বাংলার নানা জেলায় ডিস্ট্রিট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন)।

৩০শে মে-সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্য এক বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি জনাব ফজলুল হককে পাকিস্তানের শত্রু, পূর্ববঙ্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করলেন। করাচী থেকে ঘটা করে প্রচার করা হোল যে যুক্তফ্রণ্ট পূর্ববঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তাই পাকিস্তানকে অন্তর্ঘাতীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যই পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হলেন।

পদচ্যুত মূখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক সাহেব ৩০শে মে সকাল সওয়া নটা নাগাদ করাচী থেকে ঢাকা ফেরবার পথে ঘণ্টাখানেক তাঁর বিমানটি দমদম বিমানঘাটিতে থেমেছিল। হক সাহেবের সঙ্গে ছিলেন তার মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য—জনাব আজিজুল হক, জনাব আতাউর রহমান খান, যিনি পরে কিছুদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন, এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

৩১মে মে গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন : "আমার শাসনের বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দটি করলেও তা বরদাস্ত করা হবে না। দরকার হলে আমি জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করব। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করবার জন্য যদি দশ বিশ হাজার মানুষকেও হত্যা করতে হয়, তা হলেও আমি পিছপা হব না।" সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র দলন শুরু

হল। সংবাদপত্রের অফিসে অফিসে পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর পাহারা বসল। সরকারের অন্ধ সমর্থক মর্নিং নিউজ আর আজাদ ছাড়া অন্যান্য সব সংবাদপত্রের উপর আদেশ জারী হোল যে সেন্সার ছাড়া কোন সম্পাদকীয় এমন কি সংবাদও প্রকাশ করা চলবে না। পূর্ব বাংলায় ইস্কান্দার ও এন এম খান শাহী চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চার হাজার রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে ধরে নিয়ে কারারুদ্ধ করা হোল। এঁদের অনেকে মুসলিম লীগ আমলেও জেলে ছিলেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা মুক্তিলাভ করেছিলেন। কিন্তু এই মুক্তি মাত্র এক মাসের বেশী স্থায়ী হল না। এঁরা ইস্কান্দারী রোষের বলি হলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, গণতন্ত্রী দলের সম্পাদক মহম্মদ আলি এবং আরও অনেক প্রগতিশীল যুব নেতা। এ সময় পূর্ব বাংলার সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতা বরিশালের সতীন সেন কারাগারে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জেলের অত্যাচারে ও অযত্নে তাঁর দেহ দ্রুত ভেঙে পড়তে লাগল এবং তাঁকে প্রথম বরিশাল জেল থেকে রংপুর জেলে এবং পরে ঢাকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হোল। কিন্তু তখন তাঁর অন্তিম অবস্থা। ১৯৫৫ সালের ২৫শে মার্চ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর পর এই মহান বিপ্লবী নেতা যিনি জীবনের প্রায় ২৬ বছর ইংরেজের কারাগারে কাটিয়েছেন এবং পাকিস্তানের জেলেও বন্দী থেকেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর দেহাবশেষটি পর্যন্ত বেওয়ারিশ মৃত-দেহের সঙ্গে মর্গের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান এই সময়ে জেলে সতীন সেনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। মুজিবুরের জীবনে যে কয়জন রাজনৈতিক নেতার চরিত্রের প্রভাব পড়ে তাঁরা হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, এ কে ফজলুল হক আর সতীন সেন। সতীন সেনের আত্মদানও মুজিবের

জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। সতীন সেনও মুজিব সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন।) কিন্তু সেই সব কথা বলার আগে সতীন সেনের আত্মদান সম্পর্কে কিছু বলে নিই। পাক ভারত উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ঋষিকল্প ত্যাগী পুরুষ কি নির্যাতন ও দুঃসহ নিপীড়নের মধ্যে পাকিস্তানের কারাগারে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেছিলেন সে কথা লিপিবদ্ধ আছে তাঁর নিজের লেখা দিনলিপিতে। সতীন সেনের কারাবাসের ও জীবন দীপ নির্বাপনের শেষ অধ্যায়টা তুলে ধরছি।

শেষ কারাবাস

১৯৫৪ সনের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিল। নাটকীয় ভাবে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার গভর্নর রূপে শপথ গ্রহণ, ৯২ এ ধারা প্রবর্তন, মিঃ ফজলুল হকের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বাতিল, মিঃ হকের স্বগৃহে আটক, দেশব্যাপী ব্যাপক ধরপাকড় প্রভৃতি ঘটনাবলার ক্ষিপ্রগতি জনসাধারণকে কতকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিল। বরিশালেও দ্রুতগতিতে যুক্তফ্রণ্টের সমর্থক প্রগতিশীল ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হইল। এই গ্রেপ্তারের হিড়িকে ১লা জুন তারিখে সতীন্দ্রনাথকেও তাঁহার পটুয়াখালিস্থ স্বগৃহ হইতে গ্রেপ্তার করা হইল। ৫০ বৎসর বয়সে যখন সাধারণত লোকে শারীরিক বিশ্রাম কামনা করেন, তখন সেই দেহে কারাগারের কঠোরতা গ্রহণে মন স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের মন বা প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত ধাতুতে গঠিত। ক্ষণিকের তরেও এই ক্লেশজনক জীবন যাপন করিবার দরুণ তাঁহার কোন বিরক্তি বা ক্ষোভ প্রকাশ পাইল না, বরং কারাগারে প্রগতিশীল মুসলমান কর্মীদের মধ্যে নিজেকেও দেখিয়া তাহার মন বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আদর্শবাদী জীবনের দৃষ্টিতে তিনি তাঁহার

এই নূতন কারাবাসকে সানন্দে বরণ করিলেন। কেননা তাঁহার নিজের ভাষায় "প্রধান কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ হইল। ইহার ফলে কর্মক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। Suffering-এর পথে এদের দীক্ষা শুরু হইল মাত্র।" কারাগারের ক্লেশের মধ্যে রহিয়াও বাঙালী তরুণ মুসলমান যুবকগণ দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের প্রয়াসে দুঃখ কষ্ট বরণ করিবার জন্য যে প্রস্তুত হইতেছে ইহাই তাঁহার জীবনের রূপায়িত আদর্শ।

গ্রেপ্তার করিবার সংবাদ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পটুয়াখালির মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে শত সহস্র জনতা যে ভাবে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল তাহা সতীন্দ্রনাথের জীবনে অভূতপূর্ব! তিনি হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন তাহাদের ছিল না, তিনি তাহাদের একান্ত আপনার জন—জনতার এই অভিব্যক্তিই তাঁহাকে মুগ্ধ করিল, অভিভূত করিল। পটুয়াখালি জেল হইতে ৭ই জুন যখন তাঁহাকে বরিশাল জেলে পাঠান হইল তখন পথে, স্টেশনে, স্টিমারে কাতারে কাতারে জনতার আবেগপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে জাগ্রত নবশক্তির দুর্লভ ইঙ্গিত দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইল।

দেহের বার্ধক্যকে উপেক্ষা করিয়া মনের তারুণ্যের সহিত তিনি কারাজীবন শুরু করিলেন। প্রত্যহ ভোর ৪ ঘটিকায় শয্যা ত্যাগ করিবার অভ্যাস তাঁহার বরাবরের ছিল। প্রাতঃকৃত্যাদির পর গীতা ও বিভিন্ন পুস্তকাদি পাঠ, তৎপরে ঠিক এক ঘণ্টা চরকায় সূতা কাটা, পরে জেল প্রাঙ্গণে ভ্রমণ ছিল তাঁহার নিত্যকার্য। সমস্ত নিরাপত্তা বন্দীদের কাহার কি অসুবিধা আছে অনুসন্ধান করিয়া কর্তৃপক্ষের দ্বারা উহা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে একজন বন্দী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মুসলমানদের দেশে civil liberty সম্ভব নয়, democracy অসম্ভব, democratically minded লোক টিঁকিতে পারে না।'

কিন্তু এই প্রকারে অন্ধ কারণ দর্শাইয়া দেশ পরিত্যাগ করিবার মানসিক অবসাদ বা আত্মবিশ্বাসের অভাব সতীন্দ্রনাথের কোন দিনও ছিল না। কাজেই এই সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব তিনি ব্যক্ত করিলেন মিঃ টমাস পেইনের সেই বিখ্যাত উক্তির দ্বারা—'My home is there, where liberty is not.'

এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল এবারকার বন্দিজীবনে এই সব নূতন সহযোগীদের সংস্পর্শে আসিয়া। তিনি দেখিলেন—কি fine কতগুলি feature এই সব মুসলমানদের ভিতর—শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, ছোট বড় সবার ভিতর। Disinterested, selfless, courageous leadership হইলে brilliant কার্য হইত—material খুব fine।

রংপুর জেল

প্রায় দেড় মাস বরিশাল জেলে আটক থাকিবার পর তাঁহাকে রংপুর জেলে বদলী করা হইল। ২১শে জুলাই তিনি রংপুর জেলে পৌঁছিলেন। প্রথমে উঠিলেন ৩নং ওয়ার্ডে। সেখানে অন্যান্য নিরাপত্তা বন্দীদের মধ্যে দুইজন এম এল এ ছিলেন—মিঃ আজিজ মিঞা ও মিঃ এম মণ্ডল। এখানে উঠিবার কিছু পরেই সংবাদ আসিল যে আই জি-র নির্দেশমত তাঁহাকে পৃথক থাকিতে হইবে। সুতরাং হাসপাতালের একটি কামরায় তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল।

চিরাচরিত অভ্যাস বশে এখানেও তিনি সকল নিরাপত্তা বন্দীদের অভাব অভিযোগের সন্ধান লইতেন এবং আবশ্যকীয় সহায়তা করিতেন। এই সময় প্রবল বর্ষা চলিতেছিল কাজেই তিনি তাঁহার waterproofখানা ৩নং ওয়ার্ডের ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তৎসহ কতিপয় নিজস্ব পাঠ্য পুস্তকও পাঠাইলেন। অযাচিত এই

ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হইলেন। জেলে হাসপাতালের নীচতলার যে কামরায় তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট ছিল তাহারই ঠিক উপরের তলায় ছিল জেলের টি বি ওয়ার্ড এবং তখন যক্ষ্মা রোগীগণ সেখানে থাকিত। উক্ত টি বি ওয়ার্ড-এর মেঝের বিভিন্ন ভগ্ন স্থান হইতে প্রত্যহ তাঁহার কামরার মধ্যে জল পড়িতেছে তিনি লক্ষ্য করিলেন। ২৪শে জুলাই দিন-রাত্রে বেশ পরিমাণে জল পড়িল। এই গুরুতর ছোঁয়াচে রোগের সংস্পর্শে থাকিবার বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া পরদিনই তিনি জেল কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন তাঁহাকে অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য, পরেও বহুবার মৌখিক ভাবে এবং পত্রযোগে এই কথা তিনি কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন। কিন্তু তাঁহার স্থান পরিবর্তনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কার্যত কোন প্রতিকারই হইল না।

একটি কয়েদীর সন্দেহজনক মৃত্যু

৮ই অক্টোবর তিনি সংবাদ পাইলেন যে জেলের cell-এর একটি কয়েদী মারা গিয়াছে। এই কয়েদীকেই পূর্বদিন বেলা ১১।১২টার সময় বড় জমাদার, জমাদার সিপাহী ও কতিপয় কয়েদী দ্বারা জুলম সহ উক্ত cell-এর দিকে লইয়া যাইতে তিনি দেখিতে পান। উক্ত কয়েদী cell-এ না ঢুকিবার জন্য দরজা ধরিয়া বাধা দিতেছিল। অবশেষে প্রবল শক্তির নিকট পরাভূত হয়।

মৃত্যুর দিন সকালে দেখা গেল যে সে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

এই মৃত্যুর ঘটনা সতীন্দ্রনাথের অন্তরে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। সহায় সম্বলহীন, দরিদ্র এবং আবদ্ধ একটি নিরস্ত্র লোককে এমন নিষ্ঠুর ভাবেই পুনঃ পুনঃ প্রহার করা হইল—যাহার পরিণতিতে হইল তাহার মৃত্যু, অথচ এজন্য দেখা দিল না কোন আলোড়ন, কোন প্রতিকার ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্রের একটা প্রধানতম কেন্দ্রে

যদি সংঘটিত হইতে পারে এমন সব ঘটনা, তবে সে রাষ্ট্রের কাছে দেশের ভবিষ্যৎ কোথায়! এই কয়েদীর মৃত্যু এবং সতীন্দ্রনাথের মৃত্যু এই দুইটির মধ্যেই যেন রহিয়াছে এক মহা রহস্য। সে রহস্যজনক মৃত্যুর কাহিনী রহিয়াছে উভয় মৃত্যুর অন্তর্বর্তী দীর্ঘ অবসরের মধ্যে উদ্‌ঘাটনের প্রতীক্ষায়—ভাবীকালের অন্তরালে।

সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হইতে পারে এমন সব দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া হয়তো অনেকের পক্ষেই বিচিত্র নহে, কিন্তু অজ্ঞাত, অখ্যাত ভাবে সকলের অলক্ষে বিপদকে উপেক্ষা করিয়া নিজেকে লিপ্ত করিবার মধ্যে যে মানসিক বীরত্বের প্রয়োজন হয় সতীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল তাহা পূর্ণ মাত্রায়। এই কয়েদীর মৃত্যুর ব্যাপার লইয়া এত ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া আর দশজনের ন্যায় তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাইয়া শান্ত থাকাই তো বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য হইত! কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহার এই ৬০ বৎসর বয়সের কারাভ্যন্তরের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠার মানসে তিনি দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সতীন্দ্রনাথ দাবি করিলেন মৃতের শব-ব্যবচ্ছেদ সহ পুলিশ কর্তৃক মৃত্যু-রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হউক। ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল জেলারের সহিত সতীন্দ্রনাথের তিক্ততা বৃদ্ধি। উক্ত মৃত্যু ব্যাপারের উপরে যবনিকা টানিবার মানসে জেল কর্তৃপক্ষ জানাইলেন যে তাহাদের নিজস্ব অনুসন্ধানে তাহারা সন্তুষ্ট, তদতিরিক্ত কিছু করিবার নাই। উত্তরে সতীন্দ্রনাথ আবেদন করিয়া বলিলেন—"justice not only to be done but all must feel that justice has been done."—কিন্তু বিশেষ কিছুই হইল না।

সতীন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। যত প্রকার আইনসঙ্গত উপায়ে সম্ভব এই নিষ্ঠুর ও বেদনাদায়ক মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ক্রমাগত দাবি উত্থাপন করিতে থাকেন। শুধু ইহাই নহে, জেলের

অভ্যন্তরস্থ অসহায় কয়েদীদের প্রতি নানাপ্রকার জুলুম অত্যাচারের প্রতিবাদও সতীন্দ্রনাথ করিতেন। জেলারকে তিনি জানাইলেন, সর্ববিধ আইন সম্মত উপায় অবলম্বনের দ্বারাও যদি ইহার প্রতিকার না হয় তবে নিজে লাঞ্ছনা ভোগ করিবেন। ইহারই ফলে শুরু হইল সতীন্দ্রনাথের কারাজীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিবার নানা আয়োজন।

[মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন]

রোগের পূর্বাভাব

১৯৫৪ সনের নভেম্বরের শেষের দিক হইতেই সতীন্দ্রনাথের শরীর বিশেষভাবে খারাপ হইয়া পড়িল। তাহার উপর চলিত নানাপ্রকার হট্টগোল চিৎকার। ঐ সব কারণে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইল।

নভেম্বর ও ডিসেম্বরের অর্ধমাস অতিবাহিত হইল—পুষ্টিকর আহারের অভাব, নিদ্রাহীন রজনী যাপন, বহির্ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, কর্তৃপক্ষের অবহেলা, অনাদর, তাহাদের সর্বপ্রকার অনিষ্টাচরণের প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি টি বি রোগের বিভীষিকাময় বিস্তৃতির আশঙ্কা—ইহারই পরিণতিতে সতীন্দ্রনাথের শরীর ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্থানীয় জেলের বিশৃঙ্খলা এবং তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ন্যূনকল্পে ৬।৭ খানা পত্র তিনি ঢাকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরেও পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কোন উত্তর তিনি পান নাই। তন্মধ্যে শেষ পত্র তিনি পাঠাইয়াছিলেন রংপুর জেল হইতে ১৯৫৪ সনের ১০ই ডিসেম্বর। ইহা ব্যতীত জেলের সুপারকেও অসংখ্যাবার মৌখিক ও পত্রযোগে তিনি সে কথা জানাইয়াছেন। কিন্তু সবই নিষ্ফল।

পাবনা জেল

অনেক লেখালেখি, অনেক হাঙ্গামার পর অবশেষে সতীন্দ্রনাথকে রংপুর জেল থেকে পাবনা জেলে বদলীর হুকুম আসে। যে সমস্ত

নিরাপত্তা বন্দী ছিলেন তাহাদেরও অন্যত্র বদলী করা হইল। ২১শে ডিসেম্বর রংপুর ত্যাগ করিয়া ২৩শে ডিসেম্বর সকাল ৯টায় তিনি পাবনা জেলে পৌঁছাইলেন। এর পরই আসিল সতীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ অধ্যায়। সে অধ্যায় নিরন্তর প্রতি দেশবাসীর মনে এই প্রশ্নই জাগাইয়া তুলিবে—কি হইল এত বড় এক মহান আদর্শবাদীর—তাঁহার আদর্শ উদ্‌যাপনের পরিণতিই বা কি?

তাঁহার ডায়েরী বা রোজনামচার পাতায় পাতায় যেন ইহার ইঙ্গিত পাই। তাহাতে লেখা আছে—

"রংপুর জেলে শেষের দিক দিয়া এই যে ঝাকানি—বেশই লাগিল। এই বয়সে, এই স্বাস্থ্যে, একেবারে একাকী এই সব issue লইয়া যে struggleটা করিলাম, তাহাতে এই বয়সে আমার অতিরিক্ত মানসিক স্বাস্থ্য, শক্তি, technique ইত্যাদির পরিচয় পাইতেও বেশ সাহায্য করিয়াছে। আমার সবলতা, দুর্বলতা, আদর্শ ইত্যাদির পরিচয় আমি অনেকটা পাইয়াছি।"

কোন্ আদর্শ সতীন্দ্রনাথের ছিল, কোন্ প্রেরণায় তিনি সর্ব বিপদ লাঞ্ছনা বরণ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন?

"আমার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে মনোবল, সংকল্প, অধ্যবসায়, সাহস প্রভৃতির প্রয়োজন (সত্য ও অহিংসার দরকার), organisation আয়োজনের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাহার capacity আছে কি? Moslem majority যেখানে পাকিস্তানে তাঁহাদের চেনা, বোঝা, তাঁহাদের ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস প্রভৃতি—সবলতা, দুর্বলতা, খুব ভাল করিয়া হৃদয় দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, বুঝিয়া তাহাদের ভালবাসিতে হইবে।" ..."এদের কল্যাণ চাই—এরা আমার অকল্যাণ চায় ভুলে, এতে এদেরই লোকসান। গান্ধীজিকে, Jessus Christকে তাহাদের স্বদেশবাসী হত্যা করিল। এই tragedy তো জীবনে আছে—একে boldly face করিতে

হইবে। সুতরাং মানুষের এই পথ—এতেই দেশের এবং বিশ্বের কল্যাণ।"

এই তো ছিল মানুষের মত মানুষের উক্তি!

মহানির্বাণ

১২ই মার্চ সতীন্দ্রনাথকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আনয়ন করা হইল। এবং ১৩ই মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করান হইল। ১১ই মার্চ ঢাকা জেল হইতে লিখিত তাঁহার শেষ পত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস মহাশয় ১৮ই মার্চ পান। তাহাতে লিখিত ছিল সতীন্দ্রনাথের সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিবার কথা। অবশ্য তিনি সতীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ২৫শে মার্চ রাত্রি ১১টার সময়—যখন সতীন্দ্রনাথ ছিলেন মরণের প্রতীক্ষায় অচৈতন্য। একজন আই বি-র লোক তাঁহাকে সংবাদ দিল যে সতীন্দ্রনাথকে মুক্ত করা হইয়াছে, এখন হাসপাতালে দেখিতে যাইতে পারেন। অচৈতন্য সতীন্দ্রনাথকে তখন oxygen দেওয়া হইতেছিল। তাঁহার বুকের উপর একটুকরা কাগজে তাঁহার মুক্তি-সংবাদ লিখা ছিল। যখন এই তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় তখন তিনি ছিলেন জ্ঞানহীন—শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষায়।

রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় তাঁহার শেষ নিশ্বাস মহাঅনন্তে মিলাইয়া গেল। শেষ মুহূর্তে শয্যাপার্শ্বে কেহ ছিল না, কেহ দেখিল না—কেহ চোখের দুই ফোঁটা অশ্রু পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারিল না।

সংবাদ পাইয়া পর দিবস প্রাতে তাঁহার ঢাকার বন্ধু-বান্ধবগণ মৃতদেহ আনয়ন করিবার জন্য কলেজ হাসপাতালে আসিলেন। মৃতদেহ তখন পাঠানো হইয়াছে মর্গে! সত্যাগ্রহীর crucification পরিপূর্ণ হইল। চির বিদ্রোহী বিপ্লবী বীর সতীন্দ্রনাথ দেশের

পুঞ্জীভূত হলাহল পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইলেন। একটি অগ্নিশিখা নিজে জ্বালিয়া পার্শ্ববর্তী অন্ধকার দূর করিয়া সুদূরপ্রসারী দীপ্তি ছড়াইয়া মহাকালের কোলে আবার নিভিয়া গেল।

[মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন]

অবশেষে

আজ শুধু এ প্রশ্নই রহিল উদগ্র হইয়া—কেন এ মৃত্যু, কার বা কাহাদের উপেক্ষায় এ দুর্দৈব, কি সে হেতু যাহার জন্য বাংলার মুক্তি সাধক সর্বত্যাগী বিপ্লবী অসহায় বন্দীরূপে তিলে তিলে কারাগারের মধ্যে আপনাকে ক্ষয় করিয়া হীনতর ব্যবস্থা ও উপেক্ষার মধ্য দিয়া লোকলোচনের অন্তরালে নিঃশব্দে ঝরিয়া গেল।

একটি আত্মীয় রহিল না শয্যাপার্শ্বে, আকুল আর্তি উঠিল না কোন স্বজনের বিহ্বল কণ্ঠে, কাহারও এক ফোঁটা অশ্রুজল সেই গতাসু মানব.. শেষ তর্পণে তৃপ্ত করিল না।

প্রদীপ নিভিয়া গেল।

সেদিন মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন কয়েকটি ছাত্র ও কয়েকটি সেবক—নিতান্ত অপরিচিত ও অজ্ঞাত। সেদিন তাঁহাদেরই একজন কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছিলেন বিদায়ী বীরকে—

"আপনার কি কেউ নেই?"

রোগকাতর দেহে প্রসন্ন হাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন এই মুক্তি পূজারী—"আমার সবাই আছে—মৃত্যুর পর জানতে পারবে।"

সত্যই সেদিন তাঁহার কেহ ছিল না—যাঁহার সবাই ছিল।

মৃত্যুর পরও সে এক নির্মম পরিহাস—অভিনব প্রহসন।

২৬শে মার্চ একটি প্রেসনোটে পূর্ববঙ্গ সরকার প্রচার করলেন—"অসুস্থতার জন্য শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেনকে গতকল্য (২৫শে মার্চ) মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির অব্যবহিত পরেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া

শ্রীযুক্ত সেনের মৃত্যু হয়—ইহা খুবই দুঃখের সংবাদ এবং গভর্নমেণ্ট এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।"

অথচ মৃতদেহ আনয়ন করিবার সময়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে death certificate দেওয়া হয় উহাতে উল্লেখ থাকে—"Satindra Nath Sen, Security Prisoner, C/o Supdt. Dacca Central Jail."

অর্থাৎ সতীন্দ্রনাথের তথাকথিত মুক্তি সংবাদ হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের নিকট পর্যন্ত ছিল অজ্ঞাত। মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীদিলীপ সেন বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন—"ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্যই এই মৃত্যু হইয়াছে। সময় থাকিতে বাহিরে কাহাকেও—কোন আত্মীয় পরিজনকেও কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই।"

সতীন্দ্রনাথের উপর নিষ্ঠুর অবহেলা, তাচ্ছিল্য ও হৃদয়হীন ব্যবহার তাঁহার জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত করা হইল।

অসহায় বন্দীকে আত্মীয় পরিত্যক্ত অবস্থায়, নিতান্ত মনুষ্যোচিত করুণায় সাধারণে যাহা করে—সেদিনকার অসাধারণ সেই শাসকের শাসন নীতি কি সেটুকুও করিতে পারে নাই? কেন?

এ হৃদয়হীন ব্যবহারের বিবরণ আছে শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট এক ছাত্রের বর্ণনায় ও এক নার্সের ভাষায়। ছাত্রটি বলিল—"একদিন সতীনবাবুকে শয্যায় মলমূত্রসহ অসহায় ভাবে শায়িত দেখা গিয়াছিল—ঐ অবস্থায় তিনি ৩।৪ ঘণ্টা ছিলেন—কেহ দেখাশুনা করিবার দরকার বোধ করে নাই।" একটি পুরুষ নার্স বলিল—"একদিন সতীনবাবুকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়াছিলাম, খাইবার পর তিনি বলিলেন, ২।৩ দিন এরকম ভাল খাইতে পারিলে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেন।" [মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন]

১৯৫৪ সালের পর থেকে যুক্তফ্রন্টের ইতিহাস শরিক দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহের কালিমায় কলঙ্কিত। আওয়ামী লীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি উভয়েই কাগজে কলমে একই কর্মসূচিতে বিশ্বাসী হলেও ফজলুল হক এবং সোহরাওয়ার্দীর রাজনীতি ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। এই সময়কার রাজনীতির সাথে দেশের স্বার্থ বা আদর্শবাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের স্বার্থে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এবং যুক্তফ্রন্টের অনেক নেতাই কেন্দ্রীয় সরকারের সেই ফাঁদে পতিত হন। মুজিবুর রহমান এই ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির সাথে কোন সম্পর্ক না রেখে দৃঢ় ভিত্তির উপর আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। পাকিস্তানের সে যুগের রাজনীতিতে বহু মন্ত্রিসভার রদবদল হয় এবং সোহরাওয়ার্দীও প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলোকে একত্র করে 'এক ইউনিট' প্রবর্তন করা হয় এবং তখন স্থির হয় যে পাকিস্তানের জাতীয় পার্লামেণ্ট পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। ইহাই Parity নীতি বলে পরিচিত। জনসংখ্যার অনুপাতে যদি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় তবে পাকিস্তানের পার্লামেণ্টে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অবশ্যম্ভাবী। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা গণতন্ত্রের এই প্রথম নীতিটি মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলোকে একত্র করে 'এক ইউনিট' গঠন করা হল এবং পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে Parity নীতি গৃহীত হল! পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী এবং সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এই নীতির সাথে সোহরাওয়ার্দী প্রত্যক্ষভাবে

জড়িত থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমানকে এর জন্য দায়ী করা ভুল হবে। মুজিবুর প্রথমে এই নীতি মেনে নিতে রাজী হন নি। তাঁর দলের নেতা সোহরাওয়ার্দী যখন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে Parity নীতি কেবল মাত্র প্রতিনিধির সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, চাকরী ব্যবসা-বাণিজ্য, মূলধন বিনিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই এই Parity নীতি গৃহীত হবে, তখন শেখ মুজিবুর দ্বিধাগ্রস্থ চিত্তে তাঁর মত দিতে বাধ্য হন। দলগত রাজনীতির খাতিরে এই Parity নীতির জন্য মুজিবুরকে দায়ী করা হয়তো যেতে পারে, এবং পূর্ববাংলার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আজও আওয়ামী লীগকে এর জন্য কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাসের বিচারে মুজিবুর রহমান এই Parity নীতির জন্য দায়ী নন। তাছাড়া তিনি একথা বারবার বলে আসছেন যে Parity নীতি সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা ছিল, কিন্তু প্রতিনিধির সংখ্যা ব্যতীত আর কোন ক্ষেত্রেই এই নীতি প্রয়োগ করা হয় নি।

এই সব প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আরও পরে হবে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৫৪ সালে মে মাসের পর থেকে পাকিস্তান রাজনীতিতে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়। এই ঝড়ে কে কখন উড়ছেন আর কে কখন পড়ছেন এর হিসাব রাখা দুঃসাধ্য ছিল।

এক কলমের খোঁচায় নাজিমুদ্দিনকে সরিয়ে কেন্দ্রে মহম্মদ আলিকে প্রধানমন্ত্রী করা হল। প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি প্রধান সেনাপতি আয়ুব খাঁকে নিয়ে গেলেন ওয়াশিংটন, ঢাকা থেকে ইস্কান্দার মির্জা ছুটি নিয়ে গেলেন লণ্ডনে।

"Mr. Ghulam Mohammed set spies to watch what was happening at Karachi when he was convalescing at Abbott—abad. Many of the spies were holding key posts in the administration. From them, he obtained a clear picture of the

conspiracy against him, hatched and executed by the constituent assembly as a whole and by prime minister Mohammed Ali. He was furious over the ammendmant of the Government of India Act. He come down to Karachi immediately but Mr. Mohammed Ali had already left for the United States.

While enioying American hospitality during his stay in the United States, Mr. Mohammed Ali got a jolt. He got summons from the Governor General of his country to return at once. Mr. Ali cancelled his scheduled visit to Ottawa within few hours of his receiving the summons, Mr. Ali was flying over the Atlantic on his way back to Karachi. At London airport Mr. Ali and general Ayub Khan were joined by General Iskandar Mirza and Mr. M. A. H. Ispahani, Pakistani High Comissioner in the U. K. They all flew to Karachi togethers. The Mauripur airport was heavily guarded by troops when they landed there at midnight on 23 October.

Emissaries of the Governor-General surrounded Mr. Mohammed Ali as soon as he came down the gangway of the aircraft. Mr Ali asked his Begum Saheba who also accompanied him to go home. Like a prisoner Mr. Ali was escorted to the car

and driven to the residence of the Governor-General.

What passed between Mr. Ghulam Mohammed and Mr. Mohammed Ali came to be known to the public through whispers from men who were eye witnesses to their meeting Pressmen had been to the airport and then to the Governor-General's residence. They saw how Mr. Mohammed Ali went in and how he came out at 2 in the morning. They saw him weeping when he come out. Mr. Ghulam Mohammed gave him an ultimatum : "Do as I order or go to Prison."

Reports appeared in foreign press of Mr. Mohammed Ali's surrender to Mr. Ghulam Mohammed in preference to detention in jail as a prisoner within a few hours of he surrender, early on the morning of 24 October."

[Eclips of East Pakistan]

এর পরেই গোলাম মহম্মদ মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করলেন, যে মন্ত্রিসভাকে তিনি বললেন "Ministry of telents', যে মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন আয়ুব খান ও জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। সোহরাওয়ার্দী এ সময় জুরিখে ছিলেন, তাঁকেও এই মন্ত্রিসভায় যোগদানের অনুরোধ জানানো হল। সোহরাওয়ার্দী খুব অরাজী ছিলেন না কিন্তু বাদ সাধলেন মৌলানা ভাসানী। ভাসানী বললেন যে, মহম্মদ আলী একদা অবিভক্ত বাংলায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার P A ছিলেন এবং যে

মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দী একজন মন্ত্রী ছিলেন তার অধীন মন্ত্রিসভায় যোগদান করা সোহরাওয়ার্দীর শোভন নয়। ভাসানী বললেন, 'গোলাম মহম্মদ তোমাকে আইনমন্ত্রী করতে চায় কিন্তু প্রধান মন্ত্রী করবে না কেন ?' কিন্তু সোহরাওয়ার্দী দেশে ফিরে আইনমন্ত্রী রূপেই কেন্দ্রে যোগ দিলেন। মহম্মদ আলি তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'The chair of the prime minister has been waiting for you, Sir.' সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী হয়ে পূর্ববাংলায় আবার পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলেন কিন্তু সোহরাওয়াদীর উচ্চাশা যথা কেন্দ্র ও পূর্ববঙ্গে ক্ষমতা দখল ১৯৫৪ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে দিল।

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ মিঃ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। মৌলানা ভাসানী নতুন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন, দলের নেতা প্রধান-মন্ত্রী হয়ে দলের কর্মসূচি মেনে চলছেন না।

১৩ই সেপ্টেম্বর ঢাকা পল্টন ময়দানে সুবিশাল সভা অনুষ্ঠিত হল যে সভার সভাপতি মৌলানা ভাসানী এবং প্রধান বক্তা ছিলেন সোহরাওয়াদী। মৌলানা ভাসানী বললেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি পূর্ব পাকিস্তানকে উপযুক্ত খাদ্য না দেয় এবং স্বাধীন গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে না পারে তাহলে সরকারকে পুনরায় পদত্যাগ করতে হবে। ভাসানীর সমালোচনায় সোহরাওয়ার্দী সেদিন খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কিন্তু খুব বেশী জবাব সেদিন দিতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর বিরোধ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। এই দুই নেতার বিরোধের মাঝে দাঁড়িয়ে একজন মাত্র নেতা প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন যাতে সোহরাওয়ার্দী ভাসানীকে এক মঞ্চে রাখা যায়, এই দুই প্রতিভাবানকে বাংলাদেশের তথা পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে নিয়োগ করা যায়।

এই সময় বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সরকারকে উত্যক্ত করে তুলেছিল কিন্তু সেখানেও মুজিবুরের দৃঢ়তায় সেই দাঙ্গা দমন হয়েছিল খুবই তাড়াতাড়ি। ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভায় যুক্ত নির্বাচনী বিল আনা হয়। এই বিলকে সমর্থন করে মুজিবুরের বক্তৃতা আজ আবার নতুন করে স্মরণ করা দরকার।

"Saikh Mujibur Rahman supporting the joint electorate motion said that the opposition move to press for separate electorates on the basis at the two nation theory would drive the minorities to a position from where they could justifiably demand a separate homeland within pakistan. He also regretted that the post of the head of the state in pakistan should be reserved for Muslims only. He said such a communal provision in the constitution might have repercussions in India where parties like the Hindu Mahasabha might start a movement to demand reservation of the post of president of India for Hindus only. Such a movement would not be a happy one for the forty millions of Indian Muslims.

[Eclipse of East Pakistan]

সেদিন বিধান সভায় দর্শক গ্যালারী পূর্ণ ছিল আর বিধান সভার বাইরে ছিল হাজার হাজার মানুষ। মুজিবুর রহমানের বক্তৃতার পর অ্যাসেম্বলির গ্যালারি থেকে ধ্বনি উঠল, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই,

আতাউর মুজিবুর জিন্দাবাদ। পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভায় এই যুক্তনির্বাচনী গৃহীত হবার পর প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান রাজনীতিতে যে নূতন ভাবধারা প্রবর্তিত হল তাই থেকেই মৃত্যু ঘনিয়ে এল পাকিস্তান সৃষ্টির দ্বি-জাতি তত্ত্ব ফর্মূলা। এই ভাবধারা প্রাণবন্যা সৃষ্টির মূল ঋত্বিক ছিলেন মুজিবুর রহমান। ফজলুল হক গভর্নর আবুল হাসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে যে শাসন ব্যবস্থা চলছিল সেটা মূলত ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম লীগেরই নীতিবাহী। তখনই মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন সরকার গঠনের চেষ্টায় ব্রতী হন। এবং মুজিবুরের চেষ্টাতেই কংগ্রেস ও আওয়ামী লীগের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজিবুর এই চেষ্টা চালিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর সাহায্য ব্যতিরেকে। শুধু সরকার দখলের চেষ্টাই নয়, রাজ্যব্যাপী অনাহারী মানুষদের সংগঠিত করে বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা মুজিবুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে রয়েছে। ১৯৫৬ সালের ৪ঠা আগস্ট ভুখ্ মিছিল এগিয়ে এল ঢাকার পথে। দূর গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মানুষ পায়ে হেঁটে নৌকায় করে এসে উপস্থিত হল বুড়িগঙ্গার অপর পারে। পুলিশ আগেই ১৪৪ ধারা জারী করেছিল। জিনজিরিয়া থেকে জনতা চকবাজার পৌছলেই পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করল। ক্ষুধার্ত জনতা পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গুলি। আহত হল অনেকে, নিহত হল ৩ জন। মুজিবুর একটি যুবকের মৃতদেহ বুকে তুলে নিয়ে পুলিশের আক্রমণে বিধ্বস্ত সেই শোভাযাত্রাকে আবার সংগঠিত করে এগিয়ে চললেন। বুলেট বিদ্ধ যুবকের দেহ থেকে রক্ত ঝরে মুজিবুরের খদ্দরের পাজামা ও শার্ট ভিজে লাল হয়ে গেল।

এই খাদ্য আন্দোলনই পতন ঘটালো সরকারের। গভর্নর হক সাহেব আতাউর রহমানকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানালেন ৪ঠা সেপ্টেম্বর। কিন্তু সেইদিনই আবার গুলি চলল ভুখ্ মিছিলের

উপর। হক সাহেব জরুরী বার্তা পাঠালেন ইস্কান্দার মির্জাকে ঢাকা চলে আসবার জন্যে। ইতিমধ্যে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আর একটা শোভাযাত্রা বেরুলো দীর্ঘ ২ মাইল লম্বা। ছাত্ররা হরতাল আহ্বান করেছে এবং পর দিবস ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রা বের করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সোহরাওয়ার্দী সার্কিট হাউসে বসে বিভিন্ন দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন আই জি পুলিশ এ এইচ এম এস দোহাকে ১৪৪ ধারা তুলে নিতে অনুরোধ জানাবেন, কিন্তু মিঃ দোহা সে অনুরোধ রক্ষা করলেন না। মিঃ দোহা মিঃ সোহরাওয়াদীর এক কালের অতি অনুগত পুলিশ অফিসার ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ সালের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন দোহা। অবশ্য পরে মিঃ হামিদ আলি সহ মিঃ দোহা নতিস্বীকার করেছিলেন সোহরাওয়ার্দীর কাছে। শহর থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নিতে হয়েছিল। ১৪৪ ধারা মুক্ত শহরে সুবিশাল শোভাযাত্রা বেরুলো। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন মৌলানা ভাসানী ও মুজিবুর রহমান।

৬ই সেপ্টেম্বর- ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হল। ৬ জন মন্ত্রী শপথ নিলেন। মুজিবুর রহমান মন্ত্রী হলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলী যখন পদত্যাগ করেন তখন ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনারের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ বলদেব প্রসাদের বাড়ীতে সোহরাওয়ার্দী এক নৈশ মজলিসে ছিলেন। সংবাদ শুনে মুজিবুর রহমান বললেন "The opportunity has come when Allah could save the country form bureaucracy." রাত্র ৯টায় সোহরাওয়ার্দী ইস্কান্দার মির্জার পাশে বসে তেজগাঁও বিমান বন্দর থেকে করাচীর পথে রওনা হলেন কিন্তু যাবার আগে ভুলে গেলেন মৌলানা ভাসানীর কথা। বৃদ্ধ মৌলানা ভাসানী তাঁর দলের নেতা পাকিস্তানের

প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন একথা খবরের কাগজ পড়ে জেনেছিলেন। ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সাল আওয়ামী লীগের স্বুবর্ণযুগ, কারণ এই সময় থেকেই কেন্দ্র ও পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তভাবে ক্ষমতায় আসীন হল তারা।

১৭ই জানুযারী মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান ও শিল্প বাণিজ্যমন্ত্রী মুজিবুর রহমান দিল্লী এলেন। মুজিব দিল্লী এসে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে। মুজিবুর ১ শিশি সুন্দরবনের মধু উপহার দিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদকে। মুজিবুর মধু উপহার দিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতিকে, করাচীর 'ডন' পত্রিকা চিৎকার করে উঠল, কঠোর শাস্তি দিতে হবে মুজিবুরকে. উনি মধু দিয়ে ভারতের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। আতাউর রহমান দিল্লী থেকে ফিরে এসে হতাশ করে দিলেন পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতাবাদী রাজনৈতিক নেতা ও সংবাদপত্রগুলিকে। "On return from New Delhi, the chief minister, Mr. Ataur Rahman Khan, disappointed the reactionary politicians an d press by declaring on 24 January that he saw no evidence of any tension prevailing anywhere in India on the Indo-Pakistan dispute over Kashmir. He said, "in fact, we felt that there was considerable good will for Pakistan among the common people of India. In many places we were greeted with slogans like "Hindi-Pak Bhai Bhai" and "Pak-Bhart Moitree Amar Houk") [Eclipse of East Pakistan]

ইতিমধ্যে ২৬শে জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দলগুলি কাশ্মীর দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান জানতে পারলেন এইদিন শোভাযাত্রা করে ঢাকার ভারতীয় হাই

কমিশনার অফিস আক্রমণ করা হতে পারে। মুজিবুর তখন মন্ত্রী যেমন তেমনি দলেরও সম্পাদক। অত্যধিক সংকটপূর্ণ মুহূর্তে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হল। তাঁর দলের মধ্যেই ভাসানী অনুগামীরা ভারতীয় হাই কমিশনারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাবার পক্ষে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা বেরুলো। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল নেহরুর কুশপুত্তলিকা আর সেই কুশপুত্তলিকা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল ঢাকার নামকরা কিছু গুণ্ডা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন থেকে পল্টন ময়দান যাবার পথে শোভাযাত্রা যখন আমেরিকান দূতাবাসের সামনে এল তখন শোভাযাত্রায় ধ্বনি উঠল পণ্ডিত নেহরু মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। আমেরিকান দূতাবাসের কর্মচারীরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সহর্ষ বদনে শোভাযাত্রাকে অভিনন্দন জানালো, কিন্তু সমগ্র পরিস্থিতি মোকাবিলা করে মুজিবুর অবস্থা আয়ত্তে রাখলেন। সাম্প্রদায়িকতা থেকে সেই মুহূর্তে দেশকে রক্ষা করতে পারলেও মুজিবুর শেষরক্ষা করতে পারলেন না। সেই ইতিহাস পরে বলছি। তার আগে আবার একবার পিছিয়ে যেতে হবে সেই ১৯৫৪ সালের পরের ইতিহাসের গতি পথে।

মির্জাফরের বংশধর বলে পরিচিত জনাব ইস্কান্দার মির্জার কোনদিনই গণতান্ত্রিক রাজনীতি বা দলের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। কৃষক শ্রমিক দলকে পূর্ববঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করার সুযোগ দিয়ে ও কেন্দ্রে এই দলের প্রতিনিধিদের মন্ত্রিত্বে বসিয়ে (যেমন জনাব ফজলুল হক সাহেবকে) এই দলের নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র হননের ব্যবস্থা ইস্কান্দার মির্জা গভর্নর জেনারেল হিসাবে করেছিলেন। এবার প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের পর তাঁর দৃষ্টি পড়ল আওয়ামী লীগের

উপর। পূর্ববঙ্গের আওয়ামী লীগ ছিল বাঙালীর মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক এবং পশ্চিম-পাকিস্তানীদের বিভীষিকা।

ইস্কান্দার মির্জা তাঁর আওয়ামী লীগ তোষণের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই দলের নেতা শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী করে দিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানেও কৃষক-শ্রমিক দলের আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে খারিজ করে আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহামানকে দিয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান শপথ গ্রহণ করলেন। তাঁর মন্ত্রিসভায় যাঁরা যোগ দিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান—এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট মির্জা জানতেন যে তাঁর প্রধান শক্তি অবাঙালী আমলাতন্ত্র ও পাঞ্জাবী ফৌজ। তাই আওয়ামী লীগের অটোনমির দাবিতে তিনি মোটেই ভীত হননি। প্রেসিডেন্ট মির্জার ধারণা ও কূটনীতি ছিল এই যে আওয়ামী লীগকে একবার ক্ষমতার আসনে টেনে আনতে পারলেই প্রথমে কৃষক-প্রজা পার্টি এবং যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলগুলির সঙ্গে তাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে এবং ক্রমে এই বিষ ছড়িয়ে পড়বে আওয়ামী লীগের নিজের নেতৃত্ব ও সংগঠনেও। ইস্কান্দার মির্জার স্ট্র্যাটেজি আশ্চর্য-জনক ভাবে সফল হলো। তাঁর মোক্ষম চালে আওয়ামী লীগ কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

প্রেসিডেন্ট মির্জা যা চেয়েছিলেন যা ভেবেছিলেন তাই হলো। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কৃষক-শ্রমিক দলের মধ্যে চরম বিবাদ বেঁধে গেল। যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে যে গণ-ঐক্য গড়ে উঠেছিল তা ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেল। গৃহবিবাদ পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক জীবনকে কলুষিত করে তুলল। শুধু তাই নয়—আওয়ামী লীগের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল।

আওয়ামী লীগ জনসাধারণকে বার বার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এই দল পাক-মার্কিন চুক্তির বিরোধিতা করবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পাক-মার্কিন চুক্তিকে ধিক্কার জানিয়ে পূর্ববঙ্গে বহু সভা, শোভাযাত্রা এবং সম্মেলন হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েই শহিদ সোহরাবর্দী দলের এই নীতিকে অগ্রাহ্য করে পাক-মার্কিন চুক্তিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন। এর ফলে শুরু হলো ভাসানী-সোহরাবর্দী দ্বন্দ্ব। আওয়ামী লীগের দুই প্রধান মৌলানা ভাসানী ও সোহরাবর্দীর কলহ এক সময় এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছাল যে তাঁদের কথা বলা এমন কি মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গেল। চতুর সোহরাবর্দী গদীআঁটা নেতাদের বেশীর ভাগকে হাত করলেও জনতা ছিল মৌলানা ভাসানীর পক্ষে।

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর-এ মৌলানা ভাসানী স্থির করলেন যে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি তাঁর স্বগ্রাম ময়মনসিংহের কাগমারিতে একটি সম্মেলন আহ্বান করবেন। মূলত এটি একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন হলেও এখানেই হবে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী নায়ক সোহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত বোঝাপড়া।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে একটি ঘোষণায় মৌলানা ভাসানী কাগমারির পথের ইঙ্গিত দিলেন। একটি ঘোষণায় তিনি বলেন যে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে অসংখ্য পূর্ব-বঙ্গবাসী তাঁর কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন। তাঁদের অভিযোগগুলির মধ্যে প্রধানত ছিল :

(ক) যুক্তফ্রণ্টের ঐতিহাসিক একুশ দফার অন্যতম দাবি পূর্ব-বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী সরকার চেষ্টা করছে না কেন ?

(খ) বাঙালীদের উপেক্ষা করে কেন শুধু পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিদেশে দূত করে পাঠানো হচ্ছে।

(গ) সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালীদের সংখ্যা শতকরা মাত্র চারজন।

পূর্ব পরিকল্পনামত মৌলানা ভাসানী কাগমারিতে জনাব সোহরাবর্দীর সঙ্গে শেষ পাঞ্জা কষবার আয়োজন করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ যাতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য সারা পৃথিবীর সাংবাদিকদের সঙ্গে বিদেশী দূতাবাসগুলিকেও মৌলানা ভাসানী এই সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর এই সম্মেলনের তিনি নামকরণ করেছিলেন আফ্রো-এশিয়ান সাংস্কৃতিক সম্মেলন। সামগ্রিকভাবে এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলি যে কোন রকমের যুদ্ধ-জোটের বিরোধী। অথচ পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাবর্দী যুদ্ধ-জোটের পক্ষে ওকালতির একজন বড় কৌঁসুলী। রাজনীতির ক্ষেত্রে সোহরাবর্দীকে নাস্তানাবুদ করতে হলে তাঁকে এরকমই একটি আসরে এনে নামিয়ে দিতে হয়। কাগমারি সম্মেলনের নাম আফ্রো-এশিয়ান সাংস্কৃতিক সম্মেলন করার পিছনে মৌলানা ভাসানীর তেমনি একটা উদ্দেশ্য হয়ত ছিল।

তবে ঐতিহাসিক কাগমারি সম্মেলনে মৌলানা ভাসানীর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একেবারে স্পষ্ট। তিনি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মবিদ্বেষ, ঘৃণার উর্ধ্বে দাঁড়ানো মানবতাবাদী নায়ক। যে সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, কাগমারিতে ভাসানী যেন সেই ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

এই মানবতাবাদী, এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই টাঙ্গাইল থেকে কাগমারি পর্যন্ত সড়কের উপর যে সব তোরণ নির্মিত হয়েছিল তার সঙ্গে তিনি কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্নাহ, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, লেলিন, শেক্সপিয়ার, আব্রাহাম লিংকন প্রভৃতির নাম যুক্ত করেছিলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। শোনা গেল যে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নয়, অখণ্ড বাংলার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসাবে

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামেও তিনি একটি তোরণের নামকরণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর উপদেষ্টাদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত মৌলানা ভাসানী এ সংকল্প ত্যাগ করেন।

মৌলানা ভাসানী নিজেই এই সম্মেলনকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন—কাগমারির সড়ক,—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার সড়ক।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পশ্চিম বাংলা থেকেও একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল কাগমারি সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন প্রখ্যাত কথাসাহিতিাক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম বাংলার অন্যতম অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীহুমায়ুন কবীর ইত্যাদি বাংলা-দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের দিকপালরা।

(১৯৫৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কাগমারিতে স্থানীয় এক হিন্দু মহারাজার নাটমন্দিরে আওয়ামী সদস্যদের বৈঠক বসল। মৌলানা ভাসানী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমি আমার জান দিয়ে যুদ্ধ-জোটের বিরোধিতা করব। কেউ যদি আমাকে দিয়ে জোর করে এ চুক্তি মানিয়ে নিতে চান তবে আমি কবর থেকেও চেঁচিয়ে বলে উঠব : না-না-না, ওই সর্বনেশে যুদ্ধ-জোটের পক্ষে আমি নই।' মৌলানা ভাসানী যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন বিদেশী পোশাকে সজ্জিত প্রধানমন্ত্রী শহিদ সোহরাওয়ার্দী পাশে বসেছিলেন—মুখ চিন্তামগ্ন, ভ্রূকুঞ্চিত। মৌলানা ভাসানী এবার সোহরাওয়ার্দীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আওয়ামী লীগের সমবেত প্রতিনিধিদের বললেন, 'আপনারা যাঁরা দলের মেরুদণ্ড, শরীরের রক্ত জল করে যাঁরা দল গড়েছেন, তাঁরা বড় না বড় এই ভদ্রলোকটি? আপনারা শহিদকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করেছেন—তাই তিনি আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আপনারা তাঁর পিছন থেকে সরে গেলে এ ভদ্রলোক-কেও সরে যেতে হবে।) তাই আপনাদের নির্দেশ পার্টির সদস্য

হিসাবে এঁকে মানতেই হবে।' মৌলানা ভাসানী বললেন : 'পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ যুদ্ধ-জোটের বিরোধিতা করে ১৯৫৩ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তারপর প্রতি বছর প্রতি অধিবেশনে সে প্রস্তাবের প্রতি জানিয়েছে দলের গভীর শ্রদ্ধা। আওয়ামী লীগ আজ তাই সে প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়াতে পারে না।'

জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রতি একবার বক্র দৃষ্টি হেনে বৃদ্ধ মৌলানা আবার বললেন : 'এই ভদ্রলোক প্রচার করছেন যে তাঁর হাতে পড়ে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নাকি অনেকখানি সফল হয়েছে। কাশ্মীর প্রশ্ন তিনি নাকি আবার তাজা করে তুলেছেন। কথার উপর ট্যাক্স নেই। অনেক লোকে কথা বলতে পারেন, তার জন্যে ট্যাক্সকড়ি লাগে না। এই ভদ্রলোকও তেমনি বাক্যব্যয় করেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ শক্তিগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আফ্রো-এশিয়ান জাতি গোষ্ঠীর বিশ্বাস হারানোর নাম কি পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য? নিজের ভাবনা নিজের চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে পরের ডিক্টেশনে চলার নাম কি প্রগতি? এই ভদ্রলোক কি নিজের বুকে হাত দিয়ে সেকথা বলতে পারেন? ভদ্রলোক বলেছেন, কাশ্মীর প্রশ্নটিকে তিনি আবার খুঁচিয়ে তুলেছেন। তার উত্তরে আমি যদি বলি যে এদেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে কাশ্মীর সমস্যার নাম করে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন— আমার পাশে বসা ভদ্রলোক তার কি জবাব দেবেন? সে জবাব তাঁর কাছ থেকে আপনারা দাবি করুন।'

মৌলানা ভাসানীর তীব্র কষাঘাতে বিপর্যস্ত জনাব সোহরাওয়ার্দী তখন তাঁর তূণের মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন। বললেন : 'পদত্যাগ করব।' একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান লাফিয়ে উঠে বললেন, 'স্যার, আপনাকে আমরা ছাড়ব না, ছাড়তে পারি না।'

যা হোক—ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পাকিস্তান সরকারের

বৈদেশিক নীতি ও সামরিক চুক্তির নিন্দা করে পূর্বে কাগমারী অধিবেশনে গৃহীত এবং সংসদের অধিবেশনে সমর্থিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উক্ত বৈদেশিক নীতি ও সামরিক চুক্তি লঙ্ঘনকারী যে কোন সদস্যের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দলের সভাপতি মৌলানা ভাসানীর উপর অর্পণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও সভাপতির শক্তিদানের ক্ষমতা সম্বন্ধে মৌলানা ভাসানী স্বয়ং এবং অন্যান্য সংসদ সদস্যরা আন্দোলন শুরু করেন। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর পাকিস্তান সরকারের নীতি সমর্থক খসড়া প্রস্তাবটি সদস্যরা নাকচ করে দেন।

কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-খনিজ শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তাঁকে যে কোন একটি পদত্যাগ করতে হবে ১৯৫৭ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। সংগঠনের কিছু কিছু সংশোধনের জন্য ৭ জুন আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন স্থির করা হয়। কাউন্সিল দাবি করল যে কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দানের দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিমের পার্থক্য দূর করা উচিত।

কাগমারীর দুই দিবসব্যাপী সম্মেলনের পর অবস্থার ব্যাখ্যা করার জন্য মৌলানা ভাসানী সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। এই বিবৃতির যথেষ্ট তাৎপর্য ছিল, কারণ আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ভাসানীর বিরুদ্ধে সোহরাবর্দীর পক্ষপাতী। মৌলানা বললেন, "১৯৫৬ সালের মে মাসের সিদ্ধান্ত বাতিল করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পার্টি কাউন্সিল আমাকে ক্ষমতা প্রদান করেছে যে, যে কোন সদস্য, মন্ত্রী, এম পি অথবা এন. পি এ যাই হোন না কেন তিনি যদি

পার্টির সিদ্ধান্ত অমান্য করেন তবে আমি যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব।”

মিঃ সোহরাবর্দী কাগমারী থেকে ঢাকায় এসে সোজা করাচী চলে গেলেন। পরদিন সকালে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের সময় লবিতে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বললেন, “শতকরা ৯৮ জন সদস্যই আমার সরকারের বৈদেশিক নীতি অনুমোদন করে।” এছাড়াও তিনি দাবি করেন যে সদস্যরা তাঁর প্রতি আস্থাবান এবং বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে কাউন্সিলে কোন প্রস্তাবই ওঠেনি। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের অর্থই হল পূর্ব পাকিস্তানের ৯২ শতাংশ স্বায়ত্তশাসন লাভ।

মৌলানা ভাসানীর চল্লিশ বৎসরের রাজনৈতিক জীবনে এই সময়টা খুব সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। ভারতীয় কবি লেখকদের পাকিস্তানে নিমন্ত্রণ এবং কিছু কিছু স্তম্ভ ইত্যাদির ভারতীয় নেতাদের নামে নামকরণ করা ইত্যাদি ভাসানীর বিপক্ষীয়দের কাছে বেশ বড় একটা অজুহাত হয়ে ওঠে।

মৌলানা ভাসানী বলেন, নিপীড়িত জনগণের দাবি আদায়ের সংগ্রাম যদি ষড়যন্ত্র হয় তবে কাগমারী সম্মেলনে তো প্রধানমন্ত্রী এবং উচ্চপর্যায়ের রাজনীতিক নেতারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সেখানেই একথা উত্থাপন করেন নি কেন? তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করেন প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে।

কাগমারী বিতর্ক যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে তখন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত মিঃ হোরেস এ হিল্ড্রেথ ১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা প্রেস ক্লাবে বলেন যে ‘সিটু’ চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা কোন সদস্য রাষ্ট্র—সে পাকিস্তান হলেও কমিউনিস্ট আক্রমণ ছাড়া অন্য কোন আক্রমণেই সাহায্য করতে বাধ্য নয়। মিঃ সোহরাওয়ার্দীর কাছে এটা একটা বড় আঘাত হানল।

কাগমারী সম্মেলনের পর করাচীর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সরকারের বৈদেশিক নীতি অনুমোদিত হল। এই বৈদেশিক নীতি আওয়ামী লীগের সমর্থন পায়নি আগেই বলা হয়েছে। গণতন্ত্রী এম পি মিঃ মহম্মদ আলি একাই সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধতা করার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করলেন। তিনি আওয়ামী লীগের পার্লামেণ্টারী গ্রুপের নির্দেশ নাকচ করে দিলেন। তিনি জাতীয় পরিষদে কোনপ্রকারে তাঁর বক্তব্য রাখার সুযোগ না পেয়ে অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত হয়ে ঢাকায় ফিরে গেলেন। অধিবেশনে ভোট গ্রহণের আগেই আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান করাচী ত্যাগ করেন। কেন্দ্রের কোয়ালিশনে ভাসানীর সমর্থক নামেমাত্র থাকেন। আতাউর রহমান বা মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতি খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ কোয়ালিশনের সংখ্যাগুরু শরিক রিপাবলিকান দল। এবং বিরোধী পক্ষের মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক দল ও নিজাম-ই-ইসলাম দল সকলেই ছিল মিঃ সোহরাওয়ার্দীর বৈদেশিক নীতির সমর্থক। ঢাকায় ফিরে আতাউর রহমান ও মুজিবুর রহমান বললেন যে তাঁরা মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকায় এসেছেন—পরিষদে ভোট দেওয়ার অনিচ্ছার জন্য নয়। তাঁরা বললেন, তাঁরা মিঃ সোহরাওয়ার্দীর বৈদেশিক নীতির সমর্থক।

৩রা এপ্রিল এক বেসরকারী অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার অধিকাংশ সদস্য পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সমর্থন করায় মৌলানার এক বিরাট রাজনীতিক জয়ের সূচনা হয়। শেষ মুহূর্তে শেখ মুজিবুর এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সমথন জানালেন। বিরোধীপক্ষের দলপতি মিঃ আবু হোসেন সরকার পর্যন্ত এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এল তীব্র বিরোধিতা। আভ্যন্তরীন

মন্ত্রী মিঃ গোলাম আলি খান তালপুর জানালেন, "কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংযুক্তির যে কোন আন্দোলনকে বজ্রকঠোর হস্তে দমন করবে।" প্রধানমন্ত্রী মিঃ সোহরাওয়ার্দী বললেন, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের এটা একটা চাল। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণ এর অর্থও বোঝে না এবং এ জাতীয় কোন আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্যও তিনি তাঁদের আহ্বান জানালেন।

কাগমারী সম্মেলনের পর মৌলানা ভাসানী বগুড়াতে এক কৃষক সম্মেলন আহ্বান করেন। তিনি বললেন, দেশে কৃষকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের ৮৫ শতাংশ ভোটেই সরকার নির্বাচিত হয়েছে। অথচ শোষণের ফলে তাদের অবস্থা অত্যন্ত হীন, জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। অতএব যদি খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বাড়তে থাকে তবে ১ জুন তারিখ থেকে তিনি অনশন করবেন। সম্মেলন শুরু হলে মৌলানা আসন গ্রহণ করার সময় তখন একটা সংঘর্ষ হয় সমবেত জনতার মধ্যে। কিছু সোহরাবর্দী-পন্থী লোক সম্মেলন পণ্ড করবার জন্য প্রশ্ন করতে শুরু করে। ইটপাটকেল ছোঁড়া শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ৯ জন আহত হয়। মৌলানা ভাসানী স্থির ও অবিচল থাকেন —বলেন, মিঃ সোহরাবর্দী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনকে 'স্টাণ্ট' বলাতে তিনি মর্মাহত হয়েছেন।

(পূর্বে স্থিরীকৃত ১ জুন থেকে মৌলানা ভাসানী দেশের দুর্ভিক্ষ ও অভাবের জন্য আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে অনশন শুরু করেন। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের মধ্যের বিভিন্ন পদ অধিকারের দ্বারা আওয়ামী লীগের ভেতর থেকে ভাসানী-পন্থী সোহরাবর্দী-বিরোধী ব্যক্তিদের বিতাড়িত করার অভিযান চালাচ্ছিলেন। ৩রা জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী সমিতির সভায় পার্টির অর্গ্যানাইজিং সেক্রেটারী মিঃ ওলি আহাদ, যিনি গত ৩১শে মার্চ থেকে মুজিবুরের

সমালোচনা করার জন্য সাসপেনডেড ছিলেন, তাঁকে ৩ বছরের জন্য পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হল।

মৌলানা ভাসানী মার্চ মাস শেষ হওয়ার আগেই আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ ত্যাগের জন্য জানিয়েছিলেন—কারণস্বরূপ তাঁর বার্ধক্যের উল্লেখ করেন। শেখ মুজিবুর এ খবর কিছুদিন গোপন রাখলেও ওলি আহাদকে বহিস্কারের পরই দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এই বহিস্কার আদেশের প্রতিবাদে উপস্থিত ২১ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন পদত্যাগ করেন।)

(দলের অভ্যন্তরে এই মতভেদের কারণ প্রকৃতপক্ষে তার মূল-ভিত্তিতে ছিল। নেতারা পার্টির আদর্শই বিস্মৃত হচ্ছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং মিঃ সোহরাবর্দীকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের মূল আদর্শের কিছু পরিবর্তন করাতে চাইছিলেন। সুতরাং বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল।

শেখ মুজিবুর রহমানের ওয়ার্কিং কমিটির ৫ই জুনের সভায় ঘোষণা করা হল ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকাতে আওয়ামী লীগের পরবর্তী বৈঠক হবে। এখানে সভাপতির ক্ষমতা হ্রাস ও ২৫ জন সদস্যকে ওয়ার্কিং কমিটিতে নেওয়ার প্রস্তাব করে দলের সংবিধান পরিবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শেখ মুজিবুর ও মৌলানা ভাসানীর বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। ঘোষণায় আরো বলা হল কাউন্সিল মিটিংয়ের শেষে মৌলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র বিবেচনা করা হবে।

৫ই এপ্রিল মৌলানা ভাসানী সাংবাদিকদের বলেন সোহরাবর্দী সাহেবের পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবিকে 'স্টান্ট' বলার জন্য তিনি মর্মাহত। সাংবাদিকদের তিনি কিছু কাগজ দেখান যা তিনি গত কয়েক বছর বহন করে বেড়াচ্ছেন। ঐ কাগজে ১৯৫৫ সালের ২৬শে এপ্রিল মিঃ সোহরাবর্দী যখন পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী ছিলেন তখনকার ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের

খসড়ায় স্বাক্ষর করেছিলেন। তাঁর স্বাক্ষরিত লেখার বয়ানটি এইরূপ: "I hereby declare that I shall try my utmost to get the 21-point of the united front programme and joint electroate by the constituent convention, so fair as the proposal affects the constitution. On failure to do so, I shall resign from the ministry."

মৌলানা ভাসানী একদা অধৈর্য হয়ে পার্টির সম্পাদক শেখ মুজিবুরকে জানালেন যে কেন্দ্রে ও পূর্ববঙ্গে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী দলের নেতারা বিশেষ করে শহিদ সোহ্‌রাবর্দী দলের আদর্শ ও একুশ দফার কার্যসূচি বার বার লঙ্ঘন করে চলেছেন, বিদেশী শক্তির সঙ্গে দেশের গাঁটছড়া বেঁধে দিচ্ছেন। কাজেই তিনি এবার নিজের পথে চলবেন, তাতে ফল যাই হোক।

১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই ঢাকার সদরঘাটে একটি সিনেমা হলে মৌলানা ভাসানীর উদ্যোগে পাকিস্তান গণতন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল। এতে যোগ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের দুই অংশের প্রায় বারশো প্রতিনিধি যাঁর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খান। এই সম্মেলনেই আওয়ামী লীগ দু-খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল। মৌলানা ভাসানীর অনুগামীরা গঠন করলেন ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টি। পূর্ববঙ্গের তরুণ ও আদর্শবান কর্মীরা আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি এই দুটি দলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল।

প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দার মির্জার দল ভাঙ্গার রাজনীতি আশাতীত ভাবে সফল হোল। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি যে শুধু বিভিন্ন দলের পরস্পরের বিবাদে কলঙ্কিত হল তাই নয়, আওয়ামী ও ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টির দ্বন্দ্বেও পূর্ববঙ্গের মানুষ ক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত ও

অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অবশ্য এই দুঃসময়ের মধ্যেও আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি অন্তত একটি মূল বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বৈপ্লবিক লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট রাখার চেষ্টায় তৎপর থাকে। এই দুটি বামপন্থী দল অবিরত বলতে থাকে যে ১৯৫৬ সালের পাক শাসনতন্ত্রে পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক অধিকার বিলুপ্ত হয়েছে, পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিম-পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছে এবং পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবি অস্বীকৃত হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের গণ আন্দোলন ও গণ সংগঠনের মেরুদণ্ড এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বিরোধী প্রবল বিক্ষোভকে সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দিতে কৃতসংকল্প ইস্কান্দার মির্জা একটির পর আরেকটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে বহাল ও বরখাস্ত করতে শুরু করলেন। (১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর তিনি সোহরাবর্দী সাহেবকে বিতাড়িত করে জনাব চুন্দ্রীগড়কে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসালেন। তের মাস গদিতে থাকার পর শহিদ সোহরাবর্দীর পতন ঘটল। সোহরাবর্দীর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট মির্জা একটি অভিযোগ খাড়া করলেন যে তিনি নাকি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।)

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলন ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তান আইনসভার অধিকাংশ সদস্য এক ইউনিট ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে গৃহীত এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে দিলেন প্রেসিডেন্ট মির্জা। এইভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশেই রাজনৈতিক সঙ্কট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সামরিক একনায়কত্ব আসন্ন হয়ে এসেছে, এই কানাঘুযো ক্রমশ প্রবল হতে থাকে। পাকিস্তানের গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক দল ও রাজনৈতিক নেতাদের জনসাধারণের অনাস্থাভাজন এবং হেয় প্রতিপন্ন করে নিজের

ডিকটেটরি শাসন কায়েম করবার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট মির্জা। পূর্ববঙ্গে কৃষক শ্রমিক দলের জনাব আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিত্বকালে একবার এবং পরে আওয়ামী লীগের জনাব আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিত্বের সময় আরেকবার খাদ্য সরবরাহ ও সীমান্তের চোরাকারবার রোধের নামে পূর্ববঙ্গের শাসনব্যবস্থা সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা সর্বশক্তিমান নন, প্রেসিডেন্টের হাতের পুতুল মাত্র।

প্রেসিডেন্ট মির্জার এ ধরনের স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখে মুসলিম লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব আবদুল কায়ুম খান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন : 'আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রেসিডেন্ট যে দেখছি সব ব্যাপারেই মাথা গলান।' পূর্ব পাকিস্তান থেকে সমস্বরে জনপ্রিয় আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান খানও তীব্র শ্লেষের সঙ্গে মন্তব্য করলেন 'আজকের দিনে পাকিস্তানের সর্বপ্রধান সমস্যা হলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা।'

ইতিমধ্যে জনাব চুন্দ্রীগড় প্রধানমন্ত্রীর গদী থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন পাঞ্জাবী জমিদার-নন্দন এবং প্রবীণ রাজনীতিবিদ মালিক ফিরোজ খাঁ নুন। ১৯৫৮ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটির পর আরেকটি নাটকীয় ঘটনা ঘটতে লাগল। এ ধরনের রাজনৈতিক উথাল পাথালের নজির সারা পৃথিবীর পরিষদীয় রাজনীতির ইতিহাসে মেলা দুষ্কর।

৩১শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন রাজ্যপাল জনাব ফজলুল হক সাহেব মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে কৃষক প্রজাদলের নেতা আবু হোসেন সরকারকে (ইনি ইতিপূর্বেও কিছুদিন পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন) মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত

করলেন। আওয়ামী মন্ত্রিসভার আকস্মিক পদচ্যুতিতে ক্ষুব্ধ শহিদ সোহরাবর্দী সেদিনই গভীর রাত্রে করাচীতে প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুনকে টেলিফোন করে ভয় দেখালেন যে আধঘণ্টার মধ্যে তিনি যদি ফজলুল হক সাহেবকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের পদ থেকে না সরান তবে তিনি কেন্দ্রে আওয়ামী দলের সদস্যদের নির্দেশ দেবেন যে তাঁরা যেন নুন মন্ত্রিসভাকে আর সমর্থন না করেন। মালিক নুন জনাব সোহরাবর্দীর ভীতি প্রদর্শনকে উপেক্ষা করতে পারলেন না, কারণ তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে আওয়ামী সদস্যদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার অর্থ হোল তাঁর পতন। তাই মালিক নুন উপায়ান্তর না দেখে জনাব সোহরাবর্দীর দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি শহিদ সাহেবের টেলিফোন পাবার চার ঘণ্টার মধ্যে জনাব ফজলুল হককে পদচ্যুত করলেন। চীফ সেক্রেটারী জনাব হামিদ আলি অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হলেন।

পরদিনই অর্থাৎ ১লা এপ্রিল জনাব হামিদ আলি মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারকে বরখাস্ত করলেন। আবু হোসেন সরকারের ১২ ঘণ্টার মন্ত্রিসভার পতন ঘটলো—শুধু ৩১শে মার্চ রাত্রিটুকু তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এতক্ষণ স্থায়ী মন্ত্রিসভার কথা ইতিপূর্বে আর কেউ শুনেছেন কিনা জানি না।

এর পরই অস্থায়ী রাজ্যপাল জনাব হামিদ আলি পুনরায় জনাব আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করে তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন। অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খান তাঁর হাতে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ফিরে পেলেন। ঠিক যেন আরব্যরজনীর একটি কাহিনী! কিন্তু ১৮ই জুন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আবার সংকট ঘনিয়ে এলো। পূর্ববঙ্গ বিধান সভায় সরকার পক্ষের আনা একটি প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হোল। পরদিন ১৯শে জুন আতাউর রহমান মন্ত্রিসভা পদত্যাগ

করলেন। নয়া গভর্নর জনাব সুলতানউদ্দিন আহমেদ (ইনি ইতিমধ্যে অস্থায়ী রাজ্যপাল জনাব হামিদ আলির জায়গায় স্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন)—কৃষক প্রজাদলের জনাব আবু হোসেন সরকারকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান জানালেন। রংপুরের কংগ্রেসী নেতা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী ও সিলেটের জনাব আবদুল হামিদকে নিয়ে জনাব সরকার তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। কিন্তু এই নতুন মন্ত্রিসভার তিন দিনও অতিবাহিত হয় নি—২২শে জুন শেখ মুজিবুর রহমান জনাব আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেই একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। ১৫৬—১৪২ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাবটি পাস হয়ে গেল। ভোটাভুটির সময় বিধান সভায় বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হোল। হাতাহাতি, পচা ডিম ছোড়াছুড়ি অবাধে চলল।

পরদিন ২৩শে জুন জনাব আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করলেন। ২৫শে জুন প্রেসিডেন্ট মির্জা পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভাকে সাময়িক ভাবে বাতিল করে পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন চালু করলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের শাসন চালু হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল দাবি উত্থাপন করলেন যে পরিষদীয় গণতন্ত্র অবিলম্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হোক এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।

মুসলিম লীগের সভাপতি খান আবদুল কায়ুম খান প্রেসিডেন্ট মির্জাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, শীঘ্র যদি সাধারণ নির্বাচন না হয় তবে তাঁরা রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটাবেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ৬ই জুলাই ১৯৫৮ সালে নারায়ণগঞ্জের একটি সভায় বলেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পর ১১ বছরের মধ্যে ভারতে দুটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে কিন্তু পাকিস্তানে নির্বাচনের কোন চিহ্নই নেই।

কিছুদিন পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাষ্ট্রপতি শাসন তুলে নেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুন বললেন, আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী আওয়ামী নেতা জনাব আতাউর রহমান তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেন। দলগত শক্তির পরীক্ষা দিয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভায় এমন একটি লজ্জাকর ঘটনা ঘটল যা পরিষদীয় গণতন্ত্র নষ্ট করে দিল।

পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী দল বিধান সভার স্পীকার জনাব আবদুল হাকিমকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে বদ্ধ-পরিকর হলেন। আওয়ামী নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে স্পীকার নিরপেক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও বিরোধী দল 'কৃষক প্রজা-পার্টির' প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে যাচ্ছেন। বিরোধী দলও কৃতসংকল্প হলেন যে তাঁরা বিধান সভায় এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন যাতে অ্যাসেম্বলি চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং পূর্ববঙ্গে প্রেসিডেন্টের শাসন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

২০শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় বিধান সভার অধিবেশন হল। কোরাণ পাঠ করার পর সভার কাজ শুরু হল। স্পীকার আবদুল হাকিম যখন সভাগৃহে প্রবেশ করলেন তখন সকলে তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে যথারীতি সম্মান প্রদর্শনও করলেন। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সভাকক্ষের হাওয়া গরম হয়ে উঠল। মুসলিম লীগ দলের জনাব হাশেমুদ্দিন আহমদ ৬ জন আওয়ামী সদস্যের প্রতি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এঁদের সভাগৃহে থাকার কোন অধিকার নেই। তাই স্পীকারের অবিলম্বে তাঁদের বহিষ্কার করে দেওয়া উচিত। কারণ এই ৬ জন সদস্য হলেন উকিল বা পাবলিক প্রসিকিউটার, নির্বাচনী কমিশন এঁদের নির্বাচন বাতিল করে দিয়েছিলেন কিন্তু শহিদ সোহরাওয়ার্দীর

পীড়াপীড়িতে প্রধানমন্ত্রী জনাব নুন একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে নির্বাচনী কমিশনের সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেন এবং ঐ ছয়জন আওয়ামী নেতাকে পূর্ব পাকিস্তানে বিধান সভায় তাঁদের সদস্য পদে পুনর্ববহাল করেন। শহিদ সোহরাওয়ার্দীর কথা না মেনে জনাব নুনের কোন উপায়ান্তর ছিল না, কারণ কেন্দ্রীয় পরিষদে সোহরাওয়ার্দীর প্রভাবাধীন আওয়ামী সদস্যরা যদি তাঁদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতেন তবে নুন মন্ত্রিসভার তৎক্ষণাৎ পতন ঘটত। যাই হোক স্পীকার জনাব আবদুল হাকিম বললেন যে, জনাব হাশেমুদ্দীন আহমদ যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন সে বিষয়ে তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর রুলিং দেবেন। কিন্তু স্পীকার যখন এই ঘোষণা করছিলেন তখন বিধান সভায় প্রচণ্ড হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। স্পীকার কয়েকজন সদস্যকে সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করে সমানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগলেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টির সদস্য জনাব দেওয়ান মেহবুব আলি অকস্মাৎ স্পীকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন কিন্তু স্পীকার আবদুল হাকিম এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল সদস্য ক্রুদ্ধভাবে স্পীকারের আসনের দিকে ধাবিত হলেন। তাঁরা উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলেন যে স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। সুতরাং জনাব হাকিমকে সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে। বিধান সভার সদস্যরা স্পীকারকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে সদস্যদের হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। বিধান সভার মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে গেল। হাতের সামনে যে যা পেলেন পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করতে লাগলেন—চেয়ার, টেবিল, কালির দোয়াত ইত্যাদি। মাইকগুলোকে বিধান সভার সদস্যরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। মুজিবুর রহমান এই সংঘর্ষে আহত হলেন। পরে দেখা

গেল বিধান সভার ভিতরে এই দাঙ্গা হাঙ্গামায় বহু বহিরাগত অংশ নিয়েছে। কেউ কেউ দর্শকদের গ্যালারি থেকে আর বাকীরা বাইরে থেকে এসে সদস্যদের সঙ্গে মিশে গেছে। বিশৃঙ্খল অবস্থা আয়ত্তের মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়ে স্পীকার আবদুল হাকিম সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলি স্পাকারের আসনের দিকে এগিয়ে এলেন কিন্তু পরে কি ভেবে তিনি আর অগ্রসর হলেন না—তিনি মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের পাশে দাঁড়িয়ে সভার কাজ চালাতে লাগলেন। কংগ্রেস সদস্য শ্রীপিটার পল গোমেজ স্পীকার আবদুল হাকিমকে বদ্ধ উন্মাদ ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব আনলেন। অধিকাংশ সদস্যের ভোটে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হল। এর পরই ডেপুটি স্পীকার যখন ঘোষণা করলেন বিধান সভা পরদিন বেলা চারটার সময় আবার বসবে তখন প্রচণ্ড কোলাহলে সভাকক্ষ ফেটে পড়ল। ফরিদপুরের স্বনামখ্যাত জননেতা কৃষক-প্রজা দলের জনাব ইয়ুসুফ আলি চৌধুরী জনাব শাহেদ আলির দিকে উত্তেজিত ভাবে এগিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সরকার পক্ষের সদস্যরা জনাব ইয়ুসুফ আলি চৌধুরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তাল সামলাতে না পেরে ভূলুণ্ঠিত হলেন।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার স্পীকার আবদুল হাকিমের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করলেন—এতে জনাব হাকিম সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হলো।

২১শে সেপ্টেম্বর স্পীকারের প্যানেলভুক্ত সৈয়দ আজিজুল হক সভার কাজ পরিচালনা করলেন। সেদিন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার দুজনেই অনুপস্থিত ছিলেন। বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যতদিন না নতুন স্পীকার নির্বাচনে সফল হন ততদিন স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার কেউই অ্যাসেম্বলিতে আসবেন না। সরকারী দল, আওয়ামী লীগ ও বিরোধী পক্ষ কৃষক প্রজা

পার্টি নতুন স্পীকার নির্বাচনের বিষয় মতৈক্যে আসতে পারলেন না। কৃষক-প্রজা পার্টি বুঝতে পারল বিধান সভায় তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কোন আশা নেই, তাই তারা স্থির করল বিধান সভায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করবে যাতে প্রেসিডেন্টের শাসন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। আওয়ামী বিদ্বেষ এতো প্রবল হয়েছিল যে তারা গভর্নমেন্টের চেয়ে প্রেসিডেন্টের শাসন শ্রেয়তর মনে করেছিল।

২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকা শহরের পরিস্থিতি থমথমে হয়ে উঠল। শহরের সাধারণ মানুষের চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। বিধান সভার প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের পঞ্চাশ জন সৈনিক ও তাদের অফিসারদের তৈরী রাখা হলো। এছাড়া ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ইসমাইল সাহেবকে সতর্ক করে দেওয়া হল প্রয়োজন হলে পুলিশ বাহিনী যেন এগিয়ে আসে।

বেলা তিনটার সময় বিধান সভার অধিবেশন বসল। নিদারুণ উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। রাজনৈতিক দলগুলি সাংবাদিকদের এমন ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী খানের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে কোন আলোচনা করার অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। তাই সেদিন ঢাকা বিধান সভার প্রেস গ্যালারী শূন্য ছিল। বেলা চারটের সময় ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী সভাকক্ষে প্রবেশ করে স্পীকারের আসনে উপবেশন করলেন। সরকার পক্ষ তাঁকে সেদিনের অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে স্বীকৃতি জানালেন, কিন্তু বিরোধীপক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। তাঁরা সমস্বরে দাবি জানালেন শাহেদ আলি যেন কালবিলম্ব না করে স্পীকারের আসন ত্যাগ করেন। প্রাক্তন কৃষক প্রজা সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি ভদ্রতা বোধ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আপনি যদি এই

মুহূর্তে বেরিয়ে না যান তবে আপনাকে আমরা খুন করে ফেলব। আপনার বিবি ও বাচ্চারা, আপনার সারা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে।'

কিন্তু শাহেদ আলি বিচলিত হলেন না। তিনি স্পীকারের আসনে অনড় হয়ে বসে রইলেন। এদিকে সভাকক্ষে ব্যাপক হাঙ্গামা বেঁধে গেল। সদস্যরা চেয়ার, পেপার ওয়েট, এক কথায় হাতের সামনে যা পেলেন তাই ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু করলেন। বিরোধী কৃষক প্রজা পার্টির সদস্যদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলি। সভাকক্ষের অবস্থা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন কিন্তু ঠিক কি যে ঘটছে তা উপলব্ধি করার আগেই সবেগে নিক্ষিপ্ত কোন কঠিন বস্তু তাঁকে সরাসরি আঘাত করল। শাহেদ আলী গুরুতর আহত হলেন। তাঁর ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহারা হয়ে স্পীকারের আসনে লুটিয়ে পড়লেন।

শাহেদ আলিকে সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ইতিমধ্যে ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জনাব ইসমাইল একদল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে বিধান সভা ঘেরাও করে ফেললেন—তাঁরা সভাকক্ষেও প্রবেশ করলেন। ডেপুটি স্পীকারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সরকারপক্ষ প্যানেলভুক্ত জনাব জিয়া উল হাসানকে স্পীকারের চেয়ারে বসিয়ে সভার কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সভাকক্ষের হাঙ্গামা বেড়েই চলল। পুলিশ সভাকক্ষে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সদস্যদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বেঁধে গেল। পুলিশের আই জি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অফিসাররাও মোহন মিয়া, নানা মিয়া, আবদুল লতিফ বিশ্বাস প্রভৃতি অতি উত্তেজিত সদস্যদের হাত ধরে—প্রায় বলপ্রয়োগ করে তাঁদের সভাকক্ষের বাইরে নিয়ে গেলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হল যদিও কিছু পরেই জামিনে মুক্তি দেওয়া

হয়েছিল। এই অভাবনীয় ও শোচনীয় ঘটনায় আর কারও সন্দেহ রইল না যে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

হোলও তাই। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে এল এক বিরাট পরিবর্তন।

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮। পূর্ব-পাকিস্তান বিধান সভা মুলতুবী রইল বলে গভর্নর ঘোষণা করলেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলির মৃত্যু হল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা গেল যে নাকে, চোখে ও তাঁর বুকে আঘাত ছাড়াও কয়েকটি পাঁজর চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

জনাব শাহেদ আলি সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে শহিদ হলেন।

৭ই অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী নুন দুবার তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা গড়ে তুললেন—সেদিন তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের এক নিদারুণ সঙ্কটাকীর্ণ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। একটা সত্যিকারের ক্রাইসিস।

একই দিনে দু-দুবার মন্ত্রিসভা রদবদল করে জনাব নুন সাময়িক ভাবে বিপদকে আটকে রাখলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেন নি।

৭ই অক্টোবর কয়েকজন আওয়ামী সদস্যকে মন্ত্রিসভায় নেবার জন্য জনাব নুনকে প্রথমে তাঁর ক্যাবিনেট রি-শাফল করতে হোল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নুন সেদিন কয়েকঘণ্টার মধ্যে যে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তাতে আওয়ামী সদস্যরা বাদ পড়লেন। আওয়ামী লীগ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু তারা নুন মন্ত্রিসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলো না, কারণ তাদের গভীর আশঙ্কা হলো যে নুন মন্ত্রিসভার যদি পতন ঘটে তবে তার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রেরও অবসান ঘটবে।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যায় নুন মন্ত্রিসভার নবনিযুক্ত সদস্যদের আপ্যায়নের জন্য তাঁর করাচী বাসভবনে একটি পার্টির আয়োজন করছিলেন। পার্টি বেশ জমে উঠেছিল—নানা

রকম তরল পানীয়ের মদিরায় সমবেত অতিথিরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। রাত ক্রমশ গভীর হয়ে উঠেছিল। রাজধানী করাচীর জনকোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছিল। পথে শুধু নিশাচরীদের আনাগোনা। কিন্তু অতিথিদের ঘরে ফেরবার কোন তাড়াই যেন নেই। তাঁরা তখন নতুন করে তাঁদের পানপত্র পূর্ণ করতে ব্যস্ত। প্রেসিডেণ্ট মির্জা কিন্তু ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন—ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলেন। অতিথিদের মধ্যে যাঁরা তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা অন্যদের, যাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন একদিন-কা-উজির, একরকম টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলেন।

সেই দিনই মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক যান বাহন ও মিলিটারী বুটের আওয়াজ ঢাকা ও করাচীর সুপ্তিমগ্ন রজনীর নিস্তব্ধতাকে অকস্মাৎ খান খান করে ভেঙ্গে দিল। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রের দফতরের রাতজাগা কর্মচারীরা হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখলেন যে তাঁদের সামনে সামরিক অফিসাররা দাঁড়িয়ে পরদিন প্রভাতী সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করবার জন্য এক বিশেষ বিষয়বস্তু তাঁদের দিচ্ছেন। মুসলিম লীগ এবং ওই একই গোষ্ঠীর কয়েকটি দল ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক সংস্থার নেতাদের নিদ্রাভঙ্গ করলেন মিলিটারী অফিসাররা। তাঁদের বাড়ীতে চলল তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী। কিন্তু কেন এই তল্লাসী তা তাঁদের কাছে খুলে বলা হল না, এমন কি তাঁদের টেলিফোনও ব্যবহার করতে দেওয়া হোল না। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর তাঁদের কেউ কেউ ভাবলেন যে বোধহয় প্রেসিডেণ্টের শাসন চালু হয়েছে—তাই পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃপক্ষের এত তৎপরতা।

কিন্তু ৭ই অক্টোবরের নিশাবসানের পর যখন ৮ই অক্টোবরের প্রভাতী সূর্যের উদয় হ'ল, তখন চমকিত হয়ে স্তম্ভিত হয়ে দেশবাসী দেখল সেই দিনের সবচেয়ে বড় চাঞ্চল্যকর সংবাদ : 'MAR-

TIAL LAW PROCLAIMED THROUGHOUT PAKISTAN'—সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করা হয়েছে।)

অর্থাৎ দেশের ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর নেই, গণতন্ত্র আর নেই। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা শুধু সামরিক আইন দেশের উপর চাপিয়ে দিলেন না, তিনি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিকে ভেঙ্গে দিলেন, পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করে দিলেন।(তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল মহম্মদ আয়ুব খানকে চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটার নিযুক্ত করলেন। প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের গৃহবন্দী করে রাখা হলো এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকাংশই হলেন কারারুদ্ধ।

সামরিক শাসনের দাপট শুরু হয়ে গেছে। ৮ই অক্টোবর খুব ভোরে একটি ছোট নৌকা ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার মির্জাপুর গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত একটি খালের ধারে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। নৌকার ভিতরে লুঙ্গি ও খদ্দরের জামা পরিহিত ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধ পশ্চিমাভিমুখী হয়ে নামাজ পড়ছিলেন। ইনি পূর্ববঙ্গের কৃষক আন্দোলনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক নেতা মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। বেলা বাড়লে মির্জাপুরের রায়বাহাদুর রমদাপ্রসাদ সাহার অতিথি ভবন থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক সন্তর্পণে নৌকায় এসে উঠলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সৌকত আলী খান। ইনি মৌলানা ভাসানীকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। এই সময় ভাসানীর শরীর ভাল যাচ্ছিল না। তিনি রক্তচাপে (উচ্চ) কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই তিনি নৌকাবিহার করে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করার প্রয়াস পেতেন। এর পরে আরো কয়েকজন ব্যক্তি এলেন। তাঁরা দেশের সামরিক শাসনের সংবাদ

মৌলানার গোচরীভূত করলেন। তাঁদের গভীর আশঙ্কা হলো যে ইস্কান্দার মির্জার মিলিটারি সরকার হয়তো অচিরেই ভাসানীকে গ্রেপ্তার করবে—তাই তাঁরা মৌলানাকে আত্মগোপন করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু এই নির্ভীক বৃদ্ধ গণনেতা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন যে মিলিটারীর ভয়ে তিনি ভীত নন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। মৌলানার কথা শেষ হয়নি, এমন সময় একদল পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করল। ভাসানীকে প্রথমে কিছুদিন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাখা হলো। তারপরে ধানমণ্ডিতে একটি বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পুলিশ প্রহরার মধ্যে তিনি গৃহবন্দী হলেন।

পাকিস্তান ইণ্টারন্যাল এয়ারওয়েজের একটি সুপার কনস্টেলেশন বিমান ৭ই অক্টোবর রাত্রে করাচী ছেড়ে সারা রাত ধরে উড়ে ৮ই ভোরে ঢাকার তেজগাঁও বন্দরে এসে নামল। এই বিমানটির যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আগের দিন সন্ধ্যায় করাচীতে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খাঁ নুনের নৈশ পার্টিতে যোগ দিয়ে ঢাকায় ফিরলেন।

P I A-এর সুপার কনস্টেলেশনটির যাত্রীরা ৭ই অক্টোবর মধ্য রাত্রিতে যখন করাচী বিমান বন্দর থেকে যাত্রা করেছিলেন তখন তাঁরা পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে যে বিরাট বিপ্লব ঘটে গেল তার বিন্দুবিসর্গও আঁচ করতে পারে নি। প্লেনটি যখন তেজগাঁও-এ অবতরণ করল তখন যাত্রীরা লক্ষ্য করলেন যে বিমানঘাটি সেনা পরিবেষ্টিত। শেখ মুজিবুরের কয়েকজন সহকর্মী তাঁর সঙ্গে এয়ার পোর্টে দেখা করতে এসেছিলেন—তাঁরা বিমর্ষ বদনে শেখ সাহেবকে সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্র দেখালেন। শেখ মুজিবুর সামরিক আইনের খবর পেয়ে হতবাক হয়ে পড়লেন—কিছুক্ষণ তাঁর বাক্য সরল না। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠবার পর শেখ মুজিবুরের

আশঙ্কা হলো তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ হবার আগে তিনি তাঁর মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিলাষী হলেন—তিনি কালবিলম্ব না করে ফরিদপুর জেলায় তাঁর স্ব-গ্রাম গোপালগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

গোপালগঞ্জে মায়ের সঙ্গে মুজিবের দেখা হয়েছিল কিনা সে কথা জানা নেই, কিন্তু ১১ই অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করা হোল মুজিবকে। আটক অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে ৬টি ফৌজদারী মামলা রুজু করা হোল। গ্রেপ্তার হলেন আরও অনেকে। সারা দেশে ফৌজী শাসন চালু হল। ২৪শে অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা ১২ জন সদস্য নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন যে মন্ত্রিসভার প্রধান নিযুক্ত হলেন মহম্মদ আয়ুব খান। সেনা বাহিনীর প্রধানও থাকলেন আয়ুব খান। ২৭শে অক্টোবর সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী আয়ুব খান প্রেসিডেণ্ট মির্জার কাছে শপথ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তার ২ ঘণ্টা পরে আয়ুবের প্রেরিত একটি বিবৃতি নিয়ে হাজির হলো আয়ুবের দূত। তারপর বিদায় নিলেন মির্জা। সপরিবারে ত্যাগ করে গেলেন পাকিস্তান। আয়ুব খাঁ ক্ষমতা দখল করে নিজেকেই পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলে ঘোষণা করলেন। আয়ুব খান ক্ষমতায় এসে প্রথম দিনই পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দিলেন। শুধু রাজনৈতিক দল নয়, সভা সমিতি শোভাযাত্রা সমস্ত রকম রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ হয়ে গেল। গ্রেপ্তার হলেন সোহরাবর্দী (৩০শে জানুয়ারী ১৯৬২)। গ্রেপ্তার হলেন আবদুল গফুর খান। গ্রেপ্তার হলেন আবদুস সামাদ খান। দেড় বছর পরে মুজিবুর জেল থেকে বেরুলেন। আবার দানা বেঁধে উঠল আয়ুব বিরোধী আন্দোলন। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোহরাবর্দী সহ অন্যান্য বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় সহস্র

সহস্র ছাত্র যুবক বিক্ষোভ মিছিল বের করল। আয়ুব খানের ফটো সংগ্রহ করে পদদলিত করা হলো। তাতে থুথু দেওয়া হলো। এগিয়ে এল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। আবার রণাঙ্গনে পরিণত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ববাংলায় যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের স্মৃতিকাগৃহে পরিণত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে জিন্নাকে শুনতে হয়েছিল 'না' 'না' ধ্বনি, লিয়াকৎ আলি খানের কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের কণ্ঠের মাঝে,—সেখানে আয়ুব খান একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। (১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কার্জন হলে ভাষণ দিতে এলেন আয়ুব খান। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভেতরে বাইরে বেয়নেটধারী পুলিশ। বুকে রিভলবার গুঁজে অজস্র সাদা পোশাকের পুলিশ। কিন্তু যেইমাত্র আয়ুব খান ভাষণ দিতে উঠলেন অমনি ছাত্রদের স্লোগানে ডুবে গেল আয়ুবের কণ্ঠস্বর। ক্ষুব্ধ ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান বহু যুদ্ধ মোকাবিলা করেছেন, কিন্তু তাঁকে হল ছেড়ে যেতে হল ভাষণ না দিয়েই। আয়ুব খান হল ছেড়ে যেতেই পুলিশ বাহিনী ক্ষিপ্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্রদের ওপর, চলল নির্মম ভাবে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ। মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ রণক্ষেত্রে পরিণত হল। তিনজন ছাত্র নিহত হল পুলিশের গুলিতে। ১৭ই সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে রইল।)

১৭ই সেপ্টেম্বর ছাত্রদমনের প্রতিবাদে ২৯শে সেপ্টেম্বর সারা পূর্ববাংলায় সাধারণ ধর্মঘট ও দমন নীতি বিরোধী দিবস পালিত হল। এইদিন পল্টন ময়দানে যে সমাবেশ হয় সে সমাবেশ ছিল অবিস্মরণীয়। এই সমাবেশের সামনে ভাষণ দিলেন মৌলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আবুল কাসেম।

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ঘোষণা করেছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রের

ভিত্তিতে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিভ্রান্ত হল না। মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠল। আবার সমাবেশ হল ঢাকার পল্টন ময়দানে। পল্টন ময়দানের সভা থেকে মুজিবুর রহমান, মৌলানা ভাসানী আওয়াজ তুললেন 'মৌলিক গণতন্ত্র নয়, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার চাই।' অবস্থা বুঝে আয়ুব খান নূতন পথ ধরলেন। আয়ুব খানের বিশ্বস্ত অনুচর আবদুস সবুর খান দাঙ্গা লাগিয়ে দিলেন পূর্ববঙ্গে। খুলনার দাঙ্গায় হিন্দু নিধনের পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পূর্ববঙ্গের এই দাঙ্গা অনেক ক্ষতি করেছিল, কিন্তু একটি অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি হয়েছিল এই দাঙ্গায়। ঢাকায় দাঙ্গার মধ্যেই বেরুল একটি শান্তি মিছিল। সেই শান্তি মিছিলও দাঙ্গাকারীদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেল না। প্রাণ দিলেন কাজী রউফ ও এমদাদ খান। এর আগেই দাঙ্গাকারীদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন আমির হোসেন চৌধুরী। আমির হোসেন চৌধুরী দাঙ্গা থামাতে গিয়েছিলেন, তাঁর হাতে একটা পিস্তলও ছিল। কিন্তু তিনি নিজে মুসলমান এই পরিচয় দিয়েও সেদিন রেহাই পান নি। 'বেগতিক দেখে তুমি মুসলমান সেজেছ'—এই বলে আর একজন মুসলমান বল্লম দিয়ে বিদীর্ণ করল আমির হোসেনের বুক।

পাকিস্তানে আয়ুব খাঁর রাজত্ব যখন নখদন্তে গণতান্ত্রিক জীবনকে বিদীর্ণ করছে, আইনের নামে স্বৈরশাসনে জনজীবন স্তব্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র রূপায়িত হচ্ছে, তখন পাকিস্তানের অনেক নেতাই রাজনীতি থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে নিরাপদ জীবন যাপন করছিলেন। কেউ ব্যবসা করতে নামলেন, কেউ চলে গেলেন ওকালতি করতে, কেউ চলে গেলেন অধ্যাপনা করতে, কিন্তু মুজিবুর দেখা হয় ব্যতিক্রম। বার বার গ্রেপ্তার হয়েছেন, বার বার জেলে গেছেন, কিন্তু

রাজনীতির পথ ত্যাগ করেন নি একদিনের জন্য। সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে আসেননি এক মুহূর্তের জন্য।

(আয়ুব খাঁর বেসিক ডেমোক্রেসির ফরমুলায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। নির্বাচনে প্রার্থী হলেন আয়ুব খাঁ আর তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন ফতিমা জিন্না। মুজিবুর আয়ুবের বিরুদ্ধে শ্রীমতী জিন্নাকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে C O P গঠন করলেন। মুজিবুর হলেন শ্রীমতী জিন্নার নির্বাচনের প্রধান সংগঠক। আয়ুব খাঁ নির্বাচনে জয়ী হন বটে তবে এই নির্বাচনে যে আয়ুব বিরোধী মোর্চা গড়ে ওঠে সেটা ভবিষ্যতে আয়ুবের পতনের প্রধান কারণ হয়। আর এই মোর্চা গঠিত হয় মুজিবুরের চেষ্টাতেই।)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হবার পরই আয়ুব খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিতে শুরু করেন। এই হুমকির দুটো কারণ দেওয়া হয়। এক হল কচ্ছের রান, অপরটি হল কাশ্মীর। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ কিন্তু এই দুটো সমস্যা নিয়ে মোটেই মাথাব্যথা করতে রাজী ছিলেন না। ইত্তেফাক পত্রিকায় মিঠে কড়া কলমে প্রখ্যাত সাংবাদিক ভীমরুল লিখলেন—"বিগত ছয় বৎসরে আমরা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিয়াছি, বহু লম্ফ ঝম্ফ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যথা নিয়মেই কাশ্মীর লইয়া লম্ফ ঝম্ফ করা হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যে ভারতের বিরুদ্ধে একটা কিছু কাণ্ড বাঁধাইয়া ফেলিতেই ক্ষমতাসীনরা মনস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। বর্তমানে এই লম্ফ ঝম্ফ চরমে উঠিয়াছে এবং এমন সব কথাবার্তা বলা হইতেছে যেন বিরোধী দলগুলির জন্যই কাশ্মীরকে হাতের মুঠোয় আনা যাইতেছে না। আমাদের কথা বলিতে গেলে আমরা মনে করি, সকল প্রতিবেশীর সঙ্গেই পাকিস্তানের সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া তোলা উচিত। আমরা জানি ইতিহাসে কোন যুদ্ধই কোন সমস্যার সমাধান করে নাই। বরং প্রতিটি যুদ্ধই নূতন নূতন সমস্যার

জন্ম দিয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তাকে আমরা অবাস্তব বলিয়া গণ্য করিয়াছি।” পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যাকে অবাস্তব বলে মনে করলো সেই কাজই আয়ুব করলেন অতি নিপুণ ভাবে। কাশ্মীরে হানাদার পাঠিয়ে কাশ্মীর দখলের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই যুদ্ধ শুরু করলেন ভারতের বিরুদ্ধে। কাশ্মীর নিয়ে বাংলা দেশের মানুষের যে মাথাব্যথা অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধ করেও আয়ুব তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারলেন না। পূর্ববঙ্গের মানুষ দেখলো জরুরী অবস্থায় তারা কত অসহায়। না আছে পূর্ববঙ্গে নিজেদের রক্ষার কোন শক্তি না আছে যুদ্ধ ও যুদ্ধ-উত্তর পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সম্পদ ও রসদ। স্বাধীনতার বহু বৎসর পার হবার পরও পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষার কোন ব্যবস্থাই পাকিস্তান করে নাই। এই চিত্র প্রকট হয়ে উঠলো এবং মুজিবুর যুদ্ধের মধ্যে পূর্ববঙ্গকে বঞ্চনার আরেকটি চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরলেন। মুজিবুর বললেন, যুদ্ধ লাগলে চীন এসে তাদের রক্ষা করবে এই চুক্তি মেনে নিতে তিনি রাজী নন।

(১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারী তাসখন্দ চুক্তি হয়ে যুদ্ধ বন্ধ হল।) পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কাছে একটি প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিল—কেন এই অবাস্তব যুদ্ধ, কেন এই ভারত-বিদ্বেষ। আয়ুব খাঁ কিন্তু তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষর করেও যুদ্ধের জিগির ছাড়লেন না। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে লাহোরে তাসখন্দ চুক্তি বিরোধী এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সম্মেলনে মুজিবুরও আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন। কিন্তু মুজিবুর তাসখন্দ বিরোধী কোন আন্দোলনে অংশ নিতে অস্বীকার করেন এবং সম্মেলন ত্যাগ করে আসেন। মুজিবুর সম্মেলন ত্যাগ করে আসবার সময় জানিয়ে আসেন তিনি ভারত ও পাকিস্তানের সম্প্রীতি নীতিতেই বিশ্বাস করেন। এই সম্মেলনেই মুজিব তাঁর বিখ্যাত ছয় দফা দাবি প্রথম প্রকাশ করেন।

ছয় দফা দাবির মাধ্যমে শেখ মুজিবুর পূর্ব পাকিস্তানের আর্থিক জীবন ও কর ব্যবস্থার উপর পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবি করেন। এবং পূর্ববঙ্গের জন্য রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি করেন।

মুজিবুরের ছয় দফা দাবি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে, কিন্তু গাত্রদাহ শুরু হয় আয়ুব খাঁর। ১৯৬৬ সালের ২০শে মার্চ ঢাকায় আয়ুব খাঁ ঘোষণা করেন দেশের অখণ্ডতা বিরোধী কোন প্রচেষ্টা সমর্থন করা হবে না, দরকার হলে অস্ত্রের মুখে এর জবাব দেওয়া হবে।

কিন্তু এই একই দিনে (২০শে মার্চ ১৯৬৬) পল্টন ময়দানে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর ঘোষণা করলেন, "কোন হুমকিই জনসাধারণকে ছয় দফা দাবি থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।" তিনি বলেন, "কেবলমাত্র শক্তিশালী কেন্দ্র নয়, দেশের উভয় অংশকে সমান শক্তিশালী করতে হবে। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় দেখা গেছে শক্তিশালী কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অসহায় হয়ে পড়েছিল। কেন সংকটের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করা যায় নাই, কেন জাতীয় পরিষদে তার রাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে হয় চীনের জন্যই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে? কেন আমরা অন্যের অনুগ্রহে বেঁচে থাকবো?"

দিনে দিনে স্বায়ত্তশাসন দাবির আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। আর আয়ুব খাঁও বেসামাল হয়ে দমন নীতির প্রয়োগ শুরু করেন। মুজিবুর ছয় দফা দাবি নিয়ে রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযানে বের হলেন। সর্বত্র জনতা মুজিবের সমর্থনে এগিয়ে এল। ২১শে এপ্রিল মুজিবকে ঢাকার পথে যশোহরে গ্রেপ্তার করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি সিলেটে একটা আপত্তিকর বক্তৃতা দিয়েছেন। তাই গ্রেপ্তার করে সিলেটে পাঠানো হল মুজিবকে। সিলেটে কোর্ট থেকে মুক্তি

পাবার পরই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে ময়মনসিং পাঠানো হল। ময়মনসিংহে দায়রা জজ তাঁকে জামিনে মুক্তি দেন।

১৯৬৬ সালের ৮ই মে নারায়ণগঞ্জে এক সভায় ভাষণ দিয়ে মুজিবুর বাসায় ফেরেন। রাত্রি ১টার সময় এসে পুলিশ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হলেন শুধু মুজিব নয় আরো অনেকে। (এইখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে মৌলানা ভাসানীকে সামনে রেখে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কিন্তু শুরু থেকে ছয় দফা দাবির বিরোধিতা করে। সেইদিন মৌলানা ভাসানী যদি শেখ মুজিবুরের পাশে এসে দাঁড়াতেন, যদি মুজিব আটক হবার পর ভাসানী নেতৃত্ব দিতেন তবে পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস অন্য রকম হত। সেই ভাসানী মুজিবের পাশে এসেছিলেন, মুজিবের দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে অনেক পরে, ১৯৭১ সালে, যখন আর কোন নেতার দরকার ছিল না, জনতাই নেতৃত্বের আসন দখল করেছে। ১৯৬৬ সালে ভাসানী কিন্তু পরোক্ষে ছয় দফা দাবির বিরোধিতা করে অত্যাচারিতের পাশে না দাঁড়িয়ে স্বৈরতন্ত্রকেই সমর্থন করেছিলেন। ৭ই এপ্রিল ১৯৬১ সালে মৌলানা ভাসানী বললেন—"ছয় দফা দাবির মধ্যে অর্থ-নৈতিক মুক্তির ঘোষণা নেই তাই তাঁরা ছয় দফা দাবি সমর্থন করবেন না।" পরে মৌলানা ভাসানী স্পষ্ট কথায় বললেন, "ছয় দফা দাবির মাধ্যমে মার্কিনীদের কাজ হাসিলের চেষ্টা করা হচ্ছে—ছয় দফা দাবির মধ্যে সমাজতন্ত্রের কথা নাই, তাই ওটা সমর্থনের অযোগ্য।" অবশ্য পরে ভাসানীর আওয়ামী পার্টি তার দলের নীতি পরিবর্তন করে ছয় দফা দাবিকে অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করে—কিন্তু তখন ভাসানীর নিজের দলেও ভাঙ্গন প্রকট হয়ে উঠেছে। যা হোক, সেকথা পরে হবে।

শেখ মুজিবুরের ছ' দফা প্রস্তাব পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরে অসাধারণ সমাদর লাভ করল, কিন্তু তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হল পশ্চিম

পাকিস্তানের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্র ও রাজনীতিবিদদের কাছে। তাঁরা 'সব গেল' 'সব গেল' রব তুলে ৬ দফা প্রস্তাবকে বললেন—পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা। সরকার পরিচালিত বা সরকার সমর্থক সংবাদপত্রগুলি শেখ মুজিবুর ও তাঁর সহকর্মীদের 'stooge' বা তাঁবেদার বলে আখ্যা দিলেন। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব হুঙ্কার দিলেন এই ৬ দফা প্রস্তাব 'সার্বভৌম যুক্ত বাংলা গঠনের পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।' আয়ুব আরও বললেন, 'যারা ৬ দফা দাবি আদায়ের বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার চেষ্টা করছে তারা মূর্খের রাজ্যে বিচরণ করছে—কারণ কিছুতেই এটা হতে দেওয়া হবে না। স্বায়ত্তশাসনের দাবি যুক্তবাংলার পুরোনো ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়।' এখানেই শেষ নয়, ভারত সরকারের জন্য সহসা অপরিসীম উদ্বেগে আকুল হয়ে তাদের পক্ষেও অযাচিত ওকালতি করে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব বলে বসলেন, 'ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন করতে সক্ষম।'

পরিশেষে যথারীতি সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে আয়ুব বললেন, 'স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের হিন্দুদের হাতে তুলে দেবার একটি দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা।'

যেদিন প্রেসিডেণ্ট আয়ুব গৃহযুদ্ধের শাসানি দিচ্ছিলেন সেদিনই ঢাকা স্টেডিয়ামে বিশাল এক জনসভায় সুদীর্ঘ এক বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর তাঁর ৬ দফা প্রস্তাবের প্রতিটি ধারার তাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, এ প্রস্তাবগুলিই পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারাণ্টি এবং তাঁদের 'মুক্তির সনদ'। প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা অনুপ্রাণিত এ অভিযোগ তিনি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলেন।

পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের অবাধ শোষণের কথা উল্লেখ করে

শেখ মুজিবুর বললেন, পূর্ব-পাকিস্তান সারা দেশের ৭৫% বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে, কিন্তু নিজ উন্নয়নের জন্য তা থেকে পায় মাত্র ৩০%। ফলে প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, পূর্ব-পাকিস্তান আজ পশ্চিমা পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপনিবেশে ও অবাধ শোষণের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও জঙ্গী শাসকেরা যে শুধু নিরন্তর পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদকে শোষণ ও লুণ্ঠন করছে তাই নয়, তারা এই শোষণজাত সমস্ত মুনাফা পশ্চিমে সরিয়ে ফেলছে। শেখ সাহেব বললেন, এই কারণে তাঁর ৬ দফার অন্যতম দাবি হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পৃথক মুদ্রার প্রচলন।

শেখ মুজিবুর তাঁর ৬ দফার ৬ষ্ঠ ধারা অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, দেশরক্ষার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে যে কতটা অসহায় করে রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত প্রকট ভাবে বোঝা গিয়েছিল গত সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়।

শেখ মুজিবুর প্রশ্ন করেন যে, প্রেসিডেন্ট আয়ুব যদি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাকে এতই দুর্ভেদ্য বলে মনে করে থাকেন তবে তিনি এই উদ্বেগসঙ্কুল একশটা দিনের মধ্যে ১ দিনের জন্যও তাঁর দেশের বৃহত্তম অংশ পূর্বাঞ্চলের মাটিতে পা দিলেন না কেন?

আয়ুব সরকার এত বড় বড় বুলি আউড়েছিলেন যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করলে তাঁরা দিল্লীতে মারচ করবেন। তা যে নেহাতই শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বরতা সেটা বুঝতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের বাকি নেই—রণাঙ্গনে সত্যি যে কি ঘটেছিল তা সবাই জানে।

শেখ মুজিবুর আরও বলেন যে, জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টোর মতে চীনের হস্তক্ষেপের ভয়েই ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে সাহস পায় নি। কিন্তু ভুট্টো সাহেবের কথাই যদি সত্যি হয়

তবে কি এ কথাই মেনে নিতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষাকে একটি বিদেশী রাষ্ট্রের খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। জনাব ভুট্টো এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেন নি। (কথা ছিল যে ১৯৬৬ সালের ১৭ই এপ্রিল ঢাকায় ভুট্টো সাহেব প্রকাশ্যে এক জনসভায় শেখ মুজিবুরের মুখোমুখি হয়ে তাঁর ৬ দফা প্রস্তাবের মোকাবিলা করবেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে জনাব ভুট্টো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেন,—তিনি জানালেন জরুরী কাজের জন্য তিনি আসতে পারছেন না। শেখ মুজিবুর বললেন যে, এ মোকাবিলা সভায় যোগ দিতে ভুট্টো সাহেবের অক্ষমতা তাঁদের আন্দোলনের পক্ষে নৈতিক বিজয়েরই সূচনা করছে এবং জনগণ যে ৬ দফার পক্ষে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দাখিল করেছে।)

(আয়ুবশাহীর শত সহস্র হুমকি সত্ত্বেও পূর্ব-পাকিস্তানে ছয় দফা দাবি সহ স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। নির্ভীক নেতা শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানালেন যে, হিম্মৎ থাকলে তিনি অবিলম্বে একটি গণভোটের অনুষ্ঠান করে দেখুন যে, পূর্ব-পাকিস্তানীরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন চায় কি না। শেখ মুজিবুর আরও বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে শতকরা ৩০ জন লোকও যদি প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা করে তবে তিনি কসম খাচ্ছেন যে, তিনি চিরদিনের মতো রাজনীতি থেকে বিদায় নেবেন।)

শঙ্কিত আয়ুব পূর্ব-পাকিস্তানের এই গণ আন্দোলনের মোকাবিলা রাজনৈতিক পর্যায়ে না করে দমন নীতির পথ বেছে নিলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম চৌধুরী, সহ-সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান (রাজশাহী), শ্রমিক সম্পাদক জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজ,

আওয়ামী নেতা খোন্দকার মুস্তাক আহমদ প্রভৃতি বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীদের দেশরক্ষা বিধি অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হলো।

কিন্তু গণ আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে ও অব্যাহত গতিতে চলতেই লাগল। খাদ্যের দাবিতে ২২শে মে সারা পূর্ব-পাকিস্তানে 'খাদ্য দাবি দিবস' পালিত হলো। ৭ই জুন সারা প্রদেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল। সে সময় পূর্ব-পাকিস্তানে খাদ্য সমস্যা যে কত তীব্র রূপ ধারণ করেছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে ঢাকার সাপ্তাহিক 'জনতা পত্রিকা'র এক মন্তব্য থেকে : "দেশময় আজ হা-অন্ন হা-অন্ন রব উঠিয়াছে, আজ হাহাকার উঠিয়াছে পূর্ব-বাংলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের ঘরে।" খাদ্য দাবি দিবসে ঢাকার পল্টন ময়দানে বিশাল এক জনসভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে অবিলম্বে খাদ্য সমস্যার সমাধান ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিরোধ না করা হলে শোষিত নির্যাতিত ও নিরন্ন দেশবাসীর রুটি, রুজির দাবিতে দেশব্যাপী এক প্রচণ্ড গণ আন্দোলন গড়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়, 'দেশবাসীর অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্ম-সংস্থানের দায়িত্ব এড়াইয়া শুধুমাত্র শূন্যগর্ভ আশ্বাসের মাধ্যমে ক্ষুধার্ত জনগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায় না এবং অস্ত্র প্রয়োগের হুমকি দিয়া কোন সরকার—সে যতই শক্তিশালী হউক না কেন—অধিক দিন ক্ষমতায় টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।' ৭ই জুনের হরতালের সমর্থনে সারা পূর্ববঙ্গ জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে—অপরদিকে একে বানচাল করবার জন্য সাড়ম্বর পুলিশী তোড়জোড়, নির্বিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার ও নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা শুরু হয়।

নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ কর্মী কারারুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটি ১০ই ও ১১ই জুন অন্যতম সহ-সভাপতি জনাব নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে জুন প্রদেশব্যাপী জুলুম প্রতিরোধ

দিবস পালন এবং ১৬ই আগস্ট থেকে ব্যাপক গণ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করবার আহ্বান জানালেন।

নিপীড়নমূলক সম্ভাব্য সব পন্থায় এ আন্দোলনের প্রসার রোধ করতে ব্যর্থ হয়ে আয়ুব সরকার সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নেবার শেষ চেষ্টাও করেছিলেন বাঙালী-অবাঙালী সংঘর্ষের উসকানি সৃষ্টি করে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী জনতা এ অপচেষ্টা বিষয়ে পূর্বাহ্নেই সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

৭ই জুন দৈনিক সংবাদ মন্তব্য করেছিলেন, "হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষ বা দাঙ্গার উসকানি দিয়ে যে ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল গণ-দুশমনেরা জনগণের ঐক্যে বারে বারে ফাটল সৃষ্টি করেছে—জনতার রুটি-রুজির আন্দোলনকে বানচাল করে দিয়েছে, তেমনি বাঙালী অবাঙালী বিদ্বেষ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করেও তারা একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়াস পাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধরনের উসকানি ও প্ররোচনা-দাতারা দেশের দুশমন ও জনতার দুশমন।"

পূর্ববঙ্গের প্রগতিবাদী সংবাদপত্রগুলিও স্বৈরাচারী সরকারের রুদ্র-রোষের বলি হয়েছিল। সংবাদ বা মতামত প্রকাশে তাদের অত্যন্ত সীমিত স্বাধীনতাও হরণ করে তেসরা এপ্রিল (১৯৬৬) প্রাদেশিক গভর্নর এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে ফতোয়া দেন যে, তাঁরা নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলির উপর কোন সংবাদ, মন্তব্য, অভিযোগ বা মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না।

১। পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হানিকর কোন প্রসঙ্গ।

২। দেশের এক অংশের বা শ্রেণী বিশেষের অপর অংশকে শোষণের ও উভয় অংশের মধ্যে বৈষম্যের অভিযোগ।

৩। ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র বিক্ষোভ, ছাত্র অসন্তোষ, ছাত্র সভা ও ছাত্রদের বিভিন্নমুখী অভিযোগ ও সে সংক্রান্ত সরকারী ব্যবস্থা।

এমন কি এই নিষেধাজ্ঞার সরকারী আদেশটির খবরও কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

আগস্ট মাসের প্রথমে প্রেসিডেন্ট আয়ুব পূর্ব পাকিস্তান সফরে গেলেন। গেলেন বললে সত্যের অপলাপ হবে—সেখানকার ঘটনা প্রবাহ তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক গণ-বিক্ষোভের ভিত্তিতে বিরোধী দলগুলির যৌথ প্রচেষ্টায় একটি যুক্ত সংগ্রাম ফ্রন্ট গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে, উদ্বিগ্ন আয়ুব পূর্ব নির্ধারিত কোন কর্মসূচি ছাড়াই সপ্তাহব্যাপী এক সফরে ৬ই আগস্ট ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। মুখে তিনি যাই বলুন না কেন, পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে তাঁর মনে আশঙ্কার সীমা ছিল না।

ঢাকায় পৌঁছেই প্রেসিডেন্ট আয়ুব স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকারীদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দিয়ে তাঁদের যেমন করে হোক শায়েস্তা করবার হুমকি দিয়ে বলেন—তাঁদের বেয়াদবির ফল হতে পারে মারাত্মক।

পাকিস্তানের উভয় অংশ সমধর্মী বলে আবার সেই বস্তাপচা ধর্মের জিগীর তুলে বলেন যে, ইসলামই দুই পাকিস্তানের মধ্যে সেতু রচনা করেছে। এমন কি তাঁর জিগিরকে জোরদার করবার জন্য পয়গম্বরের নামকেও টেনে আনতে আয়ুব দ্বিধা করেন নি। এর মাত্র ৫ দিন আগে ১লা আগস্ট তাঁর মাস পয়লা বেতার ভাষণে তিনি বলেন যে, দেশের দুই অংশকে যুক্ত করার শক্তি ও সূত্র পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ-এর মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই তাঁরা লাভ করেছেন—যতদিন এই যোগসূত্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন জাতীয় একতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

শেখ মুজিবুর রহমান 'আমাদের বাঁচার দাবি ও ৬ দফা কর্মসূচি' এই নাম দিয়ে একটি ঐতিহাসিক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। এই পুস্তিকাটি ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে

হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। শেখ মুজিবুর তাঁর এই পুস্তিকায় বলেছিলেন, 'আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব পাকিস্তানে সাড়ে ৫ কোটি শোষিত ব্যথিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।'

তাঁর ৬ দফা দাবিগুলির বিশ্লেষণ করে শেখ মুজিবুর পশ্চিম পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন : 'আপনারা ঐ সব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিক বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও সব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হক্‌টা আত্মসাৎ করিতে চাই না।'

উপসংহারে মুজিবুর বলেছেন, 'কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয় বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ, দাদার মত মুরুব্বিরাই এদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি তো কোন ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়ন-মণি শেরে-বাংলা ফজলুল হককে এঁরা দেশদ্রোহী বলেছিলেন। দেশবাসী এ-ও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা শহিদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। সাড়ে ৫ কোটি পূর্ব-পাকিস্তানীর ভাল-

বাসাকে সম্বল করিয়া আমি এ কাজে যে কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু ?'

জুলুম প্রতিরোধ দিবসে চট্টগ্রামে পুলিসের গুলি চালনা

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের হুঁসিয়ারী এবং সরকার পক্ষের সবরকম প্রস্তুতি ও তৎপরতা সত্ত্বেও ১৩ই ডিসেম্বর '৬৮ সারা পূর্ব পাকিস্তান সাফল্যজনক ভাবে জুলুম বিরোধী দিবস পালন করে। যদিও আমরা পূর্ব পাকিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশী এবং সীমান্তের এপার থেকে ঢিল ছুড়লে ওপারে পড়ে, তবুও সংবাদ আদান-প্রদানে এত কড়া ব্যবস্থা রয়েছে যে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। দ্রুত সংবাদ সংগ্রহের আমাদের একমাত্র উৎস রেডিও পাকিস্তান। এবং রেডিও পাকিস্তানের স্বরূপ কারোরই অজানা নয়। আয়ুব সরকারের গুণগান এবং তোষণই তার একমাত্র কাজ। সেই রেডিও পাকিস্তান যে সংবাদ পরিবেশন করে তা প্রতিরোধে জনসাধারণের দৃঢ়তা সহজেই অনুমান করা যায়।

দুদিন গুলি

আয়ুব খানের ঢাকায় অবস্থানের কয়েক দিনের মধ্যে জনসাধারণের বিক্ষোভ দমনে পুলিশকে দুদিন গুলি চালাতে হয়েছে। এর আগে ঢাকায় গুলিবর্ষণে অন্তত পক্ষে দুজন নিহত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত সহরের সর্বত্র সামরিক বাহিনী সঙ্গিন উঁচিয়ে শান্তিরক্ষা করছে। তৎসত্ত্বেও সাতটি বিরোধী দিবস পালনে সামরিক বাহিনীর সঙ্গিন উপেক্ষা করে সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন।

সংবাদে প্রকাশ সরকার সামরিক বাহিনীর সহায়তায় যানবাহন চালু রাখার চেষ্টা করলে—জনতা সহরের বিভিন্ন স্থানে ১২খানার বেশী গাড়ি পুড়িয়ে দেয় বা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ঢাকায় সংলগ্ন শ্রমিক এলাকা নারায়ণগঞ্জ থেকেও জনতা-পুলিশের নানা ধরনের সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রামে গুলি চালনা

এইদিন সবচেয়ে গুরুতর ঘটনার সংবাদ আসে চট্টগ্রাম থেকে। এখানে পুলিশ কর্তৃক জনতার উপর দুবার গুলি চালনার ফলে অন্তত-পক্ষে ১৫ জন ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। অন্যত্র জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে। সকালের দিকে জনতা যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করলে পুলিস লাঠি চালনা করে জনতা ছত্রভঙ্গ করে এবং বাস্তব প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করে। রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ অনুসারে জনতা একটা ট্রেন আক্রমণ করলে পুলিশ গুলি চালনা করে।

গভর্নর মোনেম খানের হুঁশিয়ারী

আগের দিন সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের গভনর জনাব আবদুল মোনেম খান ঢাকা রেডিও থেকে জনসাধারণকে হুঁসিয়ার করে দেন যে, সরকার এদেশে বিশৃঙ্খলা দমনে বদ্ধপরিকর। তিনি আরো বলেন, সরকার জনসাধারণকে যে বাক্যের স্বাধীনতা দিয়েছে কোন কোন নেতা তার অসদ্ব্যবহার করছেন। সরকার তা বরদাস্ত করবে না।

এক হাজারের বেশী গ্রেপ্তার

এই বক্তৃতার অব্যবহিত পর থেকে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়। এ পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা হাজারেরও

বেশী পার হয়ে গিয়েছে। প্রতিবাদ দিবসের দিন যেসব ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তার মধ্যে আছেন কর্নেল মুক্তার হোসেন, এয়ার মার্শাল আসগর খানের প্রাইভেট সেক্রেটারী। কর্নেলকে একটা মসজিদের বাইরে গ্রেপ্তার করা হয়। এখানে এয়ার মার্শাল ও কর্নেল সংবাদপত্র রিপোর্টারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। এয়ার মার্শাল এই গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশকে বলেন।

মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী

এবারে আয়ুবের ঢাকা আগমন পুলিশী জুলুম ও রক্তের দাগে চিহ্নিত হয়ে রইল। একদিকে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী তাঁকে ঘিরে ভিড় করে, অপর দিকে জনতার বিক্ষোভে তিনি পর্যুদস্ত। আয়ুব আমলের অনেক কথাই এতদিন অজ্ঞাত ছিল। শাসক গোষ্ঠীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তা আজ জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। নিত্য নতুন নেতার আবির্ভাব হচ্ছে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক অগ্রগমনের জেহাদ চলছে।

জনতার কাতারে নেমে আসতে হবে

এ জেহাদের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে নবাগত নেতাদের ভবিষ্যৎ কার্য-কলাপের উপর। এ সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ সম্প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করতে হলে জনতার কাতারে নেমে আসতে হবে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, সাধারণ মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে এবং জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মুজিবুর যখন বন্দী, বন্দী রাজ্যের অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক নেতা, তখন রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করল পূর্ব বাংলার ছাত্র সংগ্রামী পরিষদ। ছাত্র সংগ্রামী পরিষদের ১১ দফা

কর্মসূচি, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি এবং শেখ মুজিবুরের ৬ দফা কর্মসূচি সম্মিলিত রূপ নিল ছাত্রদের আন্দোলনে। শুরু হলো প্রচণ্ড গণ আন্দোলন, যে আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে গণ বিস্ফোরণে পরিণত হলো, যে বিস্ফোরণে পতন ঘটল আয়ুব খাঁর। কিন্তু তার আগেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়ে গেছে। শেখ মুজিবুরের বিরুদ্ধে প্রচার করা হলো তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী, ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান। ষড়যন্ত্র মামলার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো। মুজিবুর মুক্তি পেলেন আর আয়ুব খাঁকে মাথা নীচু করে সেই মুজিবুরকেই আহ্বান করতে হলো গোলটেবিল বৈঠকে। কিন্তু এক নাগাড়ে নির্যাতন দমন-পীড়ন মুজিবুরের কোন পরিবর্তনই করতে পারে নি। গোলটেবিল বৈঠকে বসেও মুজিবুর বললেন, "ছয় দফা দাবি হলো পূর্ব বাংলার জনগণের দাবি, সে দাবি থেকে এক পা সরে আসতে তিনি রাজী নন।"

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ব্যর্থ হলে কবি দিলওয়ার লিখলেন :

ষড়যন্ত্র মামলা আর নেই
যেন প্রবল এক ফুৎকারে
উড়ে গেলো আকাশছোঁয়া এক
তাসের ঘর,
উড়ে গেলো গ্রহ থেকে গ্রহান্তর
প্রবল ঝড়ের মুখে তুষারকণা যেন,

আর তার 'উটপাখি' কারিগরের দল
এখন দেখো কেমন আধ্যাত্মিক যন্ত্রণায়
দুঃসময়ের বালুচরে মুখ গুঁজে
কুটিল বিবেকের শুনছে আর্তনাদ

জনগণের মিলিত নিঃশ্বাসে
ছন্দায়িত ঐতিহাসিক ঝড় ;
কম্বুকণ্ঠে সতত স্পন্দিত
অক্ষুণ্ণ বিচারকের রায় :
যে আগুন মহাহৃদয়ের উৎস,
যে আগুন পথ পায়
মহা শপথের ঘর্ষণে ঘর্ষণে,
কে আছে তেমন শক্তিমান
যে হবে তার ঘৃণ্য হন্তারক ?

(আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, তিনজন সি এস পি অফিসার ফজলুল রহমান, রুহুল কুদ্দুস খান, এম শামসুর রহমান, একজন মেজর ও তিনজন ক্যাপ্টেন সহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে সরকারী পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছে যে তাঁরা 'কমাণ্ডো স্টাইলে' হঠাৎ করে কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগারগুলো দখলে এনে পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণার চেষ্টায় ছিলেন। এমনকি তাঁরা ভারতের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের চুক্তিও করেছিলেন যে জলপথ বা আকাশপথে ভারত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য পাঠাতে বাধা দেবে এবং তাদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে। তাঁরা আরও ঠিক করেছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী পূর্ব পাকিস্তানীদের ফেরত না দিলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তানে 'জিম্মি' হিসাবে আটক রাখবেন। এই অভিযোগের সাক্ষী দিবার জন্য, ২৩২ জনকে নির্যাতন করে, ভয় দেখিয়ে, চাকরী, প্রমোশন প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। অমানুষিক নির্যাতন করে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন কামালউদ্দিন আহম্মদকে। অত্যাচারে জর্জরিত কামালউদ্দিন শেষে রাজী হয়েছিলেন সাক্ষী দিতে। কিন্তু সরকার পক্ষের প্রধান কৌঁসুলি কাদের

স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে কামালউদ্দিন এইভাবে মামলাটা কেঁচে দেবেন। স্টেটমেণ্টে যা বলেছিলেন, কোর্টে এসে ঠিক তার উল্টো বললেন। সনাক্ত করতে পারলেন না তাঁদের যাঁদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।)

২৮ জানুয়ারী। সিগন্যাল সেস।

তখন দশটা বেজে পনেরো মিনিট। শেখ মুজিবুর এসে দাঁড়ালেন আসামীর ডকে। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। বলিষ্ঠ চেহারায় দৃঢ়তা আর আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ স্পষ্ট। আদালত কক্ষে একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, "আগেও বলেছি, এখনও বলছি, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আমি চাই। পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার বিরুদ্ধে আমৃত্যু আমার আন্দোলন চলবে। কোন বুলেট বেয়নেটের সাধ্য নেই যে সেই আন্দোলনকে রোখে। ৬ দফা দাবি আদায়ের জন্য আমি লড়াই চালিয়ে যাব। প্রতিরক্ষার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়েছি। দেশের কল্যাণের জন্যই তা করেছি। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য করি নি। আমি বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। তাই তাসখন্দ ঘোষণা সমর্থন করছি। আমাকে, আমার পার্টিকে, পূর্ববাংলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষকে হেয় করবার জন্য কায়েমী শাসক আর শোষকেরা এই মামলা সাজিয়েছে। এক মুজিব যাবে, লক্ষ লক্ষ মুজিব জন্ম নেবে পূর্ববাংলায়। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে এগিয়ে যাবে রাইফেলের মুখে।

শেখ মুজিবুরের গম্ভীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে শিরায় শিরায় আগুন ধরাল। মুজিবুর সাহেব এবার সরাসরি ট্রাইবুনালের বিচার-পতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পূর্ববাংলা শোষিত হচ্ছে, চাকরি-বাকরি, উন্নয়ণ, সর্বক্ষেত্রেই পূর্বপাকিস্তানীদের প্রতি যে বৈষম্য চলছে

তা বলা কি দেশদ্রোহিতা ? ডিকটেটরের কাছে তা হতে পারে—কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে নয়। গণ-আদালতে আমি নির্দোষ। আমার আর কিছু বলার নেই।' বলে নেমে এলেন আসামীর ডক থেকে।

এবার ২নং আসামী লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'গ্রেপ্তারের পর আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিতে বলে যে, আমি শেখ মুজিবুর রহমান, ফজলুল কাদের চৌধুরী, এস এম মোর্শেদ, সি এস পি অফিসার এ এফ রহমান, শামসুর রহমান এবং আরো অনেকের নাম বলে গেল, তাঁদের চিনি এবং বলি, তাঁরা সকলে স্বাধীন পূর্ব বাংলার আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। বিবৃতিতে যেন আরো উল্লেখ করি কঙ্গো স্টাইলে বিপ্লব করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান সৈনিকদের সংঘবদ্ধ করতে বলেন আমাকে। বলি, ভারত আমাদের অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে মিস্টার ওঝার মারফৎ।

আমি এই মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করায় কর্নেল আমির ঘুসি মেরে আমার দাঁত ভেঙ্গে দেন।' লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন একটি ভাঙ্গা দাঁত দাখিল করলেন এবং বললেন, 'তাঁরা আমায় বললেন যদি আমি তাঁদের কথানুযায়ী বিবৃতি দিই তাহলে আমার অবসর গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করা হবে এবং পেনসন দেওয়া হবে। অন্যথায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আমাকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠাবে। কর্নেল আমির বললেন, তুমি সহযোগিতা না করলেও অনেকেই করবে। বেসামরিক আদালতে যদি শেখ মুজিব রেহাই পান, সামরিক আদালতে তাঁর মুক্তিলাভের চান্স নেই। মুজিবকে আমরা শেষ করব। আমাদের প্রেসিডেন্টের বড়ো শত্রু সে।

প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে

মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজী হলাম না। শেখ মুজিবুর কখনও দেশদ্রোহী হতে পারেন না। তিনি দেশপ্রেমিক। পূর্ব বাংলার সাড়ে ছয় কোটি মানুষের নেতা। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিলে আল্লা আমায় ক্ষমা করবেন না। বিবৃতি দিতে রাজী হইনি বলে আমার বিরুদ্ধে 'মিথ্যা মামলা সাজিয়েছেন সরকার।' কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাইশ পৃষ্ঠার একটি লিখিত বিবৃতিও দাখিল করলেন তিনি।

লেফটেন্যাণ্ট মোয়াজ্জেম হোসেনের পর আসামীর ডকে দাড়িয়ে স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমানের জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর উপর যে নৃশংস নির্যাতন হয়েছে মর্মস্পর্শী ভাষায় তার বিবরণ দিতে থাকেন। তিনি বললেন, '১৯৬৭ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে রাজারবাগ, পরে কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়।

১১ ডিসেম্বর রাজারবাগে নিয়ে গেল। আমি একটা কক্ষে বসে আছি। একটু বাদে কয়েক সীট টাইপ করা কাগজ হাতে দিলেন লেফটেন্যাণ্ট শরীফ। তিনি কাছে এসে টাইপ করা সীটগুলো পড়ে গেলেন। তাতে বহু আর্মি অফিসার, সি এস পি অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর নাম উল্লেখ ছিল। উল্লেখ ছিল তাঁরা কিভাবে স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠন করবার চেষ্টা করছেন। লেফটেন্যাণ্ট শরীফ আমাকে ঐ তৈরী স্টেটমেণ্ট অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি বিবৃতি দিতে বললেন। বলতে বললেন, আমি তাদের চিনি এবং ওই দলে ছিলাম।

এই মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করলাম আমি। তখন আমায় একটা নির্জন কক্ষে নিয়ে গেল। তারপর শুরু হলো নির্যাতন। নখের ভিতর পিন ঢুকিয়ে দিল। রুল দিয়ে পেটাতে লাগল একটা লোক। কাপড় জামা রক্তে সপসপে হয়ে উঠল। নাক মুখ মাথা দিয়ে রক্ত গড়াল আমার। জ্ঞান হারালাম।

বিকাল চারটার সময় জ্ঞান ফিরলে দেখলাম মেজর নাসের ঘরে ঢুকছেন। তিনি আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মিথ্যা জবানবন্দী দিতে বললেন। আমি পারব না বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রচণ্ড চড় কষালেন আমার গালে। মারপিটে আমার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকটা দিন মারপিট বন্ধ রাখল।

১৮ই ডিসেম্বর আবার শুরু হলো অত্যাচার। ন্যাংটো করে শুইয়ে রাখল বরফের মধ্যে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দশ মিনিটে শরীর জমে গেল। তখন কম্বলে জড়িয়ে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।'

পনেরো-ষোল বারেরও বেশী মেজর নাসের, কর্নেল শরীফ আমাকে মিথ্যা বিবৃতি দিতে চাপ দেন। আমি অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই বারবার আমার উপর অমনি নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়। বিবৃতি দিতে অস্বীকার করার জন্যই আমার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ আনা হয়েছে।'

এই সময় বাইরে স্লোগান ওঠে : 'শেখ মুজিবুরের মুক্তি চাই', 'মিথ্যা মামলা তুলে নাও,' 'আয়ুবশাহী ধ্বংস হোক।' গ্যালারির ভিতর থেকেও একদল ছাত্র 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ে। বাইরে এসে দেখি মিলিটারির প্রহরায় শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্ট জেলে। জনতা স্লোগান দিচ্ছে তখনো। মিলিটারিরা রাইফেলের কুঁদো দিয়ে চার্জ শুরু করে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে মিলিটারীরা চলে গেল।

সেদিনকার মতো অধিবেশন মুলতুবি রইল।

২০শে ফেব্রুয়ারী

কয়েক দিন থেকে ২৪ ঘণ্টা কারফিউ চলছে। মাঝে দু-এক ঘণ্টা বিরতি অবশ্য ছিল। কয়েক দিনের মধ্যে আজই যা একটু

বেশি সময়ের বিরতি ছিল। সকাল সাতটা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিরতি। হঠাৎ বারোটার দিকে দেখা গেল দোকানপাট ঝটাপট বন্ধ হতে শুরু হয়েছে। সাধারণ মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলছে গৃহে। বারোটার থেকে নাকি কারফিউ জারি হয়েছে। প্রেস ক্লাব থেকে ডি সি-র কন্ট্রোল রুমে ফোন করে জানা গেল ওটা একটা গুজব। পাঁচটা থেকে কারফিউ শুরু হবে। এদিকে রিক্সায় মাইক বসিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় ছাত্ররা সন্ধ্যের সময় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মশাল নিয়ে উপস্থিত থাকার ডাক দিচ্ছে। কথার ফুলকিতে আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে শিরায় শিরায়।

বিকাল চারটে থেকে মশাল আর প্ল্যাকার্ড হাতে বেরিয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। কমলাপুর, খিলগাঁও, মালিবাগ, তেজগাঁ, সারা ঢাকা শহরের লেন-বাই লেন থেকে বেরিয়ে আসছে খণ্ড খণ্ড মিছিল। কণ্ঠে স্লোগান। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার, অসংখ্য পোস্টার। প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মিছিলের পর মিছিল। মনে হচ্ছে :—

এখন একটাই রঙ—লাল।
একটাই সঙ্গীত—স্লোগান।
একটাই হাত—মিছিল।
একটাই কাগজ—পোস্টার।

যখন এদেশের মানুষের হাসিগুলো শুকিয়ে কান্নায় বিবর্তিত,
যখন এদেশের মানুষের সুরেলা কণ্ঠগুলো আর্ত চীৎকারে রূপান্তরিত,—
তখন একটা 'রঙিন ল্যাণ্ডস্কেপ' থেকে বিক্ষুব্ধ মানুষেরা বলে,
'অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচতে চাই' ;
বলে—এদেশ আমার
এ মাটি আমার—এর প্রতিটি ধূলিকণা

আমার রক্তের সাথে জড়িত।

তাই

'এ-রূপময়ী দেশের মানুষের কণ্ঠে আজ অধিকারের দাবি :

লড়াইয়ের মাঠে হারজিত আছে

থামবো কে তা' বলে ?

পোস্টার, পোস্টার, পোস্টার

মিছিল, মিছিল, মিছিল,

জনতা, জনতা, জনতা !'

ইউনিভার্সিটির কাছে দেখা গেল শুধু মানুষ আর মানুষ, প্লাকার্ড আর প্লাকার্ড। মশাল তখনও জ্বলে নি। লক্ষ লক্ষ মশাল জ্বলে উঠলে রমনার বুকে আজ এক বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি হবে। শহিদ মিনারের কাছে লক্ষ মানুষের ভিড়। শীতের সন্ধ্যা। ছায়া ছায়া হয়ে এসেছে পাঁচটার মধ্যেই। শহিদ মিনারে দাঁড়িয়ে প্রথম মশাল জ্বালাল তোফা...। তারপর একে একে জ্বালাল দীপা দাস, সাইফুদ্দিন, জামাল হায়দার, মাহবুল্লাহ, আনোয়ার হায়দার—সকলে। জ্বলে উঠল একটার পর একটা মশাল। অ্যাসেম্বলি হাউসের শেষ মাথা থেকে ইউনিভারসিটি ছাড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখা গেল আলোর ফুলকিগুলো ক্রমশ শিখা হ'ল, লক্ষ মশালের আলোয় দূর হয়ে গেল অমানিশা। লালে লাল হয়ে উঠল রমনা। সকলের চোখে মুখে আগুনের শিখাগুলো তির তির করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে রক্ত ফেটে পড়ছে লক্ষ মানুষের মুখ থেকে। হিমের শীতল বাতাস বইছে, কিন্তু বাতাসটা আর ঠাণ্ডা লাগছে না। মশালের আগুনে তেতে উঠেছে শরীর। এমন সময় খবর ছড়িয়ে পড়ল কারফিউ তুলে নেওয়া হয়েছে। মুজিবুর রহমানকেও নাকি ছেড়ে দেবে। ছাত্রনেতারা মাইকে ঘোষণা করল সে কথা। উল্লাসে ফেটে পড়ল জনতা। স্লোগান উঠল :

'শেখ মুজিবকে এনেছি
জেলের তালা ভেঙেছি।'
'জেলের তালা ভাঙব,
মণি সিংকে আনব।'
'জেলের তালা ভাঙব,
মতিয়া চৌধুরীকে আনব।'
'রাজবন্দীদের আনব
জেলের তালা ভাঙব।'
'কৃষক শ্রমিক ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ।'

শহিদ বেদী থেকে মাইকে তোফায়েলের কণ্ঠ ভেসে এলো : 'এ জয় আপনার, আমার, সকলের জয়। ঝিলাম চেনার রাভী নদীর দেশ থেকে কর্ণফুলি পদ্মা মেঘনা বুড়িগঙ্গার দেশের সাড়ে এগারো কোটি মানুষ আজ জেগে উঠেছে, বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে জয়ের গান। আয়ুব মোমেন মুসার সাধ্য নেই জনতার সেই কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়। ওদের বেয়নেট ভোঁতা হয়ে গেছে, বুলেট ছুঁড়তে হাত কেঁপে উঠছে। ওরা আজ কোটি কোটি জনতার ক্রুদ্ধ গর্জনে ভীত, সচকিত। জয় আমাদের হবেই। পথ আমাদের রুখবে কে? এগিয়ে চলুন—এগিয়ে চলুন—এগিয়ে চলার ডাক এসেছে।'

এগিয়ে চলল লাখো মশালবাহী ছাত্র জনতার মিছিল নিউ মার্কেটের দিকে। কণ্ঠে স্লোগান। শাহাবাগ হোটেল বাঁয়ে ফেলে ঢাকা ক্লাবের পাশ দিয়ে মিছিল এগিয়ে চলল। সামনে বড়ো ফোয়ারার জল লাল হয়ে গেছে রেসকোর্সের পাশের সদা ছায়াচ্ছন্ন রাস্তাটা আগুনের আলোয় আলোকিত করে এগিয়ে চলল মিছিল।

৩রা মার্চ—

সন্ধ্যের সময় এক বিশেষ বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ঘোষণা করলেন, তিনি আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না।

পরদিন দুপুরের সংবাদে হঠাৎ ঘোষণা করা হলো: আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্তরা কুর্মিটোলা সামরিক হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেছেন। মুক্তি পেয়েছে অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী আর রাশেদ খান মেনন। সন্ধ্যার পর মণি সিংকে মুক্তি দেওয়া হবে। মুক্তি দেওয়া হবে অন্যান্য রাজবন্দীদের। বিদ্যুৎবেগে খবর ছড়িয়ে পড়ল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। উল্লাসে ফেটে পড়ল সারা দেশের মানুষ। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় বাজী পুড়ল, আকাশে লাল, নীল, সবুজ নানা রঙের বেলুন উড়ল। জনতার স্রোত চলেছে শেখ মুজিবের ধানমণ্ডীর বাসায়, এগিয়ে চ. .হ রেসকোর্সের ময়দানে। সংবর্ধনা সভায় একক-দশক-শতক নয়, অজুত লক্ষ জনতা এসে হাজির হয়েছে। মুখে নতুন ফাগুয়ার নতুন গান।

জেলের তালা ভেঙেছি,
শেখ মুজিবকে এনেছি,
জেলের তালা ভেঙেছি,
রাজবন্দীদের এনেছি,
মতিয়া রাশেদ এনেছি,
জেলের তালা ভেঙেছি,
জেলের তালা ভাঙব,
মণি সিংকে আনব।

রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনার উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, আপনারা আমায় ভালবাসেন, আমি যেন সব সময় আপনাদের

ভালবাসার মর্যাদা রাখতে পারি এই একমাত্র কামনা। গোলটেবিলে যাচ্ছি ১১ দফা প্রশ্নের দাবি নিয়ে। ১১ দফা প্রশ্নের কোন আপোস নেই। মুহুর্মুহু করতালির ভিতর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মতিয়া এবং অন্যান্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীরা। সভা শেষে বিরাট জনতা চলল জেলগেটের দিকে। কণ্ঠে তাদের সাত সাগর তের নদীর গর্জন : 'জেলের তালা ভেঙেছি, রাজবন্দীদের এনেছি, জেলের তালা ভাঙব রাজবন্দীদের আনব।'

রাত আটটায় বেরিয়ে এলেন মণি সিং। মতিয়া প্রথম ফুলের মালা পরিয়ে দিল তাঁর কণ্ঠে। উল্লাসে ফেটে পড়ছে জনতা। রাতের তারাভরা আকাশে উড়ল রংবেরঙের হাউই।

[বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান—কল্‌হন]

আগরতলা মামলার বিশেষ ট্রাইবুনালে মুজিবুর রহমানের লিখিত জবানবন্দী

স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসাবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস ভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে আমাকে আমার লেখাপড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার প্রথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যমান।

১৯৫৪ সালে আমি প্রথমে প্রাদেশিক পরিষদে এবং জাতীয় বিধানসভায় সদস্য নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠন করার জন্য আমাকে ইতিমধ্যেই কয়েক বৎসর কারা নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে।

১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেপ্তার করে এবং দেড় বৎসর কাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এই ভাবে আটক রাখা কালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে, কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর কিংবা ১৯৬০-এর জানুয়ারীতে আমাকে উক্ত আটকাবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয়, মুক্তিলাভ কালে আমার উপর কিছু বিধিনিষেধ জারী করা হয়। যেমন : ঢাকা ত্যাগ করিলে আমাকে গন্তব্যস্থলের সম্বন্ধে লিখিতভাবে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরও একই ভাবে সেই বিষয় তাহাদিগকে অবগত করাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এই সময় সর্বদা ছায়ার মত আমার পিছু লাগিয়া থাকিত।

অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারীর প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন আমাকেও জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং ছয়মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং আমরা সম্মিলিত বিরোধী দলের অংশ দল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

সম্মিলিত বিরোধী দল এই সময় প্রেসিডেণ্ট পদে জনাব আয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মোহাতারেমা ফাতেমা জিন্নাকে মনোনয়ন দান করে। আমরা নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। সরকারী কর্তৃপক্ষও আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে।

১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন আমি তাহাদের অন্যতম। সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার দল ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাই। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করার জন্যও আমরা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও ইহার সকল অঙ্গের নিকট নির্দেশ প্রেরণ করি।

যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সর্বদলের সম্মেলনে আমি প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে এক যুক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করি এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম ও সাহায্য করিবার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাই। যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের প্রদেশ ভ্রমণ কালে আমি ও অন্যান্য রাজনীতি-বিদগণ আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য প্রেসিডেণ্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ, যুদ্ধকালে পূর্ব পাকিস্তান দেশের অন্য অংশ সহ এই সকল বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম কারণ আমি এবং আমার প্রতিষ্ঠান অগ্রগতির জন্য বিশ্বশান্তিতে আস্থাবান—আমরা

বিশ্বাস করি যে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা হওয়া উচিত।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান—ছয় দফা কর্মসূচিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করি। অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয় দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাতে প্রেসিডেন্ট সহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসন যন্ত্র আমাকে অস্ত্রের ভাষায়, গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি প্রদান করে ও একযোগে অর্ধ ডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি খুলনায় একটি জনসভা করিয়া যশোহর হইয়া ঢাকায় ফিরিতেছিলাম, তখন তাহারা যশোহরে আমার পথরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে এই বারের মত প্রথম গ্রেপ্তার করে।

আমাকে যশোহর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি আমার অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেন। আমি ঢাকার সদর দক্ষিণ মহকুমা প্রশাসকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জামিনে অসম্মত হন। কিন্তু মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিন বলে আমি সেইদিনই মুক্তি পাই এবং সন্ধ্যা সাতটায় নিজ গৃহে গমন করি। সেই সন্ধ্যায়ই আটটায় পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত এক বক্তৃতার উপর সিলেট হইতে প্রেরিত এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বলে আমার বাসগৃহ হইতে আমাকে গ্রেপ্তার

করে। পুলিশ সেই রাত্রেই আমাকে সিলেট লইয়া যায়। পরদিন প্রাতে আমাকে আদালতে উপস্থিত করা হইলে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিনের আবেদন বাতিল করিয়া আমাকে কারাগারে প্রেরণ করে। পরদিবস সিলেটের মাননীয় দায়রা জজ আমার জামিন্ প্রদান করেন কিন্তু আমি মুক্ত হইবার পূর্বেই পুলিশ পুনরায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে কারা দরজায়ই গ্রেপ্তার করে। এবারের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ময়মনশাহী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। সেই রাত্রে আমাকে পুলিশ পাহারাধীনে ময়মনশাহী লইয়া যাওয়া হয় এবং একই ভাবে ময়মনশাহীর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট আমার জামিন প্রদানে অস্বীকৃত হন এবং পরে মাননীয় দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে মুক্তিলাভ করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। উপরিউক্ত সকল ধারাবাহিক গ্রেপ্তারী প্রহসন ও হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে সংঘটিত হয়।

১৯৬৬ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবত আটই মে, নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করি এবং রাত্রে ঢাকায় নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করি। রাত একটার সময় পুলিশ "ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল"-এর ৩২ ধারায় আমাকে গ্রেপ্তার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহু সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি খোন্দকার মুশতাক আহাম্মদ, প্রাক্তন সহ সভাপতি জনাব মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আজিজ, পূর্ব পশ্চিম আওয়ামী লীগের প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরী সহ বহু অন্যান্য।

ইহার অল্প কয়েকদিন পরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম এন এ

প্রচার সম্পাদক জনাব মোমেন অ্যাডভোকেট, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শামসুল হক, ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হাফিজ মোহাম্মদ মুন্না, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালুদ্দীন আহাম্মদ অ্যাডভোকেট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী ক্যাপটেন মনসুর আলি, প্রাক্তন এম এন এ জনাব আমজাদ হোসেন, অ্যাডভোকেট জনাব আমিনুদ্দীন আহাম্মদ, পাবনার অ্যাডভোকেট জনাব আমজাদ হোসেন, নারায়ণ-গঞ্জ আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মুস্তাফা সারওয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মহীউদ্দিন আহাম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব মোহাম্মদুল্লাহ, অ্যাডভোকেট ও সংগ্রামী নেতা শাহ্ মোহাজ্জম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সিরাজউদ্দিন আহাম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব হাকনুর রশীদ, তেজগাঁও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি শাহবুদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা সদর উত্তর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম, ধানমণ্ডি আওয়ামী লীগ সহ সভাপতি জনাব রশীদ মোশারফ, শহর আওয়ামী লীগ কার্যালয় সম্পাদক জনাব সুলতান আহাম্মদ, অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ অস্থায়ী সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান, পাবনার অ্যাডভোকেট জনাব ইসমাইল, মোমেনশাহীর অন্যতম আওয়ামী লীগ কর্মী, ছাত্র নেতা ও শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধি ৩২ ধারার (নিষ্ঠুর অত্যাচার) বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয়। আমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ জহিরুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ করা হয়। অধিকন্তু পূর্ব পাকিস্তানের

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক 'ইত্তেফাক'কেও বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহার একমাত্র কারণ হইল যে, 'ইত্তেফাক' মাঝে মাঝে আমার প্রতিষ্ঠানের নীতিসমূহ সমর্থন করিত। সরকার ইহার ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে এবং ইহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সম্পাদক জনাব তোফাজ্জল হোসেন ওরফে মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। যুগপৎ চট্টগ্রাম মুসলিম চেম্বার অফ কমার্সের প্রাক্তন সভাপতি, চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি বলে অন্ধ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়।

আমাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের সাতই জুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রদেশব্যাপী এই হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের এগারো জন ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় আটশ লোক গ্রেপ্তার করে ও অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শই তাঁহার লোকজন এবং সরকারী কর্মচারী সমক্ষে উন্মুখভাবে বলিয়া থাকেন যে যতদিন তিনি গদীতে আসীন থাকিবেন ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেই অবগত আছেন। আটক অবস্থায় কারাকক্ষেই আমাকে বেশ কয়েকবার বিচারালয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রায় ১১ মাস আটক থাকার পর ১৯৬৮ সালের ১৭।১৮ তারিখে রাত ১টার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল-প্রয়োগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং একটি রুদ্ধকক্ষে আটক রাখে ও আমাকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্জনে রাখা হয়। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। আমাকে

খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়িতে দেওয়া হইত না। বিশ্ব হইতে সকল যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচমাস কাল আটক থাকিতে হয়। এই সময় আমাকে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করিতে হয় এবং আমাকে সকল প্রকার দৈহিক সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয় ততই উত্তম।

এই বিচারকার্য শুরু হইবার মাত্র একদিন পূর্বে, ১৯৬৮ সালের ১৮ই জুন আমি প্রথম অ্যাডভোকেট জনাব আবদুস সলাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহাকে আমার অন্যতম কৌঁসুলী নিয়োগ করি। কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। এই ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরীর সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সততার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কেঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, এক্সপোরাল আমির হোসেন, এল এস সুলতানউদ্দিন আহামেদ মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মহাফুর্জ উল্লাহ ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারীদের কখনও দেখি নাই। জনাব আহম্মদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান এই তিনজন সি এস পি অফিসারকে আমি জানি।

আমি মন্ত্রী হিসাবে সরকারী কার্য সম্পাদন কালে তাহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং তাহারাও তখন পূর্ব পাকিস্তান

সরকারের বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি তাহাদিগকে কখনও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় লিপ্ত করি নাই কিংবা ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। আমি কোনদিন লেঃ কঃ মোয়াজ্জম হোসেনের বাসগৃহ অথবা করাচিতে জনাব কামালুদ্দিনের বাসগৃহে গমন করি নাই কিংবা আমরা অথবা লেঃ কঃ মোয়াজ্জম হোসেনের অথবা করাচিতে জনাব কামালউদ্দিনের বাসগৃহে কোন সভাও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিংবা এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোন ব্যক্তির সহিত কোন আলোচনা আমার অথবা জনাব তাজুদ্দিনের বাসায় সংঘটিত হয় নাই। এই সকল ব্যক্তি কোনদিন আমার বাসগৃহে গমন করে নাই এবং আমিও ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত কাহাকেও টাকা দেই নাই। আমি কখনও ডাঃ সাঈদুর রহমান কিংবা মালিক চৌধুরীকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রে সাহায্য করিতে বলি নাই। তাহারা চট্টগ্রামের অন্যান্য শত শত কর্মীদের ন্যায় মাত্র। আমার প্রতিষ্ঠানের তিনজন সহ-সভাপতি, ৪৪ জন নির্দেশনা পরিষদ সদস্য, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং আটজন সম্পাদক রহিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রাক্তন মন্ত্রী, এম এন এ ও এম-পি এ। বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের পাঁচজন ও প্রাদেশিক পরিষদের দশজন সদস্য আমার প্রতিষ্ঠানভুক্ত। চট্টগ্রামেও আমার প্রতিষ্ঠানের জেলা ও শহর সভাপতি ও সম্পাদকগণ প্রাক্তন এম এন এ, এম পি এ, অনেক বিত্তশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ বিদ্যমান। আমি তাহাদের কাহারও নিকট কোন প্রকার সাহায্যের কথা উল্লেখ করি নাই। ইহা অসম্ভব যে আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী মালিক চৌধুরী একজন সাধারণ এল এম এফ ডাক্তার সাঈদুর রহমানকে কোন সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে পারি। ১৯৬৫ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জনাব জহুর আহাম্মদ চৌধুরীর বিরোধিতা করিবার জন্য ডাঃ

সাইদুর রহমানকে বরং আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। আমি ডাঃ সাইদুর রহমানের গৃহে কদাপি গমন করি নাই। আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, ইহা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচি রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায় বিচার চাহিয়াছিলাম—ছয় দফা কর্মসূচিতে ইহাই বিধৃত হইয়াছে। দেশের জন্য আমি যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি আমি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গণ্ডীর ভিতরে জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং এই নিমিত্ত আমাকে সর্বদাই শাসক গোষ্ঠী ও স্বার্থবাদীদের হাতে নিগৃহীত হইতে হইয়াছে। তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের জনগণের বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়।

আমার উক্তির সমর্থনে আমি মহামান্য আদালতে আরো নিবেদন করিতে চাই যে, আমাকে প্রতিহিংসাবশত এই মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া কথিত ১৮ ব্যক্তির কথা লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে, তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্র বিষয়টি বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসাবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্বরাষ্ট্র বিভাগের উক্ত প্রচারপত্র সম্বন্ধে এ কথা জানাইতে চাই যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী কর্তৃক ব্যক্তিগত ভাবে দলিল পত্র পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়া ব্যতিরেকে কোন বিভাগ হইতে

কোন প্রকার প্রচারপত্র প্রকাশ করা যায় না। এবং এবম্বিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক।

বর্তমান মামলাও উল্লিখিত নিষ্পেষণ ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। অধিকন্তু স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্রজাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। আমি কখনও এমন কিছু করি নাই কিংবা কোনদিনও এই উদ্দেশ্যে কোন স্থল, নেভি বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মচারীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই। আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।"

(মুক্তির পর শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকায় এক অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জানানো হয়। দশ লক্ষ লোকের এক জনতা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। এমন বিরাট সমাবেশ নাকি ঢাকায় স্মরণাতীত কালের মধ্যে দেখা যায় নি। এই সমাবেশে তাঁকে বঙ্গবন্ধু আখ্যা দেওয়া হয়। এই দিন থেকে মুজিবুর হলেন বঙ্গবন্ধু। শেখ মুজিবুরকে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে রাজী করাতে প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁর ব্যক্তিগত দূত হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনকে ঢাকায় পাঠান।

দেশের শত্রু বলে বর্ণিত শেখ মুজিবুরের ভাষণ ঢাকা বেতারে প্রচারিত করে জনগণকে শান্ত থাকার আবেদন করা হয়েছিল। সেই দিন ৪৯ বৎসর বয়স্ক শেখ মুজিবুরের কাছে পাকিস্তানের লৌহমানব ৬২ বছরের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁকে জবাবদিহি করতে হয়েছিল।

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ বিদায় নিলেন আয়ুব।)

কাগমারী সম্মেলনে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে যে ফাটল দেখা দেয় এবং পরিণতিতে নারায়ণগঞ্জের সম্মেলনে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে দু-টকরো হয়ে যায় এবং মৌলানা ভাসানী, মহম্মদ তোহা প্রমুখকে নিয়ে যে আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়, সেই পার্টিতেও ভাঙ্গন দেখা দিল।

প্রথমে পার্টিতে থেকে তোহা মৌলানা ভাসানীর সমালোচনা শুরু করলেন, পরে গণশক্তি নামে একটি পত্রিকা বের করে ভাসানীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করলেন। লড়াই শুরু হলো তোহার 'গণশক্তি' ও ভাসানীর 'স্বাধিকার' পত্রিকার মাধ্যমে। অবস্থা এমন এক স্তরে এলো যে ভাসানীর দল থেকে তোহাকে বের করে দেওয়া হল। কিন্তু তোহা আগে ভাগেই দল থেকে পদত্যাগ করে ভাসানীর বিরুদ্ধে না অভিযোগের শর নিক্ষেপ করলেন। ভাসানীও চুপ করে থাকলেন না, তিনিও তোহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের ফিরিস্তি প্রচার করলেন।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের 'গণশক্তি' ও 'স্বাধিকার' পত্রিকার তিনটি রিপোর্ট তুলে ধরছি। এই তিনটি রিপোর্টে দেখা যাবে একদিকে যখন মুজিবুর রহমান তাঁর ছয় দফা দাবিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন পণ লড়াইয়ে নেমেছেন, তখন মৌলানা ভাসানী ও তোহা চীন-রাশিয়া মার্কস্‌বাদ-লেলিনবাদ ও মাও সে তুং নিয়ে চুলচেরা বিতর্কে পূর্ব পাকিস্তানের সহজ রাজনীতিকে জটিল আবর্তে নিয়ে ফেলছেন।

আয়ুবের বিদায়ের পর ইয়াহিয়া খাঁ ক্ষমতায় এলেন। ক্ষমতায় এসে ইয়াহিয়া খাঁ 'এক ইউনিট' প্রথা বাতিল করে দিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যত শীঘ্র সম্ভব জন প্রতিনিধিদের হাতে তিনি

ক্ষমতা তুলে দেবেন।) কিন্তু মাঝের কয়েকটা বছরে বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। মুজিবুর জেলে থাকতেই আয়ুবশাহী শেষ চেষ্টা করেছিল শুধু মুজিবুরকে নয়, মুজিবুরের দলকে নয়, মুজিবুরের ছয় দফা দাবিকে নয়—পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে, তাদের সাংস্কৃতিক জীবন, তাদের অর্থনৈতিক জীবন, তাদের রাজনৈতিক জীবন তিলে তিলে ধ্বংস করে দিতে। রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনেও আঘাত হেনেছিলেন আয়ুব খাঁ ও তাঁর অনুচরেরা। রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ হয়েছিল। নজরুল হয়েছিলেন নিন্দিত। সুকান্ত, জীবনানন্দ দাশ হয়েছিলেন পরিত্যক্ত। কিন্তু পূর্ববাংলার মানুষ যেমন বিদ্রোহ করেছিল রাজনৈতিক বন্দিজীবনের বিরুদ্ধে, একই ভাবে বিদ্রোহ করেছিল সাংস্কৃতিক জীবনে নিপীড়নের বিরুদ্ধে। তাই তারা আয়ুবশাহীর শত লাঞ্ছনা কটূক্তি অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে পত্রপুষ্পে সাজিয়ে স্থাপিত করেছিল জনমানসে।

১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আয়ুব বিদায় নিলেন। এলেন ইয়াহিয়া খাঁ। যেভাবে ইস্কান্দার মির্জার বিদায়ের পর আয়ুব এসেছিলেন ঠিক সেইভাবেই আয়ুবের পর এলেন ইয়াহিয়া খাঁ। অনেক টাল বাহানার পর ইয়াহিয়া খাঁ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন। আওয়ামী লীগ ঠিক করল অন্য কোন দলের সাথে জোট না বেঁধে নিজের শক্তির উপরই নির্ভর করে নির্বাচনে লড়বে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মুজিবুর নিজের শক্তিতে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তাছাড়া ১৯৫৪ সালে হক সাহেব সোহরাওয়ার্দী ছিলেন, মৌলানা ভাসানীও ছিলেন এই দলে। কিন্তু আজ অনেকেই যেমন নেই তেমনি যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে ৬ দফা দাবির চেয়ে নানা মতবাদের সূক্ষ্ম তর্ক বিচারই বড় কথা। নির্বাচনী জয়লাভের জন্য যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট থাকলেও

নির্বাচনের পরে সরকার গঠন করতে ও চালাতে দলাদলির রাজনীতি প্রকট হয়ে ওঠে।

তাই মুজিব নিজের দলকে শক্তিশালী করে তুলবার কাজে ব্রতী হন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী গ্রুপ) অবশ্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। ওয়ালী গ্রুপের ধারণা ছিল কোন দলই নিজের শক্তির উপর ভিত্তি করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারবে না। তাই একদিকে ধর্মীয় রাজনীতি অপর দিকে অতি-বিপ্লবীর হাত থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মুজিবুর নিজের বিশ্বাসে অটল থাকলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার প্রতি যে অন্যায় অবিচার করে এসেছে তার বিরুদ্ধে জনমতের রায় গ্রহণই হল মুজিবুরের নির্বাচনী প্রচারের মূল কথা।

মুজিব ও আওয়ামী লীগের কথা হল পূর্ব বাংলার পাট বিক্রয় করে পাকিস্তান যে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে তার বেশীর ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ করা হয়। সামরিক কাজে বাঙালী উপযুক্ত নয়, এই অজুহাতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালীকে বিশেষ নিয়োগ করা হয় নি। পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম খণ্ডে অবস্থিত থাকায় চাকরির ব্যাপারে বাঙালীর বিশেষ কোন সুযোগ পায় নি। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কাজ করতে যাওয়া অনেক লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। পশ্চিমখণ্ডে কেন্দ্রীয় অফিসারের অফিস থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লাইসেন্স এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকেও বাঙালীরা বঞ্চিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পূর্ববাংলা রয়েছে এখনো সেই আগের মত। কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার উন্নয়নমূলক কাজে উদাসীনতা দেখিয়ে যাচ্ছেন। বন্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে পূর্ব বাংলাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন

করার জন্য বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে উদাসীন।

সরকারের অজুহাত হল যে, ভারতবর্ষের সহযোগিতা ভিন্ন পূর্ব বাংলার নদীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কাশ্মীরের সমস্যা সমাধান না হলে, ভারতবর্ষের সাথে এ সব বিষয়ে আলোচনা করা যাচ্ছে না। মুজিবুরের কথা হল যে, কাশ্মীর সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সিন্ধুনদী নিয়ে যদি ভারতের সাথে চুক্তি করা চলে তবে পূর্ববাংলার নদীগুলোর সমস্যা নিয়ে কি ভারতের সাথে আলোচনা করা সম্ভব নয়? কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে মুজিবুরের বক্তব্য হল ইসলামাবাদে আধুনিক কায়দায় নতুন রাজধানী গঠনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে কিন্তু পূর্ববাংলার সর্বনাশা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার সময় সরকারের অর্থ থাকে না। পূর্ববাংলার এই সকল সমস্যা দূর করার জন্য মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবি উত্থাপন করলেন।

এই ৬ দফা দাবিকে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ নানাভাবে সমালোচনা করেন। অনেকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ এনেছেন। এই অভিযোগের উত্তরে মুজিবুর রহমান বলেন, "বাঙালীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অতএব বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ কি ভাবে আসে? সংখ্যাগরিষ্ঠরা কি নিজেদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়?" অনেকে অভিযোগ করে বলেন যে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে এত কম ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করেছে যে পৃথিবীর কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারেরই সেই রকম ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে পাকিস্তানের মত এই রকম দুই খণ্ডে বিভক্ত কোন রাষ্ট্রও পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অভিনবত্ব যদি থাকে তবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জেগে উঠলো। "জাগো জাগো, বাঙালী জাগো", "জয় বাংলা", "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা"—ইত্যাদি শ্লোগান সেই জাগরণের সাক্ষ্য বহন করছে। অনেকে এই সব শ্লোগানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনেন। জামাতে ইসলামীর পূর্ববঙ্গের নেতা অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, পাকিস্তান শুধু মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাঙালী মানেই যারা বাংলাদেশে বাস করে অর্থাৎ সকল জাতিই। কিন্তু হিন্দু মুসলমান মিলে যদি এক জাতি হোত তবে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করা হল কেন? অর্থাৎ অধ্যাপক গোলাম আজম মুসলমান. হিন্দু, বৌদ্ধ সকলে মিলে একটি জাতির সৃষ্টি করতে পারে তা মানেন না। কিন্তু কেবল মাত্র ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গড়ে ওঠে একথা আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না। অন্য অনেক দলের সঙ্গে আওয়ামী লীগের এটাই হল মূল তফাৎ।

ইসলামের নাম করে পাকিস্তানে এতদিন যে রাজনীতি চলেছে তার আসল চেহারা পূর্ববাংলার অধিবাসীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইসলামের নাম করে পূর্ববাংলাকে তার ন্যায্য দাবি থেকে এতদিন বঞ্চিত করা হয়েছে।

বাংলার বিখ্যাত চিন্তানায়ক আবুল ফজল 'ইত্তেফাকে' লিখলেন, "আমাদের দেশের যে কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ধর্মের সেবা করছে বলে দাবি করছে, আদতে ধর্মের খেদমত বা ধর্মপ্রচার এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা। সে ক্ষমতা দখল সহজ হবে মনে করেই এসব প্রতিষ্ঠান ধর্ম বা ইসলামকে করেছে একমাত্র মূলধন। কারণ এ মূলধনের সাহায্যে ধর্মপ্রাণ জনগণকে সহজেই উত্তেজিত করে তোলা যায়, যায় বিভ্রান্ত করা।" অপর এক জায়গায় আবুল ফজল বলেন: "আমার বিশ্বাস ধর্ম আর রাজনীতি কখনো একসঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশতে পারে না।" শেখ মুজিবুর

রহমান তাঁর বক্তৃতাতে বার বার উল্লেখ করেছেন যে বাংলার দাবি যখনই উত্থাপন করা হয় তখনই একদল লোক ইসলামের নাম দিয়ে সে দাবি অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে।)

শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনের সময় প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলেন যে, প্রত্যেক নাগরিকের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, ঔষধপত্র এবং ন্যায্য বেতনে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। কিন্তু অর্থনৈতিক অবিচার দূর করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা এবং সেই উন্নতির ফলে উৎপাদিত ধন যাতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন খণ্ডে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করা হয় তার ব্যবস্থা করাই আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য। কিন্তু নতুন সমাজ যে জনসাধারণের কঠোর পরিশ্রম এব ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত গঠন করা সম্ভব নয় একথাও বলা হয়।

রাষ্ট্রের বিভিন্ন খণ্ড এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক সকলেই যাতে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারে রাজী হয়, ও সকলেই যাতে উন্নতির ফল ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করাও দলের অন্যতম উদ্দেশ্য। নিজের দলের নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ২৮শে অক্টোবর বেতার ও টেলিভিশন যোগে যে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তিনি বলেন :

"বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শোষণ ও অবিচারের যে অসহনীয় কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে অবশ্যই তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় শিল্প সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগের অধিক আজ মাত্র দু-ডজন পরিবার করায়ত্ত করেছে। ব্যাঙ্কিং সম্পদের ৮০ ভাগ এবং বীমা সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ এই দু-ডজন পরিবারের কুক্ষিগত।" দলের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন :

"জাতীয়করণের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিগুলি সহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠিগুলোকে জনগণের মালিকানায় আনা

অত্যাবশ্যক বলে আমরা বিশ্বাস করি। অর্থনীতির এসব ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন সাধিত হবে সরকারী অর্থাৎ জনগণের মালিকানায়। নতুন ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ শিল্প ব্যবস্থাপনায় ও মূলধন পর্যায়ে অংশীদার হবেন। বে-সরকারী পর্যায়ে এর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে।

একচেটিয়াবাদ ও কার্টেল প্রথার সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করতে হবে। কর-ব্যবস্থাকে সত্যকার গণমুখী করতে হবে। সৌখিন দ্রব্যাদির ব্যাপারে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে তাদেরকে উৎসাহ দিতে হবে। এ সমর্থনের জন্যে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।...সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারের শিল্প গড়ে তুলতে হবে।" পাট, তুলা ব্যবসায় জাতীয়করণের উপর তিনি উক্ত ভাষণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ভূমি বণ্টন ও কৃষি সংস্কার সম্পর্কে জোর দিয়ে তিনি বলেন: "প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গোটা কৃষি ব্যবস্থাতে বিপ্লবের সূচনা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারী জায়গীরদারী সর্দারী প্রথার অবশ্যই বিলোপ সাধন করতে হবে। প্রকৃত কৃষকের স্বার্থে গোটা ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সাধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভূমি দখলের সর্বোচ্চ সীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে দিতে হবে। নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত জমি এবং সরকারী খাস জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।"

আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। যে সমাজতন্ত্র বিশেষ পার্টির ডিক্টেটরশিপের সাথে জড়িত আওয়ামী লীগ তার ঘোরতর বিরোধী। আওয়ামী লীগ মনে করে যে সমাজতন্ত্রের নামে কোন বিশেষ নীতি, সমস্ত দেশের বিশেষ সমস্যাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতেই সেই দেশের সমাজতন্ত্রের রূপ নির্ধারিত হয়। তাই তাঁরা বলেন

যে তাঁদের সমাজতন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানী করা কোন সমাজতন্ত্র নয়, বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের জন্যই এই সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও মানবতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আওয়ামী লীগের সমাজতান্ত্রিক নীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এম আনিসুজ্জামান বলেন : "আপনাদের গভীর মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। রোজা লুকসেমবার্গের সেই বিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ রাখবেন : দৃঢ়নিষ্ঠ বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সঙ্গে গভীর মানবতাবোধের সংযোগই সমাজতন্ত্রের মূল কথা।"

অনেকে মনে করেন যে আওয়ামী লীগের নীতি পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী। কিন্তু শেখ মুজিবুর বার বার ঘোষণা করেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই। যে দু-ডজন পরিবার পাকিস্তানের অর্থনীতিকে নিজেদের স্বার্থে কুক্ষিগত করে রেখেছে তারা সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানের লোক। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার এই কয়েকটি পরিবারের স্বার্থ দ্বারাই চালিত হচ্ছে। অতএব আওয়ামী লীগের সংগ্রাম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই দু-ডজন পরিবারের নীতির বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থের কোনই বিরোধ নেই। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের উভয় খণ্ডের জনসাধারণের মঙ্গল কামনা করে। মুজিবুর রহমান যখন আয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানে যান তখন "পাকিস্তান টাইমস্" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখে, "গোল-টেবিল বৈঠকে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য কে কথা বলবে?" তার উত্তরে মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "কেন? পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আমি কথা বলব।" পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা

করেন বলেই দ্বিধাহীন ভাবে তিনি একথা বলতে পেরেছিলেন। আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি কেবল বাংলাদেশের জন্য রচিত হয় নি, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলির স্বার্থও এই নীতি দ্বারা সুরক্ষিত হবে। সিন্ধু যুক্তফ্রন্টের প্রেসিডেন্ট জনাব জি এম সৈয়দ তাঁর বেতার ভাষণে বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফার ভিত্তিতে আমরা প্রদেশ সমূহের জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করি।"

দুই বাংলার মধ্যে সহজ সম্পর্ক চাই

মুজিবুর রহমান তাঁর নির্বাচনী প্রচারে বেতার ভাষণে বলেন : "কারুর প্রতি বিদ্বেষ নয়, সকল রাষ্ট্রের সাথে, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে আমরা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানে বিশ্বাসী। আমরা মনে করি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়া উচিত। এর মধ্যে আমাদের জনগণের বৃহত্তম স্বার্থ নিহিত রয়েছে। সেজন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে বর্তমান বিরোধ সমূহের নিষ্পত্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি।" আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব বলে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

দুই বাংলার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের উপর আওয়ামী লীগ ও পূর্ববাংলার শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। দুই বাংলার মধ্যে স্বাভাবিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন, যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ব্যবস্থা সৃষ্টি করার দাবি পূর্ববঙ্গে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সেখানকার কয়েকটি সংবাদপত্র পাকিস্তান ও ভারতের বাণিজ্যিক লেন-দেন শুরু করার জন্য বহুবার সেখানকার সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন। গত ২৫শে অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলা আকাদমির ৫ম বার্ষিক সাধারণ

সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে আকাদমির সভাপতি সৈয়দ মুর্তাজা আলী পশ্চিমবঙ্গ থেকে বইপত্র আমদানী ও পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত বই বাংলার এপারে রপ্তানীর ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভায় সোসাইটির সম্পাদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ হাবিবউল্লাহও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বইপত্র আমদানীর উপর যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে তা তুলে নেবার জন্য পাক সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

রাজনীতির রথও যদি প্রকৃতির বিধান ও ভৌগোলিক পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়াল খুশীমত এগিয়ে চলতে আরম্ভ করে তবে তার ফলে মানুষের কল্যাণ সাধন তো দূরের কথা নানা প্রকার অনাসৃষ্টি ও দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এপার ও ওপার বাংলার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক যোগসূত্র বর্তমান তা অস্বীকার করে কোন বাংলার রাজনীতি সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। বিজ্ঞান সম্মত রাজনীতি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে: তাদের অস্বীকার করে নয়।

দুই বাংলার অর্থনীতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এ সম্পর্ককে অস্বীকার করার ফলে দুই বাংলার অর্থনীতিই আজ পঙ্গু। পূর্ব বাংলার মাছ যদি এপারের বাজারেও বিক্রি করা সম্ভব হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ও পূর্ববঙ্গের অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাস এই দুই সমস্যারই সমাধান হতে পারে। পূর্ব বাংলার পাট চাষীরা এখানে বিক্রি করার স্বাধীনতা পেলে তারা যেমন সহজেই পাটের ন্যায্য মূল্য পেতে পারবেন তেমনই পশ্চিমবঙ্গে ধানের বদলে পাট চাষের প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই কমে আসবে এবং তার ফলে এ বাংলার খাদ্য-সমস্যা সমাধানের পথ অনেকাংশে সহজতর হয়ে উঠবে। এই ধরনের অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপরই উভয় বাংলার সমৃদ্ধি নির্ভর করছে।

পূর্ব বাংলার চাষীর ক্রয়ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি না পায় তবে সেদেশে শিল্পের অগ্রগতি কি করে সম্ভব? সেই ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবার সহজ স্বাভাবিক উপায়কে যে অস্বীকার করে, তা আত্মঘাতী। অর্থনীতির সহজ নিয়মকে অস্বীকার করার ফলে সীমান্তে ক্রমশ চোরা কারবারের প্রসার বেড়ে চলেছে। এই তথাকথিত চোরা কারবারকে দমন করার চেষ্টা বৃথা; ব্যবসায়-বাণিজ্যের রাজপথকে উন্মুক্ত রাখাই চোরা কারবার বন্ধের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্য দেশ অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন কোন্ যুক্তিতে আমরা দুই বাংলার মধ্যে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নিজেদের রুদ্ধ কক্ষে বাস করে দিন যাপন করব? প্রত্যেক দেশের রাজনীতি জাতীয় স্বার্থ দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় তার পথ অবরোধ কেন? বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের ফলে কোন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা তো কোনদিন কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় নি। ভারত ও পাকিস্তান দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা, মতবিরোধও প্রচুর, কিন্তু সেই অজুহাতে অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি গ্রহণ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এ পথ বাঁচবার পথ নয়—এ পথ আত্ম-হত্যার পথ।

উভয় বাংলার জনকল্যাণের স্বার্থেই পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুস্থ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। দুই বাংলাতেই আজ এই দাবি সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কোন রাজনীতিই এই দাবিকে বেশি দিন প্রতিরোধ করতে পারবে না। গঠনমূলক দৃষ্টিতে এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে বাঙালী জাতিকে নূতনভাবে গড়ে তোলার দিন আজ সমাগত।

মুজিবুর রহমান রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযানে যে কয়েক হাজার বক্তৃতা দেন তার দুটি বক্তৃতা এখানে তুলে ধরছি। শেখ মুজিব রাজ্য-

ব্যাপী প্রচার অভিযান শেষ করলেন। নির্বাচনী কর্মসূচি প্রকাশ উপলক্ষে ও নির্বাচনী প্রস্তুতিতে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল ঢাকায়। সভা শুরু হওয়ার মুখে এল আকাশ ভেঙে ঝড় বৃষ্টি। ঝড়ের বেগে মঞ্চ দুলতে লাগল মাঝদরিয়ায় ঢেউয়ের নৌকোর মত। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। শুধু ঝড় নয় নেমে এল জলের ধারা। সারা ময়দানে এক হাঁটু জল হয়ে গেল কিন্তু একজন মানুষও ময়দান ছেড়ে গেল না। এই দুর্যোগ বুঝি মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে এনে দিল। প্রথম দিন সভায় ঝড় জল যেমন নির্বাচনের অনেক আগে নেমে এসেছিল, নির্বাচনের পরে সেই ঝড় জল বুঝি নেমে এল অন্য রূপে। নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন বাকি, পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল পূর্ববঙ্গে। বিগত ১০০ বছরের ইতিহাসে এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর কখনও ঘটে নি। খৃষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী কালে বিষুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে এবং চীনের দুর্ভিক্ষে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল তার সাথে একমাত্র তুলনা করা যেতে পারে পূর্ব-পাকিস্তানের এই ঘূর্ণি ঝড় ও বিপর্যয়কে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশের পীত নদীতে বন্যায় অথবা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে টেক্সাস্ হ্যারিকেনে, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ঝটিকা জলোচ্ছ্বাসে, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোতে বন্যায় যে সব ক্ষতির বিবরণ আছে পূর্ব-পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সেই সব রেকর্ডকে ম্লান করে দিল। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে পশ্চিম-পাকিস্তান তথা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরূপ আর একবার চিনে নেবার সুযোগ পেল। ১৯৬০ সাল থেকে এইভাবে বার বার প্রকৃতির নিষ্ঠুর আক্রমণে পূর্ব-পাকিস্তানে কম করে ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে, ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৫ শত কোটি টাকা। কিন্তু কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার পূর্ব-বাংলার দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। পরবর্তীকালে মুজিব বার বার এই কথা

বলেছেন। কোথায় পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি রক্ষার কর্ণধাররা, কোথায় ইয়াহিয়া খাঁ, ভুট্টো সাহেব, কেউ একবার আমাদের দেখতে পর্যন্ত এলেন না। "মহাপ্রলয়ের দেড় মাস পরে" এই শিরোনামে পূর্ব-পাকিস্তানের এক দৈনিক পত্রিকায় ভোলা ও পটুয়াখালির বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকার এক চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।) তা এই—

"১২ই নভেম্বর মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত বরিশাল জেলার ভোলা মহকুমার ভোলা, দৌলতখান, লালমোহন, তজুমদ্দিন, চরফেসন; পটুয়াখালি জেলার গলাচিপা, খেপুপাড়া, বরগুণা থানার অঞ্চল ও চরাঞ্চলে এখনও যাহারা কোনমতে বাঁচিয়া আছে, তাহাদের অধিকাংশই ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর দারুণ শীতে একরকম বিনা বস্ত্রেই উন্মুক্ত আকাশের নীচে কালযাপন করিতেছে। বেতার সরকারী ও বৈদেশিক সাহায্য বিতরণের যে ফিরিস্তি প্রকাশ করিতেছেন, সরেজমিনে তদন্ত করিলেই কেবলমাত্র তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে বরিশাল ও পটুয়াখালি জেলার বিভিন্ন এলাকায় এখনও হাজার হাজার লোক খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা, কচু গাছ ও অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া নাম-মাত্র বাঁচিয়া আছে। পৌষের এ তীব্র শীতের মধ্যে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এখনও বিনা বস্ত্রে হাজার হাজার লোক মৃত্যুপথযাত্রী বিভিন্ন এলাকায় কয়েকজন শিশুর শীতে মৃত্যুবরণের খবর পাওয়া গিয়াছে মহাপ্রলয়ের পর দীর্ঘ ৫০ দিন অতিবাহিত হইলেও সরকার আজও বিধ্বস্ত এলাকায় পরিবার পিছু একটি শীতের কাপড়ও দিতে পারেন নাই। দুর্গতদের ভাসিয়া যাওয়া কুঁড়েঘর নূতন করিয়া গড়িবার জন্য একখণ্ড বাঁশ, গোলপাতা বা অন্য কোনরকম সামগ্রী যোগাড় করিতে পারেন নাই। অথচ বিভিন্ন সরবরাহ ডিপোতে বিপুল পরিমাণ সাহায্য এবং গৃহনির্মাণ সরঞ্জাম পড়িয়া আছে…… কয়েকটি ডিপোতে চাল, আটা ও অনেক রিলিফ পচিয়া যাইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।……ছেলে-মেয়েদের পরণে কোন কাপড়

নাই, শিশুরা ন্যাংটা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা ও পুরুষেরা খেজুর গাছের পাতার বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া কোন রকমে ইজ্জত রক্ষা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।...আমি ব্যক্তিগতভাবে এখনও উপদ্রুত এলাকায় বহু গলিত মথিত মানুষ ও পশুর লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। চরফেশন থানার বেতুয়া স্লুইস গেটের মধ্যে ও তাহার আশেপাশে এখনও বহু লাশ পড়িয়া আছে।...একজন গ্রামবাসী আমাকে জানান যে তাহার মাথাপিছু সপ্তাহে মাত্র আধসের চাউল ও আটা পাইয়াছেন" [মহাপ্রলয়ের দেড় মাস পরে : ভোলা ও পটুয়াখালি। নিজামউদ্দিন আহমদ প্রদত্ত। দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ২২শে পৌষ, ১৩৭৭]

(একজন সাংবাদিক লিখেছেন—"কয়েক আউন্স তুলো আর তার ভিতরে বেশ কয়েকটি ন্যাপথলিন পুরে একটি মুখোশ তৈরী করে নাকমুখ তা দিয়ে বেঁধে আমরা কয়েকজন এগুচ্ছিলাম। এগুচ্ছিলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের দানবীয় আক্রমণে লক্ষ লক্ষ লোকের বধ্যভূমি স্ট্যালিনগ্রাদের দিকে নয়, সত্তরের স্ট্যালিনগ্রাদ চরজব্বারের দিকে।")

তারপর তিনি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর বিপর্যস্ত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎ করেছেন সেই বৃদ্ধটির সঙ্গে যিনি রিলিফ নিতে চান নি, কেননা আজীবন তিনিই সবাইকে রিলিফ দিয়েছেন। যে হাতে তিনি সবাইকে দিয়েছেন, সেই হাতে তিনি নেবেন কি করে?

দেখে এসেছেন আঠারো উনিশ বছরের বলিষ্ঠ গড়নের যুবকটিকে। সে একটি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সে তার বন্ধুদের সাথে এসেছিল রিলিফের কাজে! কিন্তু ধ্বংসলীলার ভয়াবহ দৃশ্য দেখে সে পাগল হয়ে গিয়েছে। তাকে একটি বাড়ীর উঠানে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। আকাশের দিকে মুখ তুলে সে ইকবালের

শোকোয়া কাব্য আবৃত্তি করছে—"হে খোদা তুমিই আসামী। এত নিষ্ঠুর কেন হলে তুমি ?"

আর দেখেছেন পাশাপাশি দুটি লাশ। মৃত্যুও যাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে নি। নববিবাহিত এক দম্পতি। একটি দামী সূতির শাড়ীর দুই প্রান্তে দুজনের কোমর বাঁধা। দুজনের হাতেই মেহেদীর রং মাখানো। হয়তো সেই মহা দুর্যোগের রাতে তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল। বিয়ের সময় মোল্লা পুরুত যে মন্ত্র পড়েন, এক হও, থাকো একসঙ্গে, কেউ কাউকে পরিত্যাগ করো না—তা তারা অক্ষরে অক্ষরে মেনেছেন। মৃত্যুও কি এখানে হার মানল না ? [দেখিয়া এলেম আমি আরবার হাহাকার ভরা। সলিমুল্লা। পূর্বদেশ, সোমবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ]

'পূর্বদেশ' সম্পাদকীয় লিখেছেন—

"শওয়ালের চাঁদে এবার বক্র ইশারায় তাই নতুন জীবন জিজ্ঞাসা চিহ্নিত। আমরা জীবন্মৃত হিসেবে চরম ধ্বংসের দিকে এগুবো, না জীবনের নতুন সুধাকে তমসার আড়াল থেকে ছিনিয়ে আনব। এবারের ঈদে অভিনন্দন নয়, শপথ গ্রহণ। শওচাঁদে জীবনের যে প্রতিভাস, হোক সে আজ ক্ষীণ, তাকে কয়েকজনের জীবনে নয় সকলের জীবনে পরিপূর্ণ করে তোলার সাধনাই আমাদের এবারের ঈদ।"

আর কবি সাহিত্যিকদের কাছে এ বেদনায় রক্তিম নতুন এক চেতনা। গভীর বেদনার বিলাপে এবং কঠিন সংগ্রামের শপথে একই সঙ্গে উদ্বেলিত এবং সংহত তাদের চেতনা। এমনি একটি কবিতা :

আর কান্দিসনে মা / হাসনা আরা

"একদা শান্ত ঝিলের স্বচ্ছ জলে
মুখ দেখত আমার রূপসী মা
সে জলে এখন ভাসমান তার ছেলে—
আমার মা।......

কান্দে আমার মা, মৃতবৎসা
অঝোর ধারে সে কান্দনে কাঁদে আকাশ
কান্দে ভোরের শিশির, কান্দে ভিন্ দেশ,
হায়রে ভাগ্যবতী—
বুকে উপুড় হয়ে পড়া কেশ,
মরণেও তোরে আঁকড়ে ধরে
অবোধ সন্তান।...
ফুরিয়ে গেছে অশ্রুজল
তার চেয়ে বুকে পাষাণ বাঁধ
রুদ্ররোষে জ্বালাও ওদের
তোমায় যারা করল অপমান,
দুঃখের গরল আকণ্ঠ পানে নীলকণ্ঠী তু
জননী আমার
বঙ্গ আমার, স্বর্গ আমার,
কান্দিস নে মা আর।"

এমনি অসংখ্য কবিতা পূর্ব পাকিস্তানের রবিবারের সংবাদ সাময়িকীতে, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার সবগুলি সংকলন করলে বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ হবে। যেমন হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর লেখা কবিতা সংকলন।

আর এক কবি জাহিদুল হক, আর এক অপূর্ব কবিতায় অপরূপ শোকগাথা রচনা করেছেন। তার খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

"ভাঁড়ার এখানে শূন্য, আমাদের চারিদিক
আজ লাশে একাকার
অপহৃত শস্যের মাঠে, বাঁশ ঝাড়ে নিকানো উঠানে।
হাতিয়ায়, সন্দীপে, খুলনায়, বরিশালে
হৃদয়ের আনাচে কানাচে,

স্বপ্নে সবুজ এত লাশ,—হে পৃথিবী আমরা
কোথায় যাবো,
আমাদের চাদ্দিকে ক্ষুধা, বিভীষিকা
মৃত্যুর শরীর,
আমাদের রান্নাঘর ভেঙ্গে গেছে গত রাতে
ভীষণ তুফানে,
স্বপ্ন, সাধ, হৃৎপিণ্ড, আমাদের সভ্যতার
পাঁচলক্ষ কারিগর,
গত রাতে বিনাশী তিমিরে ডুবে হাহাকার
লাশ হয়ে গেছে।
আমরা কোথায় যাবো, ডানা ভাঙ্গা সেই
পাখীটার মতো।
কোথাও সংসার নেই : চারপাশে অপহৃত
ফসলের মাঠ—আমরা কোথায় যাবো :
ভাঁড়ার এখনো শন্য : নীল চোখ গলে গেছে
তাই—সমগ্র শরীর
আমাদের সারা বুকে নিদারুণ জেগে আছে
স্বজনের নষ্ট কবর।"

[নষ্ট কবর—জাহিদুল হক]

দুর্যোগ কেটে গেল। বহু প্রত্যাশিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই প্রথম নির্বাচন। নির্বাচনে অসাধারণ সাফল্য ঘটল আওয়ামী লীগের। যে ঝড়ের অগ্নিরথে আওয়ামী লীগের অভিযান শুরু হয়েছিল ৭ই জুন ১৯৭০ সালে, সেই ঝড়ই বুঝি নিশ্চিহ্ন করে দিল নির্বাচনী

প্রতিপক্ষকে। কোথায় গেল মুসলিম লীগ, কোথায় গেল কনভেনসান মুসলিম লীগ, কোথায় গেল অন্যান্য দলছুটেরা। মুজিবুর ও আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচি সামনে নিয়ে জাতীয় পরিষদের তিনশটি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করল। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্দ্দিষ্ট ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনই পেল আওয়ামী লীগ। প্রাদেশিক বিধানসভায় ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন পেল আওয়ামী লীগ।

৩রা জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে সভা। একখানা ৩০০ ফুট লম্বা একটি সুবৃহৎ নৌকার অবয়বে তৈরী হল মঞ্চ, মঞ্চের উপর দাঁড়ালেন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্যরা। মাঝে দাঁড়ালেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। এ সভা ছিল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সভা। শপথ নিলেন মুজিবুর রহমান, শপথ নিলেন আওয়ামী লীগের সদস্যরা: ৬ দফা কর্মসূচি রূপায়ণ আমাদের লক্ষ্য, আমাদের ব্রত। তারপর ১১ই জানুয়ারী ঢাকায় এলেন ইয়াহিয়া খাঁ, তারপর এলেন ভুট্টো সাহেব. জাতীয় পরিষদের বৈঠক দু'বার মুলতুবি হয়ে গেল, ইতিহাসের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করল। এল ফিরে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সাল সংগ্রাম আত্মত্যাগের প্রেরণা গ্রহণের মিনার তৈরি হয়েছে এই ২১শে ফেব্রুয়ারী। শেখ মুজিবুর ১৯৫২ সালের পর অনেকবার এসেছেন এই ২১শে দিনটিতে, আজ ১৯৭১ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী আবার এলেন সেই শহিদ বেদীর পাদদেশে।

একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারীর কাকডাকা ভোরে শহিদ মিনারে পুষ্পমালা অর্পণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর শপথবাণী উচ্চারণ করে

বললেন : 'বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নস্যাৎ করে দেবার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করা হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে বাঙালী আরও রক্ত দেবে, কিন্তু স্বাধিকারের দাবির প্রশ্নে কোন আপোস করবে না।' শেখ মুজিবুর রহমান যখন কথাগুলি বলছিলেন তখনো ভাল করে ভোরের আলো ফোটেনি। পূব আকাশে লালের ছোপ ধরেছে সবে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বুকে কালো ব্যাজ লাগিয়ে খালি পায়ে সমবেত হয়েছে শহিদ বেদীর সামনে নতুন দিনের নতুন শপথ নিতে। তিনি বলে চলেছেন, 'বাংলার মানুষ যাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে বরকত-সালাম-রফিক-শফিকরা নিজেদের জীবন দিয়ে সেই পথ দেখিয়ে গেছেন।' '৫২ সালের সেই রক্তদানের পর ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯-এ—বার বার বাঙালীকে রক্ত দিতে হয়েছে। কিন্তু আজও সেই স্বাধিকার আদায় হয়নি। আজও আমাদের স্বাধিকারের দাবি বানচাল করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য বাংলার ঘরে ঘরে প্রস্তুত হতে হবে—এবার চূড়ান্ত সংগ্রাম। চরম ত্যাগের এবং প্রস্তুতির বাণী নিয়ে আপনারা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ুন, বাংলার প্রতিটি ঘরকে স্বাধিকারের এক-একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে দেখিয়ে দিন, বাঙালীকে পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখার শক্তি পৃথিবীতে কারুর নেই।' একটু থেমে তিনি আবার বলেছিলেন, 'ষড়যন্ত্রকারী শোষকগণ দুশমনের দল বার বার বাঙালীর রক্তে বাংলার মাটি রঞ্জিত করেছে। যারা নির্মম শোষণে লুণ্ঠনে বাংলার মানুষকে ভিখারিতে পরিণত করেছে, তারা আজও নিজেদের কুমতলব হাসিল করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।'

শেখ মুজিব হাত তুলে কারু প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরা জেনে রাখুন ১৯৫২ সাল আর '৭১ সাল এক নয়। ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত কি করে ভাঙতে হয় তা

আমরা জানি। কারু প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই, আক্রোশ নেই, আমরা চাই স্বাধিকার, আমরা চাই আমাদের মতো পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বালুচ এবং পাঠানরাও নিজ নিজ অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকুন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে কেউ আমাদের উপর প্রভুত্ব করবে। ভ্রাতৃত্বের অর্থ দাসত্ব নয়। সম্প্রীতি আর সংহতির নামে বাংলাদেশকে আর কলোনী বা বাজার হিসাবে ব্যবহার করতে দেব না। যারা সাড়ে ৭ কোটি বাঙালীর স্বাধিকারের দাবি বানচালের জন্য বাঙালীকে ভিখারী বানিয়ে ক্রীতদাস করে রাখছে তাদের উদ্দেশ্য যে কোন মূল্যে ব্যর্থ করে দেওয়া হবে।' একটু থেমে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে শেখ মুজিব ফের বললেন,—'ভাইরা আমার—বোনেরা আমার—সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি হয়তো আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে মরতেই হয়। জানি না, আবার কবে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের এবং বাংলার সকল মানুষকে ডেকে বলছি—চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন—বাংলার মানুষ যেন শোষিত না হয়, বঞ্চিত না হয়, লাঞ্ছিত অপমানিত না হয়। দেখবেন শহিদের রক্ত যেন বৃথা না যায়। যতদিন বাংলার আকাশ, বাতাস, মাঠ, নদী থাকবে, ততদিন শহিদরা অমর হয়ে থাকবে। বীর শহিদদের অতৃপ্ত আত্মা আজ দুয়ারে দুয়ারে ফিরছে : বাঙালী তোমরা কাপুরুষ হইও না, চরম ত্যাগের বিনিময়ে হইলেও স্বাধিকার আদায় করো। বাংলার মানুষের প্রতি আমারও আহ্বান—প্রস্তুত হোন। স্বাধিকার আমরা আদায় করবই।'

"তুমি আজ জাগো, তুমি আজ জাগো।
একুশে ফেব্রুয়ারী
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে
বীর নারী

আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে, মাঠে, ঘাটে বাঁকে
দারুণ ক্রোধের আগুনে জ্বালবো ফেব্রুয়ারী
একুশে ফেব্রুয়ারী, একুশে ফেব্রুয়ারী।"

কেটে গেছে ২১শে ফেব্রুয়ারী। মুজিবের মনে কিন্তু নানা সন্দেহ দানা বাঁধলেও ধরে নিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। তাই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঘোষণা করলেন মুজিব।

"১৮ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় শিল্প ও বণিক সংঘের সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন আওয়ামী লীগ দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করিবে।"

আওয়ামী লীগ-প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান রবিবার (১৮ই ফেব্রুয়ারী) বিকালে প্রাদেশিক পরিষদ ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সম্বর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দান কালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, তাঁহার দল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তবে সেই সমাজতন্ত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, বরং নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পন্থায় আস্তে আস্তে বিবর্তনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য উপনীত হওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার দল বিশ্বাস করে।

আওয়ামী লীগ-প্রধান ঘোষণা করেন যে, ৬ দফার মাধ্যমে স্বাধিকার অর্জিত হইলে এদেশের ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক মুদ্রার অভাব হইবে না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া একচেটিয়া পুঁজি ও কার্টেল প্রথা সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে না। সমাগত শিল্পপতি ও বণিকদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি দৃপ্তকণ্ঠে আরও ঘোষণা করেন যে,

৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন আদায়ের পর এদেশে নতুন ২২ পরিবারের সৃষ্টি হইতে দেওয়া হইবে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণের প্রারম্ভে গত ২৩ বৎসরে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলা দেশের বিশেষ করে গ্রাম বাংলার দুঃখ-দুর্দশা এবং সমস্যার কথা উল্লেখ করে শেখ সাহেব বলেন, স্বাধিকারের জন্য যারা বৎসরের পর বৎসর কারাবরণ করিতেছেন, আন্দামানে নির্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়াছেন, তাঁহারা কি এই স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। কায়েদে আজম যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন তিনি বলিতেন, আমি জনগণের জন্য পাকিস্তান চাহিয়াছিলাম। এই পাকিস্তান চাই নাই। তিনি আরো বলেন, আজ যদি দেশের দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন না হয়, তবে শহিদানের আত্মা শান্তি পাইবে না। তিনি বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া মানুষকে বাঁচানো যাইবে না।

তিনি ২৩ বৎসরের শোষণ ও বঞ্চনার খতিয়ান তুলে ধরে বলেন যে, স্বাধীনতার সময় বাংলা দেশ শতকরা ৭০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিত। কিন্তু বর্তমানে তাহা কমিয়া ৪৫ ভাগে নামিয়াছে। আর পশ্চিম পাকিস্তান শতকরা ৩০ ভাগের স্থলে ৫৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতেছে। বাংলার পাট, তামাক, চায়ের বিনিময়ে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পশ্চিম পাকিস্তানে কলকারখানা স্থাপন করিয়া সেই কলকারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যই বাংলার বাজারে বিক্রয় করিতেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের একচেটিয়া বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলার তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করা হইয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, দেশের ব্যাঙ্ক ইনসিওরেন্সের মালিক আজ পশ্চিম পাকিস্তানের ২২ পরিবার। তাই বাঙালী ব্যবসায়ীদের এল. সি. মার্জিন দিতে হয় শতকরা ৪০ ভাগ। অথচ

পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীগণ টেলিফোন মারফত এল, সি. খুলিয়া ফেলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে মাত্র ৬ হাজার হাসপাতালে বেডিং রহিয়াছে অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে ২৬ হাজার স্থাপন করা হইয়াছে। বাংলাদেশে বন্যা সমস্যাকে অগ্রাধিকার না দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের তারবেলা, মঙ্গলা বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার কেন বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান করেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে কি আমাদের অংশ ছিল না? শতকরা ৮০ ভাগ বৈদেশিক সাহায্য পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইয়াছে। তিনি বলেন, দেশের ৫৬ জন বাঙ্গালী হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে শতকরা ৮৫ জনই পশ্চিম পাকিস্তানী এবং দেশরক্ষা বিভাগের শতকরা ৯০টি চাকুরিতে পশ্চিম পাকিস্তানের লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর আমার বাংলার ৭০ লক্ষ বেকার আজ চাকুরীর সন্ধানে পথে পথে ঘুরিতেছে। ২৩ বৎসরে বাংলার অর্থনীতিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করা হইয়াছে। আইন শৃঙ্খলার নামে শ্রমিকদের হয়রানি করা হইতেছে। তিনি আরও বলেন, এই শোষণ চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে, অত্যাচার নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ একদিন না একদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেই। তিনি বলেন, বাস্তুহারার ভিড়ে রাস্তা চলা যায় না। আমরা এই অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। দেশের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল ভাবে গড়িয়া তুলিতে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স জাতীয়করণ করিতে হইবে। তিনি শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাহারা যদি স্বাধিকারের আন্দোলনে দেশের মানুষের পাশে আসিয়া না দাঁড়ান তাহলে দেশের মানুষ তাঁহাদের ক্ষমা করিবে না।

জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান (বুধবার ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)

ঢাকায় গণবিরোধী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া ঘোষণা করেন: পাকিস্তানের জাগ্রত জনগণের মনে আজ আর কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই যে ষড়যন্ত্রকারী কায়েমী স্বাথবাদী আর তাদের ফমাবরদাররা আজ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্যক্রম বানচাল করিবার জন্য শেষবারের মত উন্মত্ত প্রয়াসে মাতিয়াছে।

বারো কোটি মানুষের ভাগ্য এতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, ইহা লইয়া ছিনিমিনি খেলার অবকাশ নাই। গত এক সপ্তাহ ধরিয়া জাতিকে যে সন্ন্যাসরোগীসুলভ ও রাজনৈতিক খ্যাপামী দেখিতে হইতেছে উহার অবসানের সময় আসিয়াছে। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা একটি শাসনতন্ত্র রচনা ও তাহাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে একটি কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করা হইতেছে।

জনগণের প্রতি স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন মেজরিটি পার্টি আওয়ামী লীগ তিক্ত বিতর্কের দ্বারা পরিবেশ বিষাক্ত করিতে আগ্রহী না হওয়ার দরুণ এতদিন ইচ্ছাকৃত ভাবেই নীরব থাকিয়াছে। গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে সুদৃঢ় ভাবে বিশ্বাসী বলিয়াই আওয়ামী লীগ মনে করে যে, একমাত্র জাতীয় পরিষদে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের সুরাহা হইতে পারে এবং হওয়া উচিত। এই লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই আওয়ামী লীগ অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানাইয়া আসিতেছিল। এই দল বরাবরই প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও নেতার সঙ্গে আলোচনায় সম্মত থাকিয়াছে।

৬ দফা জনগণের সম্পদ

দলীয় নেতৃবৃন্দকে লইয়া আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিলিত হই এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের নির্বাচনী

রায়প্রাপ্ত ৬ দফা শাসনতান্ত্রিক ফর্মূলার প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করি। ইহার পর পিপ্‌লস্ পার্টির চেয়ারম্যান জেড এ ভুট্টোর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমার সহকর্মীরা তাঁহার সহকর্মীদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হন। আমরা তাঁদের বুঝাইতে চাহিয়াছি যে, ৬ দফা ভিত্তিক ফেডারেল স্কীমের স্বপক্ষে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার ঐতিহাসিক রায় ঘোষিত হওয়ার পর ইহা এখন জনগণের সম্পদ। জনগণ আওয়ামী লীগকে ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ম্যাণ্ডেট দিয়াছে এবং আওয়ামী লীগ এই ম্যাণ্ডেটটি বাস্তবায়ণের অবিচল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। তবে ৬ দফা বাস্তবায়িত হইলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত বা বেলুচিস্তানের ন্যায্য স্বার্থ বা ফেডারেল সরকারের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া কাহারও মনে ভ্রান্ত ধারণা থাকিলে তাহা নিরসনের জন্য আমরা ৬ দফার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে রাজী আছি।

সকলের সহযোগিতাই আওয়ামী লীগের কামনা

আগে পশ্চিম পাকিস্তানে দলীয় সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া পরে ঢাকা আসিয়া আবার আলোচনা শুরু করিবেন এই অজুহাত তুলিয়া পিপ্‌লস্ পার্টিই ঢাকায় গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত আলোচনা মূলতবি রাখিয়া যায়। এদিকে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার ওয়াদার পুনরাবৃত্তির পাশাপাশি দেশকে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রদানের জন্য সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। এই উদ্দেশ্যেই আমরা মারকেজী জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলামের মৌলানা হুরানী, নওয়াব আকবর খান বুগতি, মৌলানা গোলাম গাউ সহ জারতি ও মৌলনা মুফতি মাহমুদ (জমিয়তে ওলেমায়ে ইসলাম) ও অন্যান্য পশ্চিমাঞ্চলীয় নেতার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই। একই সঙ্গে আমরা অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের বৈঠক

ডাকার জন্য চাপ দিতে থাকি। পরিষদের অধিবেশন ডাকিতে বিলম্ব হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত ইহা ডাকার আগেই দুইটি মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত যখন ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহূত হইয়াছে তখন মুহূর্তের জন্য হইলেও মনে হইয়াছে, যে কুচক্রী শক্তি প্রতিবার গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় সক্রিয় হইয়া উঠিত তাহাদের উপর যুক্তিবাদী শক্তির বিজয় সূচিত হইয়াছে। এই গণবিরোধী শক্তি ১৯৫৪ সালে পূর্ব-বাংলায় একটি নির্বাচিত সরকারকে বাতিল করিয়াছে, ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করিয়াছে এবং তারপর প্রতিটি গণ আন্দোলন বানচালের অশুভ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহূত হইবার পরবর্তী ঘটনা-প্রবাহই সাক্ষ্য দেয় যে, এই ষড়যন্ত্রকারী শক্তি আরেকবার ছোবল হানার প্রস্তুতি নিতেছে। জনাব ভুট্টো এবং পিপিপি আকস্মিক-ভাবে এমন সব ভাবভঙ্গী ও কথাবার্তা চালাইতেছেন যার উদ্দেশ্য মনে হয় জাতীয় পরিষদের স্বাভাবিক কর্মধারা বিঘ্নিত করিয়া শাসন-তান্ত্রিক ধারাকে বানচাল করা। আর এইভাবেই তাহারা জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রতিহত করিতে চান।

পিপ্ল্স্ পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল জনাব জে এ রহিম এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন: "আমরা দেখিয়াছি পূর্ব-পাকিস্তান যে আসলেই একটি কলোনী ইহা অতৃপ্ত মানসিকতার কথা নয়—কঠিন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তব।" [আউটলাইন অব এ ফেডারেল কনস্টিটিউশন ফর্ পাকিস্তান—জে এ রহিম, পৃষ্ঠা ৭১] কিন্তু তা সত্ত্বেও ৬ দফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত কতিপয় মৌলিক আপত্তি সাবধানতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা বাংলা দেশকে কলোনী হিসাবেই বজায় রাখার সুপরিকল্পিত কার্যক্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রধানত কেন্দ্র কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই দেশের অপরাংশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের তরক্কির জন্য বাংলা দেশের সাত কোটি মানুষের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ চলিয়াছে, বাংলার সম্পদ পাচার করা হইয়াছে। এইভাবেই প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের কল্যাণে ব্যয়িত হইয়াছে। গত ২৩ বছরের মোট আমদানার দুই-তৃতীয়াংশ আসিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ৫ শত কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় মুনাফাশিকারী শিল্পপতির স্বার্থে বাংলাদেশকে সাত কোটি লোকের 'সংরক্ষিত বাজার' হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। আর এই নির্মম শোষণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনিবার্য বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিকে দিকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, অন্ন নাই, সংগতি নাই বাংলাদেশের মানুষ আজ ভয়াবহ আকালের আবর্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যা কিছুই ঘটুক না কেন আমরা আর এ অবস্থা চলিতে দিতে পারি না।

বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য কেন্দ্রের হাতে না থাকিলে এহেন নির্মম শোষণ চলিতে পারিত না। এই পটভূমিতে কেন্দ্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য বহাল রাখার জেদ নগ্নভাবে এই সত্যই প্রকট করিয়া তোলে যে, ইহার উদ্দেশ্য জাতীয় সংহতি অর্জন নয়, বরং বাংলা দেশের উপর ঔপনিবেশিক শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য প্রধান হাতিয়ারগুলি কেন্দ্রের হাতে রাখা।

পিপল্‌স্ পার্টির অন্য একটি উক্তিতে এই সত্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পরিষদ গঠনের দাবির সমর্থনে খাঁটি ফেডারেশনের (উহার অর্থ যাহাই হউক না কেন, কারণ কোন দুইটি ফেডারেশনই যখন একে অন্যের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ নহে) নীতি

গ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। যাহার দ্বিতীয় কক্ষে সকল ইউনিটের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকিতে হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর কথায়, ধরুন, দ্বিতীয় কক্ষের সদস্য সংখ্যা একশত হইলে উহাতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হইবেন মাত্র ২০ জন। এইভাবে বৃহত্তর জনসংখ্যা অধ্যুষিত বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বহীন সংখ্যালঘু ইউনিটে পরিণত করার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ইতিপূর্বে কখনও বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব শতকরা ১০ ভাগে হ্রাস করার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু সংখ্যাসাম্যের জিগির তুলিয়া নিজেরা আত্মতুষ্টি লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় কক্ষে সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের বর্তমান প্রস্তাব গৃহীত হইলে বাংলাদেশ অন্য পরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব থাকা সত্ত্বেও অসহায় সংখ্যালঘু ইউনিটে পরিণত হইবে। এই পদ্ধতিতে অপর অঞ্চলের সংখ্যালঘুরা কেন্দ্রের উপর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখিবে। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হইলে যে সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্যের ক্ষমতাবলে ঔপনিবেশিক শোষণের পুরাতন পদ্ধতি স্বচ্ছন্দে চিরস্থায়ীভাবে কায়েম করিবে। এইসব প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আমলাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করিতেছে। তাহারা এভাবে তাহাদের প্রভু পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের মনোরঞ্জন অব্যাহত রাখিতে পারিবে—গত ২৩ বৎসর যাবতই তাহারা বিশ্বস্ততার সহিত তাহাদের ঐসব প্রভুর সেবা করিয়া আসিতেছে।

সেইজন্য সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটি কার্যকরী দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের প্রস্তাব অন্তত পাকিস্তানের আদর্শ খাঁটি ফেডারেশনের জন্য মোটেই কার্যকরী নমুনা নহে, বরং উহা বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ চিরস্থায়ী করার অশুভ পাঁয়তারা মাত্র।

৬ দফা কর্মসূচির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অন্যান্য আপত্তি চিরাচরিত

ভাবে বিকৃত তথ্য পরিবেশনেরই সামিল এবং বাংলাদেশের মানুষ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করাই উহার মূল উদ্দেশ্য। ৬ দফা কর্মসূচিতে ফেডারেশন সরকারকে ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলির কৃপার উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে বলিয়া যে পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হইয়াছে আসলে তাহা নহে। বরং উহাতে ফেডারেল সরকার কর্তৃক সাক্ষাৎ শাসনতান্ত্রিক বিধানমতে পর্যাপ্তভাবে রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রা বিলিবণ্টনের স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে। যাহার ফলে ফেডারেল আইন পরিষদ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের উপর ফেডারেল কর আরোপের ক্ষমতা লাভ করিবে।

ফেডারেশনের বিভিন্ন ইউনিটের সম্পদ হইতে প্রথম ব্যয় বরাদ্দ বাবদ ট্যাক্স কর আদায় করা যাইবে।

অনুরূপভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের উপর ছাড়িয়া দিলে ফেডারেল সরকারের পক্ষে বৈদেশিক নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয় অসুবিধা দেখা দিবে বলিয়া যে আপত্তি তোলা হইয়াছে, তাহাও ঠিক নহে। কারণ যুগে যুগে একথা পুনরনুমোদিত হইয়াছে যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ক্ষেত্রে যে ক্ষমতার অধিকারী হইবে তা দেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যে ব্যবহার করা হইবে।

বাংলাদেশের লোক ও পশ্চিমাঞ্চলের নির্যাতিত জনগণের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টির জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে তাহা চরম অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালীদের প্রকৃত 'শত্রু' বলিয়া চিত্রায়িত করা হইয়াছে, যাহাদের নিকট গেলে পশ্চিম পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা নাকি 'হোস্টেজ' হিসাবে আটকা পড়িয়া যাইবে। জাতীয় পরিষদকে 'কষাইখানা' আখ্যা দিয়া পরিষদের বাঙালী সদস্যদের প্রতি অযাচিত মন্তব্য করা হইয়াছে।

এসব বাজে অভিযোগ উত্থাপনের একমাত্র কারণ এই যে,

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় আহ্বান করা হইয়াছে। দেশের সকল প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় সংস্থা পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত বলিয়া বাঙালীরা যখন বিগত ২৩ বৎসরে সকল সময়ই তথায় যাতায়াত করিতেছে, বিশেষত সেক্ষেত্রে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া শুধু অশোভনই নহে বরং অযৌক্তিকও। এভাবে আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিলে বাঙালীরা কি ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রশ্ন করিতে পারেনা যে, তাহাদিগকে পশ্চিম পাকিস্তানে গমনের জন্য আহ্বান জানানো হইবে কি না ? আরও কতিপয় উক্তি এ ব্যাপারে আলোকপাত করিয়াছে যাহার মধ্য হইতে উপরোক্ত মনোভাব টের পাওয়া যায়।

পিপলস্ পার্টির জনৈক সদস্য গত ২০শে ফেব্রুয়ারী "পাকিস্তান টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে দাবি করেন যে, "...জনগণ ...(অবশ্যই)...দেশের অখণ্ডতার প্রশ্নে তাহাদের সঠিক মনোভাব ব্যক্ত করিবে এবং মৌলিক ব্যাপারে যে কোন প্রকারের আপোষ মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করিবে। এবং আসন্ন ও মারাত্মক বিপর্যয়ের হাত হইতে সমগ্র দেশকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতা যখন তাহাদের থাকিবে না, তখন অন্তত যেটুকু পারা যায়, দেশের সে অংশটুকু রক্ষার জন্যও চেষ্টা করিবে। সঠিক রাজনৈতিক পন্থা হইতেই যেটুকু পারা যায় সেটুকুই রক্ষা করা এবং দেশের অখণ্ডতা ভঙ্গের প্রচেষ্টা বা প্রস্তাব না করা। আমরা অবশ্যই আওয়ামী লীগকে তাহার ৬ দফা হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিব এবং তাহারা উহা না করিলে আমরা অবশ্যই যে কোন মূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ৬ দফা প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে ঠেকাব।"

এখানে দুইটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার একটি হইতেছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। উহাতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের উপর ৬ দফা চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

৬ দফা কর্মসূচি আসলে ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটগুলির স্বায়ত্তশাসনের নিরাপত্তাবিধানেরই কর্মসূচি। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ফেডারেশনভুক্ত ইউনিটগুলি একেবারে একই হারে বাংলাদেশের মত স্বায়ত্তশাসন না চায় অথবা যদি তাহারা কেন্দ্রের হাতে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে চায় কিংবা কতিপয় আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী হয় তবে ৬ দফা ফর্মূলা তাদের পক্ষে অন্তরায় হইবে না। প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগও কোন সময়েই এমন কোন ভূমিকা গ্রহণ করে নাই যে, ৬ দফা ফেডারেশনভুক্ত পশ্চিম পাকিস্তানী ইউনিটগুলির উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে। অপর যে বিষয়টি লক্ষনীয়ভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে তাহা হইতেছে এই যে যদি বাংলাদেশকে অতীতের শর্তের মধ্যে আবদ্ধ না রাখা যায় অথবা দেশের অপর অংশের সংখ্যালঘুদের নির্দেশিত শর্তে ধরিয়া না রাখা যায়, অর্থাৎ যদি উহাকে কলোনী হিসাবে বজায় না রাখা যায় এবং তাহার পরিবর্তে যদি বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রদেশ হিসাবে উহার ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করে, তবে পশ্চিম পাকিস্তানকে 'বাঁচাইতে' হইবে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে 'কাহার নিকট হইতে' এবং 'কাহার জন্য' বাঁচাইতে হইবে? স্পষ্টত নিবন্ধকার ইহাই দেখিতে চান যে পশ্চিম পাকিস্তানকে সেই বাঙালীদেরই হাত হইতে বাঁচানো হইয়াছে যাহারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তিনি ইহাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সেই স্বার্থান্বেষী মহলেরই জন্য বাঁচাইতে চাহেন। যাঁহারা এইরূপ গণতান্ত্রিক পরিবেশে টিকিয়া থাকিবেন না এবং যাঁহাদের পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত অবহেলিত জনগণকে শোষণের অধিকার নিশ্চিত হইবে। এমন কি নিবন্ধকার বাংলাদেশের ব্যাপারে উক্ত স্বার্থান্বেষী মহলের 'অধিকার' হারাইতে হইলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তাহাদের এই শোষণের অধিকারকে নিশ্চিত করিতে

চান বলিয়া মনে হয়। পাকিস্তানের জাগ্রত জনগণের মনে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয় যে, ষড়যন্ত্রকারী এবং স্বার্থান্বেষী মহল এবং তাহাদের তোষামোদকারীরা নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা প্রণীত একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও তাহাদের হস্তেই ক্ষমতা হস্তান্তরকে বানচাল করার শেষ বেপরোয়া অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের এই বেপরোয়া মনোভাব এতই চরম আকার ধারণ করিয়াছে যে তাহারা জাতীয় অখণ্ডতার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার ভান করিয়া পাকিস্তানের অস্তিত্ব লইয়াও জুয়া খেলিতে ইচ্ছুক। তাহারাই পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একত্রে বাস করার ভিত্তি তৈরীর শেষ সুযোগ বানচাল করিয়া পাকিস্তানের অখণ্ডতার উপর একটি চরম আঘাত হানিতে উদ্যত হইয়াছে।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে যে শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবে তাহার লক্ষ্যই হইবে উক্ত মিলনের ভিত্তি রচনা করা। আমরা এখনও এই ফোরামে সার্থক প্রচেষ্টা চালাইতে প্রস্তুত রহিয়াছি এবং ইহাই আমাদের এই দেশকে একটি স্থায়ী শাসনতন্ত্র প্রদানে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য একমাত্র উপযুক্ত ফোরাম। এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমরা পাকিস্তানের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক জাতীয় পরিষদ সদস্যকে সহযোগিতা করিতে আমন্ত্রণ জানাই।

ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে

পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণ ও বাংলাদেশের জাগ্রত জনতা কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র জনগণের বিজয় বানচালের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যাহারা 'অনভিপ্রেত সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব' ও 'নির্বাচিতের স্বেচ্ছাচার' সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের জবাব হইতেছে পাকিস্তানের জনগণ

'সংখ্যালঘুর একনায়কত্ব' সহ্য করিবে না এবং এমনকি ক্ষমতার দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হইলেও কোন স্বৈরাচারই তাহাদের ভীত করিতে পারিবে না।

আমরা যে ক্ষমতাকে স্বীকার করি তাহা হইতেছে জনগণের ক্ষমতা। জনগণ সকল স্বৈরাচারীকেই নতি স্বীকারে বাধ্য করিয়াছে ; কারণ স্বৈরাচারীর ক্ষমতার দণ্ড জাগ্রত জনগণের সঙ্কল্পের আঘাতের কাছে টিঁকিয়া থাকিতে পারে না।

যে কোন ভবিষ্যৎ স্বৈরাচারীর ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আমরা ষড়যন্ত্রের অশুভ শক্তির প্রতি কোনপ্রকার বিবেকবর্জিত পাঁয়তারা না করার অথবা ১২ কোটি মানুষের ভাগ্য লইয়া খেলা না করার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছি। যদি কেহ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাপ্রদান বা বানচাল করার চেষ্টা করে তবে বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলচিস্তানে জাগ্রত জনগণের পবিত্র দায়িত্ব হইবে তাহা প্রতিরোধ করা। আমি বাংলাদেশের জাগ্রত জনগণকে আমাদের মাটি হইতে গণবিরোধী শক্তিকে যে কোন উপায়ে নির্মূল করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানাইব।

আমরা আজ প্রয়োজন হইলে জীবন বিসর্জন দিব—যাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের একটি কলোনীতে বাস করিতে না হয়, যাহাতে তাহারা একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে সম্মানের সহিত মুক্ত জীবন যাপন করিতে পারে, সেই প্রচেষ্টাই আমরা চালাইব।

এইদিন ২৪শে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁহার মতে 'পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন কিনা' প্রশ্ন করা হইলে আওয়ামী লীগ-প্রধান বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, 'এসব কথা শুনিতে শুনিতে আমরা ক্লান্ত। যখনই বাংলার মানুষ তাহাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া উত্থাপন করিয়াছে, তখনই

শোষককুল ইসলাম ও সংহতি বিপন্নের ধুয়া তুলিয়াছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী বিজয় বানচাল এবং ১৯৫৮ সালে সাধারণ নির্বাচন ঠেকাইয়া সামরিক আইন জারী—বিভিন্ন সময় বার বার এইসব বাজে ধুয়া তোলা হইয়াছে। তিনি বলেন, আমরা এসব ভুয়া সংহতিবাজদের চাইতে অনেক বেশী ভালো পাকিস্তানী। এইসব ন্যুইসেনস আমরা আর সহ্য করিতে রাজী নই। তিনি বলেন, বাংলার উপকূলে মহাপ্রলয়ে যখন ১০ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোক অন্তহীন দুর্দশার মধ্যে, তখন এই সব সংহতিবাজের অনেকেই বাংলায় আসিয়া তাহাদের দেখিতে পারেন নাই। জাতীয় নেতা হইয়াও তিনি কেন পশ্চিম পাকিস্তান সফর করিতেছেন না প্রশ্ন করা হইলে শেখ সাহেব বলেন, নির্বাচনের আগে আমি পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গিয়াছি, আমার দল বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। অথচ যারা আজ সংহতির ডঙ্কা বাজাইতেছে তাদের অনেকেরই বাংলাদেশে কোন পার্টি অফিস নাই—দুর্দিনে তারা এখানে আসে না। শেখ সাহেব বলেন, জাতীয় সংহতি এখনও বিপন্ন হয় নাই। তবে কেহ যদি তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তার জন্য আমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নাই।

সেদিন ১৯শে মার্চ। দৈনিক ইত্তেফাক কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় আট কলম হেডিং-এ লেখা হল : আমি শেখ মুজিব বলছি, এ গণ-বিস্ফোরণ মেসিনগানেও স্তব্ধ করা যাইবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের ধানমণ্ডির বাসভবন এখন মুক্তিকামী জনতার তীর্থক্ষেত্র। ১৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন, বিদেশী বন্ধুরা, দেখুন আমার দেশের মানুষ আজ প্রতিজ্ঞা ও সংগ্রামের দৃঢ়তায় উজ্জীবিত। কার সাধ্য ইহাদের রোখে। আমার দেশ জাগিয়াছে। জনগণ জাগিয়াছে। তাহারা জীবন দিতে শিখিয়াছে। স্বাধীনতার জন্য জীবন দানের অগ্নিশপথে দীপ্ত জাগ্রত জনতার এ

জীবন জোয়ারকে, প্রচণ্ড এ গণ-বিস্ফোরণকে স্তব্ধ করে দিতে পারে এমন শক্তি মেসিনগানেরও আজ আর নেই। [২৫শে ফেব্রুয়ারী ইত্তেফাক থেকে]

সেই মেসিনগানই নেমে এলো জাগ্রত জনমতকে স্তব্ধ করতে, স্বাধিকার দাবিতে সোচ্চার জনমতকে স্তব্ধ করতে। সেই মেসিনগান গুঁড়িয়ে দিল শহর, নগর, গ্রাম, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মন্দির মসজিদ, গীর্জা সব। কিন্তু গণ-বিস্ফোরণ স্তব্ধ করা গেল না মেসিনগানে। সে ইতিহাস আরও পরে লেখা হবে। সেই ইতিহাস লিখবেন ভাবীকালের ঐতিহাসিকেরা। এখন শুধু মেসিনগানের গুলিতে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা ঘটল তার অতি সামান্য বিবরণ তুলে ধরছি। এই বিবরণ অতি সামান্য। প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে এই বিবরণের দ্বারা কোন পরিমাপ সম্ভব নয়।

"টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলো
আমার স্বপ্নের মত হৃৎপিণ্ড যেমন কোনো
পেশওয়ারী ফলওয়ালা তার ধারালো
ছুরির হিংস্রতায় ফালি ফালি করে কেটে
ফেলে তাহা,
লাল টকটকে একটি আপেল।
কিন্তু শোনো, এক ফোঁটা রক্তও যেন
পড়ে না মাটিতে, কেননা আমার
রক্তের কণায় কণায় উজ্জ্বল স্রোতের
মত বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী
রক্তের অভিজ্ঞান। তোমরা কুটি কুটি
করে ছিঁড়ে ফেলো আমার হৃৎপিণ্ড,
যে হৃৎপিণ্ডে ঘন ঘন স্পন্দিত হয়ে
আমার দেশের গাঢ় ভালবাসা,

যে হৃদয়—
মায়ের পবিত্র আশীর্বাদের মতো,
বোনের স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টির মতো,
প্রিয়ার 'হৃদয়ের শব্দহীন গানের মতো
শান্তির জ্যোৎস্না চেয়েছিল
পৃথিবীর আকাশের নীচে,
চৈত্রের তীব্রতায় শ্রাবণের পূর্ণিমায়।"

—শামসুর রাহমান।

হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে কাটার ইতিহাসই শুরু হয় এর পর। ২৫শে মার্চ ১৯৭০ সালের রাত থেকে পূর্ববাংলায় যে ইতিহাস রচনা শুরু হয় এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী সাংবাদিকদের ঢাকা থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয় তাঁদেরই একজনের কাহিনী আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারই বিবরণ এখানে তুলে ধরছি।

"ঢাকা ২৫ মার্চ, বৃহস্পতিবার। রাত ১১টা। সেনাবাহিনী জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে হামলা চালাচ্ছে তার পরিণতি গুরুতর হবে বলে শেখ মুজিবুর রহমান যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেটার রিপোর্ট তৈরী করে ফেললাম। নীচের লবিতে চলে গেলাম। এবার একটি ট্যাক্সি ডেকে চলে যাব 'তার' অফিসে। কিন্তু লবিতে কী দেখছি! যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যরা, তাদের মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে অস্ত্র, তারা ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। দরজার সামনে ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর হোটেল কর্মীরা চক দিয়ে লিখে রেখেছেন : 'অনুগ্রহ করে এখন বাইরে যাবেন না।' অন্য কেউ বা শনিবারে সাধারণ হরতাল পালনের জন্য শেখ মুজিবুরের আহ্বান সংবলিত আবেদনপত্রটি ওই ব্ল্যাক বোর্ডের উপরই সেঁটে দিয়ে গিয়েছেন। অন্য সাংবাদিক বন্ধুরা জানালেন, সৈন্যরা তাঁদের ঘরের ভেতর থাকতে হুকুম দিয়ে গিয়েছেন। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা

করলাম, "ব্যাপার কী ?" জবাব দিলেন, "বাইরে বের হতে গেলেই গুলি। রাত ১১টায় হোটেল তালাবন্ধ করে দিতে হবে এটাই আমার উপর হুকুম, আর কিছু জানি না।"

রাত ১টা। শহরের পুরনো মহল্লা থেকে পূর্ব-পাকিস্তানী ভদ্রলোকটি ফোন করলেন। বললেন, তিনি মেসিনগানের গুলি শুনতে পাচ্ছেন। তিনি নিজের ঘরেই দোর বন্ধ করে বসে আছেন। একটু পরেই টেলিফোন নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হল। অটোমেটিক অস্ত্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তারই মাঝে মাঝে বড়রকমের বিস্ফোরণের শব্দও। রাস্তায় সামরিক জীপে 'রিকয়েললেস রাইফেল' বসানো হয়েছে।

রাত ৩টা। হোটেলের কাছেই সংবাদপত্র 'পিপল'-এর অফিস। সৈন্যরা মশাল হাতে নিয়ে সেদিকে এগোচ্ছে। কিছুটা চিৎকার শুনতে পাচ্ছি গুলিগোলারও শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অফিসে ওরা আগুন লাগিয়ে দিল। ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত এই সংবাদপত্র গভর্নমেণ্টের অতি কড়া সমালোচক। এরপর হোটেলের অতি কাছেই আরও গুলিগোলার শব্দ। চিৎকার ও উল্লাস ধ্বনিও যেন শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না অপর দিক থেকে প্রচণ্ড গুলিগোলার শব্দ আসছে।

সূর্যোদয় কাল। গুলিগোলার শব্দ এখন শোনা যাচ্ছে না। পথঘাট সম্পূর্ণ জনহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিক থেকে এক বিরাট ধূম্রপুঞ্জ আকাশের দিকে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। সৈন্যরা যদি ভারী অস্ত্র দিয়ে সেখানে আক্রমণ চালিয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই বিপুল প্রাণহানি ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছুটি ঘরে রাত্রে গাদাগাদি করে শুয়ে থাকেন এবং প্রতি ঘরে প্রায় চারশো জন।

সকাল সাতটা। আমরা কয়েকজন সাংবাদিক ১২ তলায় গেলাম, সেখানে ভুট্টো রয়েছেন, ভুট্টোর ছুজন দেহরক্ষী রাইফেল উঁচিয়ে

দাঁড়িয়ে আছেন। ভুট্টোর দলের একজন হলঘরে এলেন। জিজ্ঞাসা করায় বললেন, রাত্রে যে কী ঘটেছে তার বিন্দুবিসর্গও তাঁরা জানেন না। ভুট্টো ঘুমিয়ে আছেন। ৭-৩০ মিনিটে তাঁকে জাগিয়ে দেওয়ার হুকুম রয়েছে।

সকাল ৮টা। এক বেতার ঘোষণায় করাচি থেকে জানানো হল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং আজ রাত ৮টায় জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেবেন। অতএব অভ্যুত্থানের ফলে ইয়াহিয়ার ক্ষমতাচ্যুতির গুজবটি মিথ্যা হয়ে গেল। টেলিফোন এখনও নিষ্ক্রিয়।

৮-৩০ মিঃ, কথায় কথায় জানা গেল ভুট্টো চলে যাচ্ছেন। নীচের লবিতে ছুটে গেলাম। ছদ্ম আবরণে ঢাকা মিলিটারী বাস ও একখানা মোটরকার লবির সামনে এসে দাঁড়াল। সৈন্যরা এসে লবি দখল করে ফেলল। ভুট্টো এলেন ধূসর রঙের ট্রাউজার ও নীল রঙের টাই গলায়। কিছু বললেন না তিনি। 'আমার কিছুই বলার নেই।' তিনি গাড়ীতে উঠে বসলেন। দুই দেহরক্ষী দুইপাশে বসলেন এবং তাঁদের রাইফেলের নল জানলার বাইরে বাড়িয়ে রাখলেন। তাঁরা যেভাবে ট্রিগারের ওপর আঙুল রেখে প্রস্তুত রয়েছেন তাতে আমরা সবাই যেন ঘাবড়ে গেলাম। ভুট্টোর একজন একান্ত সচিব বললেন, আগের দিন বেলা ৫টায় ভুট্টোর উপদেষ্টা যখন প্রেসিডেন্ট ভবনে বৈঠক সেরে ফিরে এলেন, তখনই তাঁরা জানতেন রাজনৈতিক মীমাংসার সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছে। এটার কারণ কি এই যে, মুজিব-ইয়াহিয়া মীমাংসার সর্ত ভুট্টো মেনে নিতে পারলেন না অথবা সেনাবাহিনীর চাপে পড়েই ইয়াহিয়া মীমাংসা করলেন না। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ভুট্টোর সাঙ্গপাঙ্গরা হয়ত এ ধারণাই সৃষ্টি করতে চাইছেন যে তাঁদের মনিব রাজী হলেন না বলেই মীমাংসা হল না। ভুট্টো চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা

বারান্দায় গেলাম। সৈন্যরা হুকুম হাঁকল, 'ভেতরে যাও', একজন লেঃ কর্নেল হুকুম দিলেন, হোটেল ছেড়ে কেউ বাইরে যেতে পারবে না। বিদেশী বলে কেউ রেহাই পাবে না। আমরা ভেতরে না গেলে তিনি গুলি করবেন।

অগত্যা চলে গেলাম ভেতরে। ক্যাপ্টেন হোটেলের পাকিস্তানী অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন, 'পনেরো মিনিটের মধ্যে যদি হোটেলের মাথায় পাকিস্তানী পতাকা তুলতে না পারো, তবে তোমাকে গুলি করে মারব।' এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন। হোটেলের কর্মচারীরা একখানা পাকিস্তানী পতাকা নিয়ে এলেন এবং সেটি তুলতে যাবেন এমন সময় অন্য সৈন্যরা হুকুম দিলেন, 'বাইরে যেতে পারবে না, গলা বাড়ালেই গুলি।' দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই সেনাবাহিনীর মনমেজাজ একই ধরনের।

সকাল ৯টা। বেতার ঘোষণায় জানা গেল, ২৪ ঘণ্টার কারফিউ চলছে এবং যে কেউ রাস্তায় বের হবে, তাকেই দেখামাত্র গুলি করা হবে। বেলা ১০টায় একটি বিশেষ ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হল। হোটেলের ম্যানেজার কোথাও থেকে একজন পাচক সংগ্রহ করলেন এবং তাকে দিয়েই প্রাতরাশ ও কফির ব্যবস্থা করলেন।

বেলা ১০টা। হোটেলের মাথায় পতাকা তোলা হল। হোটেলের ম্যানেজার বললেন, 'সবরকম পতাকাই আমরা হাতের কাছে রেখে থাকি।' বিশেষ ঘোষণা আসলে সামরিক আইনের অন্তর্ভুক্ত নির্দেশের একটি ফিরিস্তি, কিন্তু কারফিউর কথা এবার উল্লেখ করা হল না।

মধ্যাহ্ন। ওপরে উঠবার সিঁড়ির জানালা পথে দেখলাম জনহীন রাজপথে জীপ ও ট্যাংকগুলি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা যথেষ্ট গুলিগোলা ছুঁড়ছে বলেই মনে হল। তারা যে পথে চলে গেল,

সে পথের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আরও দুটি বিরাট ধূম্রকুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠছে। একটি যেন শহরের পুরনো মহল্লায়। সেদিকেই, যেদিকে আওয়ামী লীগের অফিস রয়েছে। এ এক অভিশপ্ত সাংবাদিক জীবন। এত কিছু দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বাইরের পৃথিবীকে কিছুই জানাতে পারছি না। শর্টওয়েভে পৃথিবীর যে সকল সংবাদ শুনেছি তাতে বুঝতে পারছি এই জঙ্গী প্রচণ্ডতার একটি কথাও এযাবৎ বাইরের পৃথিবীর কানে পৌঁছেনি। নিদারুণ অসহায়তায় নিজের আঙ্গুল কামড়াতে ইচ্ছে করে।

শুক্রবার বেলা ১২-৩০মিঃ—সামরিক বাহিনীর যে লেঃ কর্নেলটি আগে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি আবার ফিরে এলেন এবং মেহেরবানি করে জানালেন যে, সময় কাটাবার জন্যে আমরা ইচ্ছে করলে সুইমিং পুল ব্যবহার করতে পারি। তিনি এই মর্মেও হুকুম জারি করে বলেন যে, কেবলমাত্র বিদেশীরাই সুইমিং পুল ব্যবহার করবে এবং পাকিস্তানীরা হোটেলের ভেতর আটক থাকবে। শহর বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি অস্বীকার করলেন এবং বললেন, 'অত কথায় কাজ কি ? সুইমিং পুলে নেমে শরীর ঠাণ্ডা করে নিন।' বিকালটা শান্তিতেই কাটল। মাঝে মাঝে অবশ্য বন্দুক ও মেসিনগানের শব্দ শুনলাম। শহরের দক্ষিণ প্রান্তের আকাশে আবার ধূম্রকুণ্ডলী। সূর্য নেমে যাচ্ছে, আরও ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিক।

রাত্রি ৮-১৫ মিঃ—ইয়াহিয়ার বেতার বক্তৃতা শুনলাম। তিনি মুজিবুরের অসহযোগ আন্দোলনকে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' বলে মনে করেন এবং মুজিবুরের আওয়ামী লীগকে তিনি 'বেআইনী-প্রতিষ্ঠান' বলে ঘোষণা করলেন। লবিতে নেবে গেলাম, সেখানে কাউকে দেখতে পেলাম না। ইয়াহিয়ার বেতার বক্তৃতা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাংবাদিকদের পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বলা হল এবং এই বলার

সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সবাইকে একসঙ্গে ট্রাকে তুলে নিয়ে বিমান বন্দরের দিকে চালান করে দেওয়া হয়েছে। যেভাবেই হোক, আমাকে তুলে নিতে ওরা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই হোটেলের জঙ্গীরা আমাকে জীপে তুলে নিয়ে বিমান বন্দরে পৌঁছে দিয়ে আসতে চললেন। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্যরা যে ধরণের শিরস্ত্রাণ পরতেন, তেমনিই শিরস্ত্রাণ পরিহিত এক ছোকরা বয়সী লেফটেন্যান্ট হলেন আমার ড্রাইভার। তাঁরা আমার সুটকেশটি এনে সৈন্যবোঝাই সাঁজোয়া গাড়ীতে তুলে দিলেন। লেফটেন্যান্ট তাঁর রেডিও অপারেটারকে জীপের পেছনের আসনে বসতে বললেন। রেডিও অপারেটারের পাশেই আমাকে বসতে বলা হল। বসলাম। সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জীপ ছুটে চলল। প্রত্যেকটি বাড়ীর দরজা জানালা বন্ধ, হেডলাইটের আলোতে সেগুলির দিকে চোখ পড়তেই আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে যেতে লাগল। কোথাও জীবনের চিহ্নমাত্র নেই। আগের রাত্রে লোকেরা ইঁটপাথর ও গাছের গুঁড়ি দিয়ে যে সকল ব্যারিকেড রচনা করেছিল, সেগুলি উড়িয়ে দিয়ে সামরিক ট্রাক চলাচলের উপযোগী চওড়া রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। জীপ বিমানবন্দরের দিকে ছুটছে। লেফটেন্যান্টের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে ইচ্ছুক নন, বিশেষ করে লড়াই বা হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে তিনি একেবারেই চুপ করে গেলেন। 'কতদিন এই ব্যবস্থা চলবে বলে তিনি মনে করছেন,' জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'আমি শুধু হুকুম তামিল করি, ওসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো কাজ নয়।' একটু পরে অকস্মাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসিহাসি মুখে বললেন, 'দেখবেন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ওদের বদ মাথা আমরা ঠাণ্ডা করে দেব।' রেললাইনের লেভেল ক্রসিংএ ছুসারি কুঁড়েঘরে আগুন জ্বলছে। যাঁরা এখানে এতদিন বাস করতেন এবং

যাঁদের পথের পাশে বসে চব্বিশঘণ্টা আড্ডা দিতে আমিও দেখেছি—তাঁদের চিহ্নমাত্রও আজ নেই। লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা গেল কোথায়?' মাথা নেড়ে তিনি জবাব দেন, 'আমি জানি না।'

রাত ১১-৩০ মিঃ।—এত তাড়াহুড়ো করে আমাদের বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হল যদিও—কিন্তু করাচিগামী বিমানের কোন পাত্তা নেই। সেটি এখনও এসে পৌঁছয়নি। আমরা একদলে ২৫ জন সাংবাদিক। এক একজন করে সাংবাদিকদের জিনিসপত্র তল্লাসী করে দেখতে সময় লাগল মোট ৩ ঘণ্টা। এমনি একটি গুজব কানে এল যে, বাংলা দেশের পতাকা কেউ বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটা দেখার জন্য বিশেষ করে তল্লাসী করা হচ্ছে। 'একস্‌পোজ্‌ড্‌' ফিল্ম দেখা মাত্রই বাজেয়াপ্ত করা হল। কয়েকজন সাংবাদিক ইতিমধ্যে লাউনজে বসে তাঁদের রিপোর্ট টাইপ করছিলেন দেখে সেগুলি কেড়ে নেওয়া হল। পোর্টেবল টাইপরাইটারগুলিও বাজেয়াপ্ত করা হল। বলা হল করাচিতে নেমে এগুলি ফেরৎ পাবেন।

বিমান বাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট এসে বললেন—এতগুলি লোককে নিয়ে যাবে, অথচ বিমান এসে পৌঁছল না।

রাত ৩টা। 'এ-৭০৭' যাত্রিবাহী জেট বিমান এল। আমরা চড়ে বসলাম। আমাদেরই সহযাত্রী একজন পাকিস্তানী যাত্রী বললেন, সৈন্য বোঝাই হয়ে বিমানখানা একটু আগেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসেছে। এই বিমানবন্দরেরই কোন একস্থানে সৈন্যদের নামিয়ে দিয়ে অতঃপর আমাদের তুলে নিতে এসেছে।

শনিবার মধ্যাহ্ন। অতঃপর করাচি বিমান বন্দর। ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে এবং সিংহলে থেমে এই বিমানপর্যটন অত্যন্ত ক্লান্তিকর। কিন্তু মাটিতে পা দেবার আগেই শোনা গেল, শুল্ক অফিসাররা এখানে আর একদফা তল্লাসী করবেন। সেনসর না

করিয়ে যাতে রিপোর্ট পাঠানো যায়, সেজন্যে আমাদের কেউ কেউ বোম্বাইগামী বিমান ধরার চেষ্টা করছেন। তল্লাসীর নতুন ঝামেলার ফলে সে বিমান ধরার চেষ্টা হয়তো নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কিন্তু বিমানবন্দরের কর্মীরা সাফ জানিয়ে দিলেন, তল্লাসী চলবেই, এজন্য যদি বোম্বাইগামী বিমানকে খানিকটা বিলম্ব করাতে হয়, তাও করাব।

বেলা ১টা। ইন্সপেক্টার আমার জিনিসপত্র তল্লাসী করতে এলে বললাম 'একবার ঢাকা বিমানবন্দরে তল্লাসী হয়েছে, আবার কেন ?' ইন্সপেক্টর কড়া জবাবে বললেন, 'বিশেষ হুকুম আছে।' তিনি আমার নোটবই, ঢাকা থেকে পাঠানো আমার তারবার্তার কপি, সংবাদপত্রের ক্লিপিং এবং এমনকি আমার স্ত্রীর লেখা একখানা চিঠিও বাজেয়াপ্ত করলেন। এখানেই শেষ হল না। আমার ক্যামেরাব্যাগে যে ১৪ রোল আনএক্সপোজড্ ফিল্ম ছিল সেগুলিও কেড়ে নিলেন। এগুলি ফেরৎ চাইলে তিনি বললেন, 'ডাকযোগে পরে এগুলি ফেরৎ পাবেন।'

১ টা ৪৫ মিঃ। বোম্বাইগামী বিমানে উঠে বসলাম, এটা আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, ওরা আমার নোটবইসহ সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেলেও এই ডায়েরী এবং ঢাকায় বসে লেখা আর একটি বার্তা যে আমার হিপ পকেটে লুকানো ছিল তারা তা জানতে পারে নি। এই বিমানেই আমার সহযাত্রী অপর এক সাংবাদিকের দেহ তল্লাসী করা হয়েছিল এবং তাঁর জামার আস্তিনে লুকিয়ে রাখা ঢাকার অবস্থার রিপোর্ট তারা কেড়ে নিয়েছিল

দিনাজপুরে অস্থায়ী সরকারের দেশে দুই দিন

২৩শে মার্চ বড়খানার জন্য ডেকেছিল ই পি আরের বাঙ্গালী ফৌজী ভাইদের। জনতা যেমন আগেই বিপদ বুঝে প্রস্তুতি নেবার

জন্য তৈরী হচ্ছিলেন তেমনি ই পি আর বাহিনীও একটা বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন। পিণ্ডির কর্তাদের একটা সিক্রেট খবর ওয়ারলেসে পেয়ে ই পি আর ধরে ফেলে। বোঝে, পিণ্ডির পাক সৈন্যরা ওদের মেরে ফেলবে। ২৩ মার্চ যখন ই পি আর-এর বাঙালী সৈন্যদের নিরস্ত্র হয়ে খানাপিনায় আসতে হুকুম দেয় পাঞ্জাবী বড় কর্তা তখন এরা জানায়, সবাই নিরস্ত্র না হলে আমরাও হবো না। ২৫ মার্চ আবার খানাপিনার ডাক পড়ে। আর এদিকে ই পি আর বাহিনীর বাঙ্গালীদের অন্যত্র বদলীর আদেশ দিতে থাকে। পাক ফৌজ আসতে থাকে বাইরে থেকে। পাঞ্জাবী সৈন্যরা মেসিনগান, মর্টার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে নিজেদের এলাকাগুলি সজ্জিত করতে থাকে।

এদিকে মুজিবুর-ইয়াহিয়া ব্যর্থ বৈঠক, জনতার মিছিল সব খবরই দ্রুত দাবানলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ই পি আর খবর পায় পাঞ্জাবী সৈন্যরা মেজরের নির্দেশে রবিবার রাত ৮ টায় আক্রমণ করবে। ই পি আর প্রস্তুত হতে থাকে। ই পি আরের বিভিন্ন সদস্যরা গ্রাম এবং শহরের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে দেয় আক্রমণ হলেই পাল্টা আক্রমণ হবে এবং জনতা যেন কার্ফ্যু ভঙ্গ করে ই পি আরের সঙ্গে যোগ দেয়।

ই পি আরের জনৈক বড়কর্তাকে মেজর আগের দিন রাতে ডেকে পাঠায় এবং কার্ফ্যু জারী হয়েছে এটা প্রচার করার দায়িত্ব দেয়। সেই বড়কর্তা বর্তমানে দিনাজপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান। মেজরের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময়ে নিজের কোমরে গুলি ভর্তি রিভলবার নিয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'ভেবেছিলাম আমায় যদি গুলি করে তার আগে অন্তত দুইজনকে মেরে যাব।' বললাম, 'কিন্তু আপনারা এই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন কেন?' বললেন, 'বাঁচার জন্য। আর চারদিকে চেয়ে বুঝেছি দেশপ্রেম কি? গণ জাগরণ কি?'

শত্রুপক্ষ আক্রমণ করার আগেই তাদের আক্রমণ করা হবে বলে ই পি আর স্থির করে। ঠিক হয় ২৮ তারিখে সন্ধ্যা ৬ টায় আক্রমণ হবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত জনৈক বাঙ্গালী ই পি আরই শত্রুপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার খবর জানতে পেরে ঐ বিশেষ মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে ই পি আর বাহিনী বেলা আড়াইটায় আক্রমণ শুরু করে। সার্কিট হাউস থেকে পাঞ্জাবী সৈন্যরা মেসিনগানের গুলি চালাতে আরম্ভ করে। এদিকে জনতা, ন্যাপ-এর উভয় অংশের নেতৃত্বে কার্ফ্যু অমান্য করে বেরিয়ে পড়ে। দুইদিন ধরে দারুণ যুদ্ধের পর পাঞ্জাবী সৈন্য পরাজিত হয় এবং রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। শত্রুপক্ষের হাতে ই পি আর এবং জনতার প্রায় এক হাজার নরনারী নিহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়া শহরের মুক্তি সংগ্রামের আলেখ্য

শেখ মুজিবুরের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনার সময় থেকেই কুষ্টিয়ার তরুণরা অস্ত্রচালনায় ট্রেনিং নিচ্ছেলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ানের শখানেক সক্রিয় কর্মী। এঁদের কাছে ছিল ৩৫টি রাইফেল ও হাজারখানেক গুলি।

২৫ মার্চ রাত্রি থেকে সারা দেশে শুরু হল সামরিক নিপীড়ন। সর্বত্র জারী হল ৩০ ঘণ্টা ব্যাপী সান্ধ্য আইন। জনৈক তরুণ প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়: "ভোর চারটে নাগাদ যাচ্ছিলাম থানাপাড়ার আমবাগানের দিকে। ওখানে ঐ সময়ে ট্রেনিং হত আমাদের। হাইড রোডে হঠাৎ মিলিটারী পথরোধ করল। উর্দুতে প্রশ্ন করল কে? কি নাম? কোথায় যাবে? একজন বাঙ্গালী অফিসার এগিয়ে এসে বাংলায় তর্জমা করে দিলেন কথাগুলো। জানালাম মা'র অসুখ, থানাপাড়ায় যাচ্ছি মা'র সঙ্গে দেখা করবার জন্য, যেহেতু সারা রাত মার জন্য চিন্তায় উদ্বেগে ঘুম আসছিল না। ওরা যেতে

দিল না। সকালবেলা রেললাইন ধরে থানাপাড়ার দিকে এগুলাম। মিউনিসিপ্যালিটি বাজারের কাছে আমার সামনেই এক তরুণকে ওরা গুলি করে হত্যা করল। ঘটনাটা দেখামাত্র আমি এগিয়ে গেলাম কে পড়ে গেছে ভাল করে বোঝার জন্য। ইঁটের টুকরোর সঙ্গে আমার রবারের চটির সংঘাতে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম।

আর তখনই দেখলাম মিলিটারী বন্দুক উঁচিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। কোনমতে প্রাণভয়ে উঠে চোঁ-চাঁ দৌড়ালাম থানা-পাড়ার দিকে।"

সেদিন অর্থাৎ শুক্রবার, ২৬ মার্চ সকালে কুষ্টিয়ার সংগ্রাম পরিষদ সারা শহরে ব্যারিকেড তৈরীর সিদ্ধান্ত নিল। সেই অনুযায়ী দিকে দিকে গড়ে উঠল ব্যারিকেড, শুরু হল ইয়াহিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। ১২ জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হলেন ঘটনা-স্থলেই।

ঐ রাত্রেই কুষ্টিয়ার তরুণরা ভারতীয় রেডিও শুনে জানতে পারলেন সমগ্র 'বাংলাদেশ'-এ জনগণের পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইস্ট-পাকিস্থান রাইফেলস মিলিটারীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংবাদ তাঁদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। সেদিন (২৬শে মার্চ) রাত্রেই অধিকাংশ তরুণ গ্রামে চলে গিয়ে ই পি আর ও সশস্ত্র জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

সান্ধ্য আইন বলবৎ করার পরেই পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করল—কারো কাছে কোন অস্ত্র থাকলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা জমা দিতে হবে সেনাবাহিনীর কাছে। কুষ্টিয়া শহরের বিত্তবানরা এই ঘোষণায় ত্রস্ত হয়ে প্রচুর বন্দুক জমা দিয়ে এসেছেন। জমা পড়ল মোট ৩৫০টি বন্দুক ও টোটা ভরা রাইফেল এবং কিছু পিস্তল।

যে সকল তরুণ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ই পি আর ও সশস্ত্র জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, তারা রবিবারের মধ্যে শহরে

ফিরে এসে জানালেন সোমবার ২৯ মার্চ রাত্রে কুষ্টিয়া শহর ঘিরে ফেলে শহর-মুক্তির যুদ্ধ শুরু হবে।

এদিকে সোমবার (২৯শে মার্চ) সান্ধ্য আইনের কড়াকড়ি কিছুটা হ্রাস করা হল, নিম্ন বেতনভুক কর্মচারী ছাড়া উঁচুতলার কর্মচারী অর্থাৎ মোট কর্মচারীর ২৫ শতাংশ অফিসেও যোগ দিলেন।

কিন্তু প্রত্যাশিত সম্ভাবনা রূপায়িত হল না। সোমবার রাত্রের মধ্যে ই পি আর ও সশস্ত্র জনগণ এসে পৌঁছতে পারলেন না কুষ্টিয়া শহর পর্যন্ত। আশপাশের গ্রামসমূহে—কুন্দলাপুর, বারাদি, বারখাদ, বিষ্ণুপাড়া, পোড়াদহ প্রভৃতি অঞ্চলেই ঘাঁটি গেড়ে তারা সোমবার (২৯শে মার্চ) রাত্রি কাটালেন।

মঙ্গলবার ৩০শে মার্চ ই পি আর-এর জনৈক মেজর বে-সামরিক পোশাকে এসে কুষ্টিয়া শহর পরিদর্শন করে গেলেন। আর তারপর রাত্রেই মুক্তিবাহিনীর (শতখানেক ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী যারা সশস্ত্র লড়াইয়ের ট্রেনিং নিয়েছিলেন, তারা এবং শহরের পুলিশও মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন) চারদিক দিয়ে কুষ্টিয়া শহর আক্রমণ করল। একদিকে পূর্ণাঙ্গ সামরিক শিক্ষণপ্রাপ্ত, চীনা ও মার্কিন অস্ত্র চালনায় সুদক্ষ ২১০ জন পাক সৈন্য, অন্যদিকে ই পি আর পুলিশ ও সশস্ত্র জনগণের মিলিত মুক্তিবাহিনীর হাতে শুধু বন্দুক, তাও সীমিত সংখ্যক। আর ইয়াহিয়া সৈন্যদের কাছে আধুনিক অস্ত্র ছাড়াও চীনদেশে তৈরী হাল্কা স্বয়ংক্রিয় বন্দুক এবং লাইট মেসিনগান এ হেন সময় বিশেষ উপযোগী।

স্থির ছিল—বারাদি, বারখাদা থেকে মুক্তিবাহিনীর একাংশ পুলিশ লাইন আক্রমণ করা মাত্র পুলিশেরা সক্রিয়ভাবে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে। মুক্তিবাহিনীর অপরাপর অংশগুলি যুগপৎ পোড়াদহ থেকে জেলা স্কুল ও থানা (জেলা স্কুলে সামরিক শিবির স্থাপন করেছিল ইয়াহিয়া বাহিনী), বিষ্ণুপাড়া থেকে জেলা স্কুল এবং

কুমিলাপুর থেকে বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র (ওয়ারলেস স্টেশন) আক্রমণ করে শত্রুকে অতর্কিতে পরাস্ত করবে।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। ই পি আর-এর উপরিল্লিখিত মেজর জেলা প্রশাসকের কাছে সোমবার রাত্রেই একটি বিশেষ অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন—পুলিশদের ব্যবহারের জন্য যে সকল অস্ত্র মজুত করা আছে সেগুলি পুলিশের হাতে দিয়ে দিন। জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপারকে (এস পি) সেই মত নির্দেশ দিলেন। আর তারপরেই দেখা গেল, অস্ত্রদান তো দূরের কথা এস পি পুলিশদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করলেন। নতুন আদেশ দিলেন তিনি—'হাউসিং এস্টেট'-এ দাঙ্গা বাধার উপক্রম, ওখানে লাঠি সড়কী নিয়ে গিয়ে দাঙ্গা রোখো। আসলে ও ধরনের কোন অবস্থা 'হাউসিং এস্টেট'-এ ঘটেনি। এস পি-র আদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—পুলিশদের সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সকল সংযোগছিন্ন করা। কিন্তু পুলিশেরা এস পি-র আদেশ লঙ্ঘন করে মঙ্গলবার রাত্রে মজুত অস্ত্র ছিনিয়ে নিলেন। মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পুলিশ লাইন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী মুক্তিবাহিনীর পাশে এসে দাঁড়ায়।

বারাদি, বারখাদা থেকে পুলিশ লাইন আক্রমণ শুরু হল বুধবার ভোর চারটা নাগাদ। লাল ও সবুজ আলো বিচ্ছুরিত করে দুটো বোমার বিস্ফোরণ আক্রমণ শুরুর নির্দেশ পৌঁছে দিল শহরের সকল প্রান্তে। তুমুল যুদ্ধের পর বুধবার রাত্রের মধ্যেই পুলিশ লাইন ও জেলা স্কুল চলে এল মুক্তিবাহিনীর বশে। বৃহস্পতিবার ১ এপ্রিল সকালের মধ্যে ওয়ারলেস স্টেশনও দখল করে নিল মুক্তিফৌজ।

জেলা স্কুলে যখন পাক সৈন্যরা প্রায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত সে সময় মুক্তি বাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (যুদ্ধ হওয়া মাত্র তিনি জেলা প্রশাসকের সমগ্র ক্ষমতা করায়ত্ত করেন)। পায়ে তাঁর গুলি লেগেছে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তরুণ এক ছাত্রের সামনে

এসে বললেন, "কোরাণ শরিফের শপথ নিয়ে বলছি আমি কোন অপরাধ করিনি। তোমায় ১,১০০ টাকা দেব—আমায় জানে মেরো না। আর ১৫০০০ টাকা দিচ্ছি আমার পায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দাও।" আগুন জ্বলে উঠল তরুণের চোখে। ঘুষ দিয়ে প্রাণ ভিক্ষা? মুক্তিফৌজের সামনে এর চেয়ে বড় অপরাধ নেই। বন্দুক উঁচিয়ে তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে হত্যা করলেন ১৯ বছরের যুবা।

বৃহস্পতিবার ১ এপ্রিল সকাল দশটার মধ্যে সমগ্র কুষ্টিয়া শহর মুক্ত হল। বহু অস্ত্র—মূলতঃ চীনা ও মার্কিন—মুক্তিফৌজের হাতে এসে গেল। বন্দী হল ইয়াহিয়া বাহিনীর ১৩ জন সৈন্য আর শ' দেড়েক সক্ষম হল পালাতে। পলাতকদের অধিকাংশই পরে গ্রামবাসী তথা শস্ত্রবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নিহত হয়।

কিছু পরেই কুষ্টিয়ার আকাশে দেখা গেল জেট ফাইটার বিমান। আমবাগানের মধ্যে জেলা স্কুল। তার পাশেই সার্কিট হাউসের বড় দালান। বিমান থেকে সৈন্যরা ঐ সার্কিট হাউসকেই জেলা স্কুল বলে ভুল করল তাই বোমা পড়ল জনশূন্য সার্কিট হাউসের উপরেই। ততক্ষণে প্রকৃত জেলা স্কুলের ছাদে বেশ কিছুসংখ্যক মেসিনগান লাগানো হয়েছে। জেট বিমান লক্ষ্য করে নিচ থেকে গুলি ছোড়াও হল। বিমান হানা শেষ হতে লাগল কয়েক মিনিট।

পাবনার মুক্তিসংগ্রামের দিনপঞ্জী

২৫ থেকে ২৮ মার্চ

২৬ মার্চ

সেদিন শুক্রবার, বাজার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সামরিক বাহিনীর অতর্কিত হস্তক্ষেপে সন্ত্রস্ত মানুষ সেদিন আর বাজারে যেতে

পারেন নি—বাজার বসেও নি। সারাদিন শহরে সন্ত্রাস ও কবরের নীরবতা বিরাজ করিতে থাকে।

ইতিপূর্বে তারা পাবনার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন, প্রধান ডাকঘর প্রভৃতিতে পজিশন নিয়ে ফেলে—বেসামরিক লোকজনকে হটিয়ে দেয়।

চলতে থাকে সারা শহরে মুক্তিবাহিনীর গোপন তৎপরতা। তারা আক্রমণ চালাবার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

শুক্রবার রাতে কতিপয় বিশ্বাসঘাতক লোকজনের সহায়তায় সামরিক বাহিনী স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের বাড়ীতে হানা দেয়। কিন্তু বেশীর ভাগকেই তারা পায় না—তাঁরা পূর্বাহ্নেই সরে গিয়েছিলেন। শুধুমাত্র সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্পাদক এবং এম পি এ জনাব আমিনুদ্দিন আহমেদ, ভাসানী পন্থী ন্যাপের ডাঃ অমলেন্দু দাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু সাইদ তালুকদার, একজন রাস্তার পাগল (রাজেন পাগল) ও জনৈক পৌর কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। রাস্তা থেকে আরও বেশী সাধারণ লোককে গ্রেপ্তার করেছিল কিন্তু ক্যাম্প নিয়ে গিয়ে মারধর করে পরে তাদের মুক্তি দেয়।

শুক্রবার তারা পুলিশ লাইনে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র সামরিক বাহিনীকে দিয়ে দিতে বলে—কিন্তু তারা পুলিশ সুপারের নির্দেশ না পেলে দেবে না বলে জানিয়ে দেয়।

২৭ মার্চ

শনিবার সারাদিন কারফ্যু বলবৎ থাকে। হাট বাজার বন্ধ—কিন্তু মুক্তিবাহিনীর গোপন প্রস্তুতি অব্যাহত থাকে। এই দিন সামরিক বাহিনীও সারা শহরে টহল চালু রাখে। সকালে গণ-সংযোগ অফিসারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় বন্দুকের নলের ডগায় তাকে বিভিন্ন নির্দেশ প্রচার করতে বাধ্য করে।

সন্ধ্যায় তারা গিয়ে পুলিশ লাইন ও ম্যাগাজিন আক্রমণ করলে তারা প্রতিহত হয়। ফিরে যায় তখনকার মতো। কিন্তু অজস্র গুলিগোলা চালায়। ফাঁকা আওয়াজও করে শহরের সকল প্রান্তে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা করে।

শেষরাতে আবার সামরিক বাহিনী এসে পুলিশ লাইন ও ম্যাগাজিন আক্রমণ করে। পুলিশ বাহিনীও সারারাত প্রস্তুত ছিল, তারা বীরত্বের সাথে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করে। সামরিক বাহিনীর কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে, বাঙ্গালী পুলিশের গুলিতে নাস্তানাবুদ সামরিক বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে জনৈক বিশ্বাসঘাতক পুলিশকেও মুক্তিবাহিনীর পুলিশেরা গুলি করে হত্যা করে সে গোপনে সামরিক বাহিনীকে খবরাখবর দিচ্ছিল।

রবিবারে রক্ত সূর্যোদয় ইতিমধ্যে সকাল হয়ে যায়—রবিবার সকাল। পাবনার ইতিহাসে গণ-বিপ্লবের সূচনা হয় সেদিনের ভোরের রক্ত সূর্যের উদয়ের সাথে সাথে।

পুলিশ বাহিনীর এই বিজয়ের সাথে সারা শহর সংগ্রামী রূপ নেয়। রাতের মধ্যেই সামরিক তৎপরতা সত্ত্বেও তৈরী হয়েছে অসংখ্য ব্যারিকেড—যেন এক অবরুদ্ধ নগরী।

এ ছাড়াও চলে সাধারণ মানুষের প্রস্তুতি। প্রস্তুতি মেহনতী মজুর ও কিষাণের। তারা ভোর হতে না হতেই হাজারে হাজারে লাঠি কালা সড়কি, তীর-ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সহ শহরের বিপ্লবীদের মনে জোগায় অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, সাহস ও প্রেরণা।

পুলিশ লাইনের বিজয়ের অব্যাহিত পরেই বেলা ন'টার মধ্যে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে আক্রমণ করা হয়। তিন থেকে চার ঘন্টা লড়াই-এর পর ৩০ জন পাঞ্জাবী সেনা নিহত হয় মুক্তিবাহিনীর হাতে। সূচিত হয় প্রথম গণবিজয়।

ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক সৈন্য শহরের পূর্ব প্রান্তে একটি ছোট্ট

বিস্কুট কারখানার ঘরে গিয়ে ঢোকে। খবর চলে আসে শহরে। মুক্তিবাহিনী ছুটে যায় সেখানে। হাজারে হাজারে মানুষ তাঁদের সাথে। অবরুদ্ধ হয় ফাঁকা মাঠের মধ্যে বিস্কুট কারখানা।

মুক্তিবাহিনীর গুলিতে নিহত হয় দুজন সৈন্য। দরজা-জানালা বন্ধ করে সৈন্যরা তখন ছোট্ট ফুকরির মধ্যে দিয়া রাইফেল উঁচিয়ে বসে থাকে। নেমে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। এই ভীত সন্ত্রস্ত সৈন্যরা তখন কারখানার শ্রমিকদের পরিত্যক্ত লুঙ্গি পরে সাধারণ মানুষের বেশে পালিয়ে গিয়ে একটি গ্রামে আশ্রয় নিলে সেখানকার লোক-জন বীরবিক্রমে তাদের আক্রমণ করে। মৃত্যু ঘটে সৈন্যদের।

সৈন্যদের সঙ্গে গ্রামের মানুষের হাতে হাতে লড়াই

এই দিনই অপরাহ্ণে বিজয়মত্ত সংগ্রামী মুক্তিবাহিনী ও তাঁর বিশ্বস্ত দোসর সাহায্যকারী হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক গিয়ে ঘেরাও করে পাবনার সামরিক বাহিনীর মূল ক্যাম্পটিকে। প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। দু'জন টাওয়ার গার্ড মুক্তিবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়। ক্যাম্পের সামরিক বাহিনীর লোকেরা আর কাউকে তখন আর টাওয়ারে না পাঠিয়ে নিজেরা কাপুরুষের মতো ক্যাম্পের দালানে দরজা জানলা বন্ধ করে বসে থাকে। গোলাগুলিও চালনার সাহস তারা হারিয়ে ফেলে পুরোদস্তুর। মুক্তিবাহিনী ও হাজার হাজার মানুষ ঘিরে রাখে শত্রুর এই শেষ শিবিরটিকে। রাত শেষ হয়ে গেল। এলো সোমবারের সকাল। ভীরু সশস্ত্র বাহিনী ওয়ারলেসে ঢাকা ও অন্যত্র যোগাযোগ করে তাদের পালানোর গোপন পরিকল্পনা আঁটে। এই খবরটি মুক্তিবাহিনীর জানা ছিল না।

বোমারু বিমানের সঙ্গে রাইফেলের গুলি

যাই হোক সকাল ন'টায় আসে দুখানি জঙ্গী বিমান। তারা নীচে অবস্থিত মুক্তিবাহিনীর বন্দুক ও রাইফেলের গুলির সম্মুখীন

হয়। ওপর থেকে তখন তারা ভারী মেসিনগানের গুলি নিক্ষেপ করে সামরিক শিবির ঘিরে রাখা মুক্তিবাহিনীকে সরে যেতে বাধ্য করে। ইতিমধ্যে রাজশাহী থেকে সামরিক বাহিনীর ৪০ জন লোক সুসজ্জিত হয়ে জীপে ও ট্রাকে বহুদিনের পুরাতন রাস্তা দিয়ে পাবনার সামরিক বাহিনীর অবরুদ্ধ লোকজনকে নিয়ে পালিয়ে যায়। যাবার সময় তারা সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও এম পি এ জনাব আমিনুদ্দীন আহমেদ অ্যাডভোকেট, ভাসানীপন্থী ন্যাপ নেতা অমলেন্দু দাস, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু সৈয়দ তালুকদার ও রাজেন পাগলাকে গুলি করে হত্যা করে। পথিমধ্যে গ্রামের হাজার কৃষক তাদের ঘিরে ফেললে প্রচণ্ড লড়াই চলে। উভয় পক্ষেই হতাহত হয় অনেক। তখন সৈন্যরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পালিয়ে যায়। এক ভাগের গাড়ীগুলি মুক্তি-বাহিনীর গুলিতে অচল হয়ে যায়। তখন আবার প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়। সৈন্যরা গ্রামের কিছু বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় ৩০ জন সৈন্যের সবাই সেখানে নিহত। পলায়নরত অপর দলটিও কিছু দূরে গিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হয় এবং দীর্ঘ সময় লড়াইয়ের পর অধিকাংশ মৃত্যু বরণ করে। মোট প্রায় ১৫০ জন সৈন্য নিহত হয়। এর মধ্যে এদিক ওদিকে নানান গ্রামে ছিটকে পালিয়ে যাওয়া সৈন্যও রয়েছে। গ্রামের কৃষকেরাই তাদের মেরে ফেলেছে।

সেই অবধি—অর্থাৎ আজ ১১ দিন যাবৎ সারা পাবনা জেলা মুক্তিবাহিনীর দখলে। মুক্তিবাহিনী এই বিপ্লব-লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছে—নতুন নতুন বিজয়ের পরিকল্পনা করছে। গ্রাম থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষক জনতা এই মুক্তিবাহিনীর আহারের জন্য ভাত, রুটি, মাছ ইত্যাদি প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে রান্না করে পাঠাচ্ছে।

পাক সেনা বাহিনীর গণহত্যা। দিকে দিকে প্রতিরোধ

বাংলার রাজধানী ঢাকায় যখন একে একে পাকিস্তানের সকল প্রদেশের নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও

শেখ মুজিবরের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ করার অচলাবস্থা দূরীকরণের বিষয় সমূহ আলোচনা হয় এবং তখনকার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের বিবৃতি ও অবস্থা দৃষ্টে বাংলার গণমানসে যখন সমস্ত প্রাপ্তির আশা আন্দোলিত হচ্ছিল, যখন বাংলার নবরূপকে কি ভাবে গ্রহণ করা হবে তার প্রস্তুতি চলছিল, সেই সময় কেউ কি ভাবতে পেরেছিলেন বর্তমান বাংলার এই রূপ হবে? কেউ কি এই হত্যাকাণ্ডের কথা ভাবতে পেরেছিলেন? সারা বাংলার জনগণ ভেবেছিলেন ২৬শে মার্চ দেশ থেকে সামরিক আইন উঠে যাচ্ছে। মুজিবুরের দল ক্ষমতা বুঝে নিচ্ছে। কিন্তু না, বাংলা মায়ের সে প্রাপ্তি আর হল না। গভীর রাতের অন্ধকারে গোপন নির্দেশ দিয়ে গোপনে পালিয়ে গেলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেঃ ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টো। ২৫শে মার্চ গভীর রাতে যখন ঢাকা নগরে মানুষ নতুন স্বপ্নে বিভোর তখন ঢাকার চারপাশ অকস্মাৎ মেসিনগান কামানের গর্জনে ভরে উঠল। ভীত বিহ্বল জনগণের স্বপ্ন খান খান হয়ে ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে? গভীর আর্তস্বর—একি হোল?

চারিদিকে গোলাগুলির গর্জন আর গর্জন। দেখা গেল অনেক স্থানেই আগুন জ্বলছে। মানুষজন অসহায় ভাবে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে একটু সাহায্য পাবার আশায়।

সেনাবাহিনীর হামলার লক্ষ্য

ঐ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সর্বপ্রথম আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বাংলার পুলিশ বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার রাজারবাগ, পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর হেড কোয়ার্টার। ঢাকা ছাত্র আন্দোলনের হেড কোয়ার্টার ইকবাল হল, কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার সহ শহর এলাকার বিভিন্ন থানা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ঘর বাড়ী। পুলিশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে এসে সৈন্যবাহিনী

পুলিশ বাহিনীকে আত্মসমর্পণে নির্দেশ দেয়। পুলিশবাহিনী তাতে অস্বীকৃতি জানালে সৈন্যবাহিনী প্রথম মেসিনগান চালাতে শুরু করে। এর পর পুলিশ বাহিনীও পালটা গুলি বর্ষণ করতে শুরু করে। শেষ রাতের দিকে যখন সৈন্যবাহিনীর অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে ঠিক সেই সময়েই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে ট্যাংক বাহিনী। পুলিশ বাহিনী তখন প্রায় সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পলায়নপর পুলিশ বাহিনীকে খুঁজে বের করার জন্যে সৈন্যবাহিনী সার্চলাইট ব্যবহার করে যাকে তাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। শুধু মাত্র ১-২ জন কোন ভাবে আহত অবস্থায় প্রাণ নিয়ে বাঁচে। পিলখানার ই পি আর ক্যাম্পের উর্ধ্বতন অফিসাররা অবাঙালী— তারা আগে থেকেই এই দিনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। যার ফলে এই ক্যাম্প আক্রমণ করার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সকল ই পি আর জোয়ান নিহত হন। এদের অতি অল্প সংখ্যকই প্রাণ নিয়ে বাঁচতে সক্ষম হন।

নির্বিচারে হত্যালীলা

ছাত্র আন্দোলনের দুর্ভেদ্য দুর্গ ইকবাল হলের চারপাশে প্রথমে সৈন্যবাহিনী ঘিরে ফেলে এবং বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। সাথে সাথে ছাত্ররাও পালটা গুলিবর্ষণ করতে শুরু করলে আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী আগুনে বোমা নিক্ষেপ করে। হলে ডিনামাইট চার্জ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে ট্যাংকবাহিনী এসে হলের অক্ষত ঘরগুলির প্রতি গুলিবর্ষণ করে। হলে অবস্থানকারী বিভিন্ন দলের ছাত্র কর্মীবৃন্দ প্রায় সবই এই আক্রমণে নিহত হয়। এই আক্রমণে হলের হাউস টিউটর তার পরিবার পরিজন সহ নিখোঁজ হন। একই সময় সৈন্যবাহিনী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারও ডিনামাইটের চার্জে উড়িয়ে দেয়। এই শহিদ মিনার উড়িয়ে দেবার

শব্দ আশেপাশের এলাকা কাঁপিয়ে তোলে। এই আক্রমণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বহু রোগী, ডাক্তার, নার্সও মারা যায়। শহরের বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মচারীরাও তাদের থানা আক্রমণের সময় বেশ কিছুক্ষণ পালটা গুলিগোলা চালানোতে একদম স্তব্ধ হয়ে যায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাড়ীর মধ্যে শেখ মুজিবের বাড়ীই সৈন্য-বাহিনীর প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য হয়। ঐ বাড়ীর রক্ষকরা বেশ কিছুক্ষণ লড়াই করে সবাই মারা যান। শেখ মুজিবের বাড়ী মেসিনগান এবং ডিনামাইট চার্জে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

গণহত্যা শুরু

এরপর শুরু হয় গণনির্যাতন। বিভিন্ন পুরনো এলাকা অসংখ্য সৈন্যে ছেয়ে ফেলে এবং বাড়ী বাড়ী ঢুকে হাজার হাজার নিরীহ লোকজনকে ব্যাপকভাবে হত্যা করতে শুরু করে। লোকজন যে যেদিকে পারলো প্রাণ নিয়ে ছুটে পালালো। সৈন্যরা আগুনে বোমা নিক্ষেপ করলে যখন লোকজন প্রাণভয়ে এদিক-ওদিক ছুটো-ছুটি করতে আরম্ভ করতো, তখনই সৈন্যরা বর্বরভাবে মেসিনগান চালিয়ে ঐ সব লোকজনকে হত্যা করতে শুরু করে। সৈন্যরা বাড়ী ঘর দোকান পাট নির্বিবাদে লুঠ করতে থাকে। অসংখ্য মহিলার শ্লীলতা হানি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র মহিলা আবাসিক ছাত্রী আবাস রোকেয়া হলে প্রায় দেড় হাজার ছাত্রী থাকতো। পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হওয়ায় বিভিন্ন দলের প্রায় ৩৫০ জন কর্মী ছাত্রী ঐ হলে তখনো থাকতো। বর্বর সৈন্যরা ঐ সব ছাত্রীদের জোর করে ঢাকা ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায় নিয়ে যায়। ঐ সকল অসহায় মেয়েরা এখনও কেউ আর বাড়ী ফেরে নি। বর্বর সৈন্যরা প্রাণভয়ে পলায়নপর যুবতী মেয়েদের জোর করে ধরে বলাৎকার

করে। লজ্জায় বাংলার বহু মেয়ে নারীদের অবমাননায় তখন আত্মহত্যা করে। প্রথম রাতে বর্বর সৈন্যরা ঢাকা সদরঘাট টার্মিনাসে ঘুমন্ত কয়েক হাজার ভিখারীকে মেসিনগান দিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করে। ঢাকা শহর ২ দিনেই এক মৃতের এলাকায় পরিণত হয়। লাখ লাখ লোকজন অসহায় ভাবে ঢাকার চার পাশের বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় এক বস্ত্রে আশ্রয় নেয়। অনাহারে, অর্ধাহারে ওদের অনেকেই আজ মৃতবৎ। ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আবাসিক হলগুলি ধ্বংস করা হয়। বিভিন্ন গ্রামে পালিয়ে আসা বহু প্রত্যক্ষদর্শী ঢাকার বহু জ্ঞানী, গুণী, অধ্যাপক, শিক্ষক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নৃশংস ভাবে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে হত্যা করার কাহিনী বিবৃত করেন।

তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পুরনো ঢাকা আজ প্রাগৈতিহাসিক এলাকায় পরিণত হয়েছে। চেনার উপায় নেই. অনেকস্থানে দুদিন পর্যন্ত আগুন জ্বলতে দেখা গিয়েছে।

বিভীষিকাময় পরিস্থিতি

বিভিন্ন গ্রামে অবস্থানকারী হাজার হাজার অসহায় ছিন্নমূল শরণার্থীদের গ্রাম বাংলার লোকজন নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাবু খাটিয়ে চিঁড়া মুড়ি দিয়ে সাহায্য করছে, বাচ্চাদের দুধ সরবরাহ করছে। জিঞ্জিরার আশ্রয় শিবিরে প্রত্যহ হাজার হাজার প্রাণ ভয়ে ভীত লোকজন আসছে। অনেকেই শুধু পায়ে হেঁটে ৫০-৬০ মাইল দূর গ্রামে নিরাপত্তার জন্য চলে যাচ্ছে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে অসংখ্য লাস ভাসছে। মানুষ পচার গন্ধে চারিদিক বিভীষিকাময় করে তুলেছে। ঢাকার মীরপুর এলাকার সমস্ত বাড়ী ঘর আগুনে গুলিতে ধ্বংস হয়ে যায়। সৈন্যরা কালো পোশাকে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে থাকে। চট্টগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্র পাক সৈন্যদের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন—বাংলা দেশের অন্যান্য এলাকায় এই স্বাধীনতা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার বেশ আগে থেকেই চট্টগ্রামে পাক সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলছিল। তিনি ২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করেন। পথে ব্যারিকেড ও লাইন তুলে ফেলার জন্য অনেক স্থানে পায়ে হেঁটে, কোনস্থানে রিকসায়, কোন স্থানে স্কুটারে করে শনিবার সকালের দিকে ঢাকা পৌঁছান। মীরপুরে যখন নিজের ভাইয়ের বাসা খুঁজে ওখানে পৌঁছান তখন দেখেন—ওখানে আগুন জ্বলছে আর রাস্তাঘাট মৃতদেহে ভরে আছে, কুকুর শকুনে খাচ্ছে। পুতি-গন্ধে ঢাকার আবহাওয়া বিষাক্ত। শহর ছেড়ে হাজার ছাত্র জনতা গ্রামের পথে ছুটছে। গ্রামে গ্রামে ছেলেমেয়েরা চেয়ে চেয়ে ভিক্ষা করে খাবার খাচ্ছে।

দিকে দিকে প্রতিরোধ

ঐ সময় গ্রামের যুবকরা লাঠি সোঁটা নিয়ে যে যার মতো গ্রামের রাস্তাঘাট পাহারা দিচ্ছিলেন আর যে যার মতো শরণার্থীদের খাবারের সাহায্যের ব্যবস্থা করছিলেন। পথে পথে গ্রামবাসীরা অসংখ্য ব্যারিকেড রচনা করে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

পথের বিভিন্ন স্থানে গ্রাম বাংলার সর্বস্তরের মানুষ যে ভাবে পারছে শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত হচ্ছিল। সর্বত্রই বাংলার পুলিশ, আনসার, মোজাহিদ বাহিনী রাস্তার ধারে এবং সম্ভাব্য আক্রমণের পথের ধারে ওৎ পেতে বসেছিল। ঐ সকল গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের কারো হাতে বন্দুক, কারো হাতে রাইফেল, কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে সড়কি, লাঠি প্রভৃতি। পথের ধারে দেখা যাচ্ছে, আজ এক

সঙ্গে আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবক-বৃন্দ বাংলার স্বাধীনতার জন্য এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

মানিকগঞ্জে সকল ঘর বাড়ী গাড়ীতে, সরকারী বেসরকারী অফিসের গৃহে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে দেখা গিয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবক পুলিশ সবাই একযোগে এলাকা টহল দিচ্ছে।

আরিচা ফেরী ঘাটে কয়েক হাজার অসহায় মানুষের ভীড়ে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, ওর সাথে প্রায় ওরই সমান একটি মেয়ে। বাচ্চা মেয়েটির সাথে যে মেয়েটি ছিল ওর ডান হাত অর্ধেক কাটা। সে-ই ফুটফুটে মেয়েটির একমাত্র সঙ্গী। ওদের সাথের ভৃত্যের সঙ্গে কথা বলার পর জানা গিয়েছে, ২৫ তারিখের শেষ রাতে হানাদার শত্রুরা মেয়েটির বাবাকে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করে। মেয়ের মায়ের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। ঐ সময় এক ফাঁকে গৃহভৃত্যটি মেয়েটিকে নিয়ে কোনভাবে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এরা দূরে কোন এক স্থানে একটু নিরাপত্তার জন্য ছুটে চলেছে। শত্রুর হামলায় হাত কাটা মেয়েটির হাত কেটে যায়। এবং এখন সে-ই ফুটফুটে মেয়েটির এক মাত্র সঙ্গী। কত লোক কোলে নিয়ে আদর করতে গিয়ে হতাশ হয়েছে। বাচ্চাটি আজ জানে—ঐ ভৃত্য এবং তার বোনই আজ এ বিশ্বে ওর সব কিছু।

রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড

গোয়ালন্দ থেকে ফরিদপুর শহরে যেতে ব্যারিকেড তৈরী হয়েছে অসংখ্য। প্রতি ব্যারিকেডের পাশেই ওৎ পেতে বসে আছে গ্রামীন মানুষ তাদের লাঠি, সড়কি নিয়ে। ফরিদপুর শহরের সর্বত্রই স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছে। ফরিদপুর শেখ মুজিবুরের দেশ পূর্ণ স্বাধীন।

সর্বত্রই স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ছাত্র যুবকরা গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে।

ফরিদপুরের নাড়ারটেকের লঞ্চ ঘাটেও সকল সময় ৪-৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক, পুলিশ অফিসার আর মুজাহিদ দিবারাত্র প্রতীক্ষায় আছে কখন শত্রু আসবে। কামারখালি ঘাটে ওৎ পেতে আছে আরও ৪ হাজার মুক্তিসেনা। সবাই সশস্ত্র। বহু লোক প্রতিদিন ঢাকা হতে পায়ে হেঁটে ৫২ মাইল দূরের শহর ফরিদপুরে আশ্রয় নিচ্ছে। কামারখালি ঘাট পার হয়ে যশোহর জেলার মগুরা শহরের রাস্তায় তৈরী করা হয়েছে ব্যারিকেড। ব্যারিকেড তৈরী করা হয়েছে রাস্তায় বিরাট বিরাট গাছ ফেলে। একস্থানে এক বিরাট কাঠের পুল লোকজন জ্বালিয়ে দিয়েছে যাতে শত্রুরা চলাচল করতে না পারে। আশপাশ থেকে পার হবার ডিঙ্গি নৌকাগুলোকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঝিনাইদহ শহরে আসতে প্রায় আরো ৫০টি ব্যারিকেড পার হতে হয়েছে। রাস্তায় ই পি আর, আনসার, স্বেচ্ছা-সেবক, মুজাহিদরা পাহারা দিচ্ছেন। বহু ই পি আর কুষ্টিয়া চলেছেন ওখানকার পাক সৈন্য ক্যাম্প দখল করতে। ঝিনাইদহ হতে যশোহরের কালিগঞ্জ আসার পথে তৈরী করা হয়েছে ৭৯টি ব্যারিকেড। রাস্তা কেটে দেওয়া হয়েছে বহু জায়গায়। পুরনো বিরাট বিরাট গাছগুলিকে কেটে ফেলে রাখা হয়েছে রাস্তার মাঝখানে। কালিগঞ্জ থানায় করা হয়েছে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। ওখান থেকে মুক্তিবাহিনী ঝাকে ঝাঁকে গিয়ে যশোহর মিলিটারী ক্যাম্প আক্রমণ করছে। ই পি আর, আনসার এরা সবসময় শত্রু সৈন্যদের ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকার চার পাশ থেকে গুলি চালাচ্ছে। ওখানে আলাপ হল ১০ জন ইস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্টের সৈন্যের সাথে। তাদের নিকট থেকে জানা গিয়েছে যে ৩০শে মার্চ তারা যখন খেতে বসেছিলেন তখন হঠাৎ পাক সৈন্যরা বেঙ্গল রেজিমেণ্টের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। পাক-

সৈন্যদের হঠাৎ আক্রমণে বহু বাঙালী সৈন্য নিহত হয়। যে যেভাবে পারে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে এবং সাধ্যমত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

চট্টগ্রাম রণাঙ্গণে এগারো দিন

আগরতলা ৭ই এপ্রিল—আমরা সম্প্রতি চট্টগ্রাম যাই। আমরা চট্টগ্রামের রণাঙ্গনে এগারো দিন অবস্থান করি। চট্টগ্রামের লড়াইয়ের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করি। আমাদের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ নিচে দিচ্ছি :—

২৪শে মার্চ বিকেল ৩টায় আমরা চট্টগ্রামে পৌঁছালাম। সারা শহরে তখন উড়ছে কালো পতাকা। অফিস আদালত ছাড়া আর সব খোলা।

২৪শে মার্চ রাত তখন বারোটা।

চট্টগ্রাম জেটি। পাক সৈন্যবাহিনীর অস্ত্র ভর্তি একটি সামরিক জাহাজ তখন বন্দরে। জনতার কাছে খবর পৌঁছুল সৈন্য-সামন্ত অস্ত্র খালাসের চেষ্টা করছে। ২০ হাজার মানুষ ঘিরে ফেলে জেটি। বেসামাল সৈন্যরা কোন হুঁশিয়ারী না দিয়েই গুলি চালাল। বীরের মৃত্যু বরণ করলেন ৮ জন। কিন্তু জনতার অবরোধ ভাঙেনি। সারারাত চলল তাদের প্রতিরোধ। মিলিটারী অস্ত্র নামাতে ব্যর্থ হল। এই প্রথম চট্টগ্রামে জনতা বনাম সশস্ত্রবাহিনীর লড়াইয়ের সূত্রপাত। এ পক্ষের হাতে লাঠি, তরোয়াল, রড, পাথর কাটার অস্ত্রাদি, আর হ্যাঁ, আওয়ামী লীগের দু হাজার স্বেচ্ছাসেবীর হাতে বন্দুকও ছিল।

আর ওপক্ষ অর্থাৎ ইয়াহিয়ার বাহিনী সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। সারা রাত সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছিল ২০তে। আর আহত

শতাধিক। রাত আড়াইটার সময় হাজার ২৫ মানুষ গোটা শহর পরিক্রমা করে। তাদের স্লোগানে নিস্তব্ধ চট্টগ্রামের রাত্রিকালিন নৈঃশব্দ ভেঙে খান খান হচ্ছিল।

২৫শে মার্চ—ভোর থেকে

ভোর থেকেই শহরের সর্বত্র মিছিল বেরোলো। সব মিছিলই সশস্ত্র। মামুলি অস্ত্রের সঙ্গে বিপ্লবী জনতার হাতে বেশ কিছু বন্দুকও ছিল। বিকেলে ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির স্বেচ্ছাবাহিনীর প্যারেড অনুষ্ঠিত হলো। দুই পার্টির স্বেচ্ছাসৈন্যের পোশাক ভিন্ন। এই সশস্ত্র কুচকাওয়াজকে গগনভেদী অভিনন্দন ধ্বনিতে জনতা বার বার স্বাগত জানিয়েছে। দুই পার্টি মিলিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসৈন্য কুচকাওয়াজে অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন।

জাহাজঘাটের অবরোধ এইদিনও চলেছে। শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার বীর পুঙ্গব বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হলো। অস্ত্র নামানো হলো না।

২৬শে মার্চ—জনতার হাতে অস্ত্র

ভোরবেলা বেতারে ঘোষিত হলো সামরিক শাসন। ইয়াহিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রুদ্ধ চট্টলবাসী জমা হতে লাগলেন রাস্তায়। আবাল বৃদ্ধ বনিতায় ভেদ নেই। বেলা বাড়তে না বাড়তে রেস্ট হাউস হয়ে উঠলো বিপ্লবী জনতার অস্ত্রাগার। আওয়ামী লীগের ঝাণ্ডা টাঙানো ট্রাক, জীপ ঐসব অস্ত্র রেস্ট হাউসে পৌঁছে দিতে লাগলো। আমার আন্দাজ রাইফেলের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০। বেশ কিছু গাদা বন্দুক আর সামান্য সংখ্যক হালকা মেসিনগানও দেখেছি। কার্টিজ সংগ্রহ হয়েছিল প্রচুর। অস্ত্র বোঝাই গাড়িগুলো দেখে জনতার সে কি উল্লাস। দল নির্বিশেষে, বাছবিচার না করে

প্রতিরোধকামী জনতার হাতে তুলে দেওয়া হল অস্ত্র। সশস্ত্র স্বেচ্ছা-বাহিনী ট্রাকে করে ক্যান্টনমেন্ট দখলে অগ্রসর হলো।

রেস্ট হাউস তখন আওয়ামী লীগের কার্যালয়। ইতিমধ্যে সারা শহরের সঙ্গে হেড কোয়ার্টারের টেলিফোন যোগাযোগ সম্পন্ন। এ সময়ে ঘটনার গতি খুব দ্রুত। ই পি আর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মুজিব বাহিনী, আনসার বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করতে রওনা হলো। কোর্ট বিল্ডিং, সিটি কলেজ, কোতোয়ালি মুক্তিফৌজ দ্রুত দখল করে নেয়। কিন্তু ভি সি বাংলো তখনো হানাদারদের কবলে। মহল্লার জনগণ অস্ত্র হাতে প্রহরারত। সন্ধ্যাবেলায় বেতারে ঘোষিত হলো আওয়ামী লীগ বে-আইনী। বিক্ষুব্ধ জনতা তখন ক্রোধে ফেটে পড়েছেন। মুক্তিবাহিনীর সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ এলো : সারারাত শহর নিষ্প্রদীপ থাকবে। ঐ দিনই চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র মুক্তিফৌজ দখল করে নিল। তা থেকে নির্দেশ দেওয়া হতে লাগল

বাবর বনাম জাহাঙ্গীর

২৭শে ও ২৮শের ঘটনা প্রায় একরকম। যে জাহাজটি অস্ত্র খালাস করতে না পেরে গভীর সমুদ্রে চলে গিয়েছিল, তার নাম 'বাবর'। 'বাবর' আবার ফিরে আসার চেষ্টা করে। সে সময় নৌবাহিনীর আর একটি জাহাজ 'জাহাঙ্গীর' 'বাবরকে' বাধা দেয়। জাহাঙ্গীরে যারা ছিলেন তারা বাঙালী। এই দুদিনে হানাদার সৈন্যরা বেতারকেন্দ্র দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তবে বিমান বন্দরটি তাদের দখলে থাকায় হেলিকপ্টার দিয়ে ওরা রসদ সরবরাহ অব্যাহত রাখে। ২৮শে খবর এলো ক্যান্টনমেন্টে জোর লড়াই চলছে।

২৯শে মার্চ প্রতিরোধ চলেছে

বেতারকেন্দ্র দখলের জন্য হানাদাররা মরিয়া হয়ে ওঠে। মুক্তিবাহিনী মাটি কামড়ে লড়াই চালান। গোলাগুলি সমানে চলতে

থাকে। সারাদিন বেতারসূচি বন্ধ থাকে। হানাদাররা ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত। শত্রুকে বিপর্যস্ত করে দিতে আওয়ামী লীগের নির্দেশে জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমি যে জায়গায় সেদিন আস্তানা গেড়েছিলাম, সেখান থেকে সারাদিন গুলিগোলার আওয়াজ ভেসে আসে। রাতে দেখলাম জেটি দাউ দাউ জ্বলছে। ২৫শে মার্চ রাত্রি থেকে আরম্ভ হয়েছে বাংলা দেশের মানুষের উপর ইয়াহিয়ার ফৌজি আক্রমণ। ২৫শে মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত কত লক্ষ মানুষ নিহত হয়ে থাকতে পারেন এই মুহূর্তে অনুমানসাপেক্ষ। সারা বাংলাদেশ জুড়ে যেভাবে আক্রমণ চলছে এবং যে তীব্র উন্মাদনার সঙ্গে কোটি কোটি মানুষ বিজয় অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সামরিক বাহিনীর গতিরোধ করে, সেই ক্ষেত্রে ৫-৭ লক্ষ মানুষের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আদৌ অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য নয়। ৩১শে মার্চ রাত্রিতে কলকাতায় বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সংবাদ এসেছে, তাতে জানা যায় ৭ লক্ষ মানুষ মাত্র ৭ দিনের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

এই ৭ লক্ষ মানুষের মৃত্যুসংবাদের পরে আরও যে সংবাদ সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষের সামনে বিভীষিকার চিত্র তুলে ধরেছে, তা হ'ল প্রায় সারা বাংলা দেশ জুড়ে ইয়াহিয়ার বিমান এখন অবিরাম বোমা বর্ষণ করে চলেছে। এই বোমার আক্রমণে কত মানুষ নিহত হয়েছেন, তার কোন সংবাদ নেই। বাংলাদেশের বিদ্রোহী মানুষের বিশ্বাস এ সংখ্যা অগণ্য, অপরিমিত।

প্রায় ৩০শে মার্চ নাগাদ ইয়াহিয়ার বিমানবাহিনী বোমা বর্ষণ শুরু করেছে। এই বোমার সঙ্গে আছে শত শত নাপাম বোমার বীভৎস অভিযান। মানবিকতার সমস্ত আবেদন পদদলিত করে পাক প্রেসিডেন্ট ফৌজি নায়ক ইয়াহিয়া খান তাঁর মার্কিন মহাপ্রভুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করছে নাপাম বোমার আগুনে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে নাপাম বোমা দিয়ে ভিয়েতনামের

লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর বীভৎস আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে—সেই নাপাম বোমাই আজ ইয়াহিয়ার হাতের অস্ত্র।

সুতরাং ৩১শে মার্চ পর্যন্তই যদি ৭ লক্ষ মানুষ নিহত হয়ে থাকেন তবে আর কত প্রাণ পরের দিনগুলিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? এ সংখ্যা গণনাতীত।

শুধু হত্যাভিযানের মধ্যেই ইয়াহিয়ার ফৌজ নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। নারকীয়তার শেষ পর্যায় শুরু করেছে ইয়াহিয়ার ফৌজ। রাশি রাশি রিপোর্ট আসছে স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে—যেখানেই ইয়াহিয়ার ফৌজ আক্রমণ চালানোর সুযোগ পাচ্ছে সেখানেই করছে নারী লুঠ, বলাৎকার এবং সর্বশেষে তাদের ঘৃণ্য কাজের সাক্ষ্য প্রমাণ লোপ অর্থাৎ নিপীড়িত নারীদের নৃশংসভাবে হত্যা। ২৫শে মার্চ সেই তমসাঘন রাত্রে নৃশংস অভিযানের কথা কেউ ভুলতে পারে না। ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের হোস্টেল আক্রমণ করে ৪০০ ছাত্রীকে তারা লুট করে নিয়ে চলে গেল। কত বয়স সেই সব ছাত্রীদের? উনিশ, কুড়ি, একুশ কিংবা বাইশ। সেই ছাত্রীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াই করার জন্য অস্ত্র শিক্ষাও গ্রহণ করেছিল। ইয়াহিয়া ফৌজের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব তারা লড়েও ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারল না। ইয়াহিয়ার ফৌজ পৈশাচিক উল্লাস ঘোষণা করে তাদের নিয়ে গেল নিজেদের শিবিরে এবং পরবর্তী ঘটনা তমসাঘন রাত্রির থেকে কালিমাময় কলঙ্কিত। সেই ৪০০ ছাত্রীকে নিয়ে চলল জানোয়ারদের নৃশংস নারকীয় উল্লাস। ঐ ছাত্রীদের তারা বলাৎকার করল সেইদিন, তারপর দিন, তারও পরের দিন। তারপর দেশাত্মবোধে উৎসর্গীকৃত যে ছাত্রীরা শত্রুপ্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইয়াহিয়া বুলেটে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আক্রান্ত স্বাধীন বাংলার মাটি থেকে। ৪০০ তরুণী ছাত্রীর জীবন নিঃশেষ হয়ে গেল সত্য কিন্তু সেই নির্যাতিতা ছাত্রীদের

বেদনাগাথা ফৌজী নায়ক ইয়াহিয়া খানকে আর একবার ঘৃণিত খুনী হিসাবে চিহ্নিত করে দিল।

নারী লাঞ্ছনা, নারী লুণ্ঠের ঘটনা কেবলমাত্র ঢাকার ছাত্রী হোস্টেলেই সীমাবদ্ধ থাকল না। আক্রমণকারী ফৌজদের এই পৈশাচিক অত্যাচারের বিবরণ এলো রংপুর থেকে ; খুলনা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, শ্রীহট্ট এবং বাংলাদেশের শহরাঞ্চলগুলির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত।

মানুষ ভুলতে পারে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ইয়াহিয়ার গোলাবর্ষণের কথা। ২৫শে রাত্রিতে ইয়াহিয়া গোলন্দাজ বাহিনী কামানের গোলা বর্ষণ করল বহু গৌরবের স্মৃতি বিজড়িত ইকবাল হল আর জগন্নাথ হলের উপর। প্রায় ৮০০ ছাত্র ইয়াহিয়ার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আত্মাহুতি দিল। ২৭শে মার্চ-এর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার সংগ্রামী যোদ্ধা নিহত হল ঢাকার রাজপথে।

ঢাকার ওপর দিয়ে উড়ে আসা কয়েকটি বৈদেশিক বিমানের কাছে জানা গেল ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ জমে আছে পরবর্তী সংবাদে জানা গেল ২৬-২৭শে মার্চ পাক-ফৌজ বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে হত্যা করে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দিল।

কুমিল্লা, রংপুর, শ্রীহট্ট, রাজশাহী, কুষ্টিয়া ইত্যাদি শহরের অধিবাসীদের উপর চলল অকথ্য অত্যাচার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মানবতাবর্জিত সিদ্ধান্তের ফলে হিরোসিমায় আনবিক বোমার আঘাতে নিহত হয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ।

কিন্তু আজ? একথা অবধারিত সত্য যে, আক্রমণ আরম্ভের মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে যতো মানুষ নিহত হয়েছেন সে সংখ্যা হয়তো হিরোসিমার হত্যাকাণ্ডের চেয়েও বেশী। নাগাসাকিতেও

নিহত হয়েছিলেন অনুরূপ সংখ্যক মানুষ। এখনো পর্যন্ত যে আক্রমণ বাংলাদেশের মানুষের উপর চলছে হয়তো হিরোশিমা ও নাগাসাকির হত্যাকাণ্ডের মিলিত সংখ্যার চেয়েও ইয়াহিয়ার আক্রমণে নিহত মানুষের সংখ্যা ছাপিয়ে যাবে আক্রান্ত স্বাধীন বাংলাদেশে।

[দেশহিতৈষী—৯ই এপ্রিল, ১৯৭১]

পত্রিকায় প্রকাশিত "মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশ" নিবন্ধের একটি অংশ তুলে ধরছি

"বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন বিল্ডিং জ্বলছে দাউ-দাউ করে। ধোঁয়া আর আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শত্রুর মর্টারের গোলায় ধ্বংস হয়েছে মেইন বিল্ডিং, উড়ে গেছে মধুর ঐতিহাসিক ক্যান্টিন। পূর্ববাংলার বিভিন্ন সংগ্রামের জন্ম হয়েছে ঐ মধুর ক্যান্টিনে। ঐ মধুর ক্যান্টিনে বসেই মুজিবুর রহমান, আজিজুল হক, অলি আহাদ তোয়াহারা একদিন ভাষা আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ওইখানেই জন্ম নিয়েছিল '৬২, '৬৬ এবং '৬৯ সালের গণ-আন্দোলন। ওই ক্যান্টিনের সঙ্গে মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, তোফায়েল আহমদ, সাইফুদ্দিন মানিক, জামাল হায়দার, নূরে আলাম সিদ্দিকি, শাজাহান সিরাজ, আবদুল কুদ্দুস মাখন, আরও অনেক অনেক বাংলা মায়ের বীর ছেলেমেয়ের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে শেখ মুজিব থেকে শুরু করে অসংখ্য নেতার। আমাদের অনেক সকাল, দুপুর, সন্ধ্যার স্মৃতি জড়ানো ঐ ক্যান্টিন আর নেই। বর্বর দস্যুর গোলায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেটি। রকেট ছুঁড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল সর্বত্র। সৈন্যরা বেশ কিছুক্ষণ লড়াই-এর পর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা ঘেঁসে রাস্তার কাছেই মধুর ক্যান্টিন। ওই

ক্যান্টিন গুঁড়িয়ে দিয়ে ট্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ট্যাংক থেকে গোলা ছুটছে রাত্রির অন্ধকারের বুক চিরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটশো ছেলে লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল। দিন কয়েক থেকে তারা ওখানেই থাকত। তাদের সঙ্গে থাকত তাদের প্রিয় অধ্যাপকরাও।

যারা তখনও বেঁচে ছিল, সৈন্যরা ভিতরে ঢুকে নির্বিচারে গুলি করে মেরেছে তাদের। অধ্যাপকদের আবাস স্থানে ঘরে ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে ডঃ জিন্নত আলি, ডঃ সারওয়ার খুরশিদ, ডাঃ মণিরুজ্জামান, ডঃ মোফাজুল হায়দার চৌধুরি এবং আরো কয়েক-জনকে। এঁরা সকলেই বিভাগীয় প্রধান। জহিরুল হক, ইকবাল হলের একজন সেই রাত্রে কোনমতে পাকিস্তানী সৈন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে জীবন নিয়ে। অধ্যাপকদের সার করে দাঁড় করিয়ে স্টেনগানের গুলিতে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। অধ্যাপকদের পরিবারের লোকেরাও রেহাই পান নি। ঘুমন্ত শিশুদের বিছানায় মেরে রেখে চলে গেছে। এমন অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসে আছে বলে মনে হয় না। জনৈকা বিদেশিনী এক পাক-অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিল : তোমরা নিষ্পাপ শিশুদের মারছ কেন ? সৈনিকটি জবাব দিয়েছে : না হলে যে ওরাই একদিন তাদের মায়ের, ভাইয়ের, বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে।

সৈন্যবাহিনী সেরা সেরা অধ্যাপকদের হত্যা করেছে। ইয়াহিয়ার অভিমত : মুজিবকে মদত দিচ্ছে অধ্যাপক ও ছাত্ররা, তারাই হলেন পূর্ববাংলার সমস্ত গণ-আন্দোলনের অগ্রপথিক। তাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারলে ভবিষ্যতে পূর্ব-বাংলায় আর গণ-আন্দোলন দেখা দেবে না। শোনা যায়, দর্শন বিভাগের প্রধান ডঃ গোবিন্দ দেবকেও ওরা হত্যা করেছে। হায়, বাংলাদেশের কতো মনীষা শেষ হয়ে গেল বর্বর দস্যুর বুলেটের আঘাতে।

(এখানে Blitz পত্রিকায় প্রকাশিত Mr. A. Sanders-এর একটি বিবরণীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে বর্বর ইয়াহিয়া দস্যুদের যে নির্মম, যে নিষ্ঠুর অত্যাচারের চিত্র ধরা পড়েছে তা হুবহু তুলে ধরা হল :

I am one of the British businessman who lett East Pakistan on April 2, 1971, enrcute to the U. K. I thought in my duty to convey to Blitz this eye-witness acccunt of the sandistic, sex-driven and brutal torture of the girl students living at Rockey Hall of Dacca University.

RAPES

It was around 5 p. m when about 350 to 400 Pakistani troops attacked the hall. They entered all the rooms lodging the girls and dragged them out, tearing off their clothing one by one as they were being pulled and manhandled

There was panic, and shrieks could be heard. Saris, skirts, salwars were ripped one and flung aside. Next blouses, khameezes and brassieres were torn off, and the girls were physically lifted off by their breast or hair - some held upside down.

As they tried to cover their shame with their hands, the troops kicked them on their private parts with their heavy boots, punched them with their fists, some even bayoneted the delicate puble portions, blood trickline therefrom.

SUICIDES

Next come the raping The girls were pinned down to the floor face upwards, legs mercilessly pulled apart and fully stretched—then finally the brutal act of raping.

The girls cried, shrieked and struggled, but the beastly soldiers went on raping. Blood ran as one after another, each girl was raped successively by 10 to 12 beasts. Most

of them fell unconscious as the troops departed after satisfying their devilish lust.

The girls were in such a condition that they could not even cover up their bodies.

They were so badly mutilated—breasts bitten off, private parts torn by the forceful thrust of the fist and kicking with boots, throats throttled when where was some resistance.

It was at this juncture that 50 brave girls jumped to their death from the hall instead of falling into the hands of the barbarians.

Particularly pathetic was the fate of a 12 year old girl who had come to see one of the students in the college. This juvenile breathed her last as a brutal Pathan sepay assaulted her. The girl gave a pitiful shriek and never came to her senses, but the brute went on mating her till he reached his climax, and when he finished gave a brutal kick with his boot on her puble region By then, the girl had died. Blood was flowing as if from a lap.

SODOMY

The worst came when some of the Pathans resorted to sodomy with the grown up girls. They simply swooned due to pain. Most of their rectums got torn and were bleeding profusely. Still the devils did not leave them.

The assault upon the Rockey Hall happens to be one of a dozen similar brutalities known to have committed on woman and children by the Punjabi and Pathan troops in Dacca.

I happend to get all the details because an associate's daughter was involved in this vulgar and violent attack. He happens to be a Muslim and a law-abiding subject of Pakistan, but after her has sworn to avenge her on every Punjabi or Pathan he can lay hands on.

SADISTIC

Why have president Yahya Khan and his Government brought this calamity on thier heads? Neither I nor my colleagues can guess the answer.

I am sure, you, as a brave Editor, will publish this account of the horrid scene. I have tried to minimise the horror. In fact, I never expected that the Pakistani troops were so sex-crazy, sadistic, barbaric and brutal.)

"পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে
আলোকে আলোকময়
জয় জয় জয় বাংলা—
ঘুম পাড়ানী মাসি পিসি
বেরিয়ে এস সবে,
বর্গী যদি আসেই তাদের
তাড়িয়ে দিতে হবে।
বুলবুলিকে ধান দেবো
আদর সোহাগ করে,
সেইতো আমার খাজনা দেওয়া
ভালোবাসায় ভরে।
দস্যুগুলো পালিয়ে গেছে আঁধার হয়েছে ক্ষয়।
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা
মুক্তিধারার সীমানা
সেই পদ্মা, সেই মেঘনা, সেই যমুনা
আজ জোয়ারে উত্তাল,
কান পেতে শোনো
সেই সত্য মুক্তি-মন্ত্রে গরজে

মহাকাল কান পেতে শোনো
রক্তের ঋণ ফিরিয়ে নিয়েছি
আজ আর কোন কথা নয়,
জয় জয় জয় বাংলা।"

ছোট ছিমছাম মঞ্চ। মঞ্চের উপর পর পর ছয়খানা বড় চেয়ার পাতা। বাঁ পাশে মঞ্চের নীচে হাল্কা কয়েকখানা চেয়ার। সামনে লেখা 'সাংবাদিক'। আর একপাশে আর কয়েকখানা চেয়ার। লেখা 'অতিথি'। নেতারা মঞ্চে এসে চেয়ারে বসলেন। প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি, তারপর প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন, তারপর মন্ত্রী খোন্দকার মুস্তাক আহমদ, ক্যাপটেন মনসুর আলি, জনাব কামারুজ্জমান এবং সেনাপতি কর্নেল উসমানি। স্বেচ্ছাসেবকেরা পুষ্পবৃষ্টি করে তাদের অভিবাদন জানালেন।

আবদুস মান্নান বলে গেলেন অনুষ্ঠানসূচি। প্রথমেই নতুন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক দলিল ঘোষণাপত্র পাঠ করলেন দলের চীফ হুইপ ইউসুফ আলি। কীভাবে নতুন রাষ্ট্র চলবে, কী তার লক্ষ্য, কার কি দায়িত্ব—বিস্তারিত বলা হয়েছে এই দলিলে। তারপর উঠে দাঁড়ালেন অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরণে। শুরুতেই তিনি বলেন: অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমি তাজুদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেছি এবং তার পরামর্শক্রমে আরও তিনজনকে মন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেছি। একে একে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তার তিন সহকর্মীর সঙ্গে। তারপর ঘোষণা করলেন প্রধান সেনাপতি পদে কর্নেল উসমানির নিয়োগ। আর বলেন সেনাপতির চীফ অফ স্টাফ পদে নিয়োগ করা হয়েছে আবদুর রবকে।

মুজিবুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা

তিনি বার বার মুজিবুর রহমানের কথা বললেন। তাঁর প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব, স্বার্থত্যাগ এবং বিরাট রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনা দিলেন। বললেন: তিনি আজও আমাদের মধ্যে আছেন। তাঁরই নির্দেশে আমরা কাজ করছি।

তিনি সর্বশেষে বললেন: আজ এই আম্রকাননে একটি নতুন জাতি জন্ম নিল। বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ বাংলার মানুষ তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব নেতাদের নিয়ে এগোতে চেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থ তা হতে দিল না। ওরা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক পথে এগোতে চেয়েছিলাম, ওরা তা হতে দিল না। ওরা আমাদের উপর বর্বর আক্রমণ চালাল। তাই আমরা আজ লড়াইয়ে নেমেছি। এ লড়াইয়ে আমাদের জয় অনিবার্য। আমরা পাকিস্তানী হানাদারদের বিতাড়িত করবই। আজ না জিতি কাল জিতব। কাল না জিতি পরশু জিতবই।

বললেন: আমরা বিশ্বের সব রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাই। পরস্পরের ভাই হিসাবে বসবাস করতে চাই, মানবতার গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার জয় চাই। সমবেত জনতা দীর্ঘস্থায়ী করতালি ধ্বনি দিয়ে তাঁর ভাষণকে স্বাগত জানালেন।

তারপর উঠলেন প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন। প্রথমে তিনি বাংলায় বক্তৃতা দিলেন। সবাইকে স্বাগত জানালেন। অবশেষে বিদেশী সাংবাদিকদের জন্য ইংরেজিতে লেখা এক দীর্ঘ বিবৃতি পড়লেন।

সেই দীর্ঘ বক্তৃতা বিদেশী সাংবাদিকরা সবাই টেপ করে নিলেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট নন, তাঁরা বললেন: মিঃ প্রাইম মিনিস্টার, কিছু প্রশ্ন আছে।

ওদের প্রথম প্রশ্ন হল : তোমাদের দখলে এখন পূর্ব-বাংলার কতটা অঞ্চল আছে ?

প্রধানমন্ত্রী জবাব দিলেন : গোটা দেশ, শুধু কয়েকটা সামরিক ঘাঁটি বাদে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর এইটাই রাষ্ট্র। ওরা হানাদার। ওদের আমরা তাড়াবই।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (৪৮) সামনে এসে ঘোষণা করলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান নেতা। আমাদের অবিসংবাদী নেতার অনুপস্থিতির জন্য আমি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ নিয়েছি। (জনতার বিপুল হর্ষধ্বনি)

শ্রীইসলাম বলেন, যে কোন কারণেই হোক বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে সরকারের দৈনন্দিন কাজ চালাতে পারছেন না, তাঁর উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনার জন্য আমি তাজুদ্দিন আমেদকে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেছি। এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে খোন্দকার মোস্তাক আমেদ সাহেবকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মনসুর আলি ও কামারুজ্জমানকে মন্ত্রীপদে নিয়েগে করেছি এবং মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ করে মুক্তিবাহিনীর প্রধান হিসাবে কর্নেল উসমানিকে প্রধান সেনাপতি এবং কর্নেল আবদুর রবকে চীফ অব স্টাফ পদে নিয়োগ করেছি।

আপনারা জানেন পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ এবং শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ২৩ বছর ধরে বঙ্গবন্ধু সব কিছু পরিত্যাগ করে আন্দোলন করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। আমি জোর দিয়ে বলছি তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। জাতির সঙ্কটের সময় আমরা তাঁর নেতৃত্ব পেয়েছি। তাই

বলছি পৃথিবীর মানচিত্রে আজ যে নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্নের সূচনা হল তা চিরদিন থাকবে। পৃথিবীর কোন শক্তি তা মুছে দিতে পারবে না। আপনারা জেনে রাখুন ২৩ বৎসর ধরে বাংলার সংগ্রামে পদে পদে আঘাত করছে পশ্চিমের স্বার্থবাদী, শিল্পপতি, পুঁজিবাদী সামরিক কু-চক্রীরা।

আমরা চেয়েছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের অধিকার আদায় করতে। লজ্জার কথা, দুঃখের কথা, ওই পশ্চিমীরা শের-ই-বাংলাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল, শহিদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে কারাগারে পাঠিয়েছিল। তাই ওদের সঙ্গে আপোস নেই, নেই ক্ষমা।

আমাদের রাষ্ট্রপতি জনাব শেখ মুজিবুর বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের জন্য ১৯৬৬ সালে যে ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৭১ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে সাড়ে-সাত কোটি বাঙালী তা মেনে নিয়েছেন। কায়েমী স্বার্থে এতে আঘাত লাগল। তারা উঠে পড়ে লাগলেন আমাদের খতম করার জন্য। তাদের বলে দিতে চাই, তোমরা তা পারবে না। সারা বিশ্ববাসীকে আমরা বলতে চাই—২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে কার্ফু না দিয়ে সামরিক বাহিনীর গুণ্ডা ঢাকা শহরে বুদ্ধিজীবীদের খুন করতে শুরু করেছে (শেম শেম)। হাজার হাজার নিরস্ত্র নাগরিককে গুলি করা হল। বাংলার নারীরা ইজ্জত হারাল। তাঁদের কি অপরাধ? বিশ্বের জনগণের কাছে এর বিচার চাই।

উপস্থিত বিদেশী সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা বলুন আমাদের কি অপরাধ? আমরা স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার চেয়েছিলাম। আমাদের কেন গুলি করা হল? তাই পৃথিবীর ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের কাছে আমাদের আবেদন: আপনারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।

রাষ্ট্রপতি তাঁর ৬০ মিনিট ব্যাপী বক্তৃতায় আরও বলেন, পশ্চিম

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর অত্যাচার বাংলার মানুষ গ্রহণ করেন নি। বাংলার মানুষ কাপুরুষ নয়। আমরা বাঙালীরা স্বাধীনতার জন্য লড়তে জানি। তিনি পশ্চিমী সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা জেনে যান আমাদের রাষ্ট্র ও সরকার আছে। থাকবে। আপনারা এই সরকারকে স্বীকৃতি দিতে সাহায্য করুন। জয় বাংলা।

হানাদার না হঠা পর্যন্ত লড়াই চলবে

— সেনাপতি উসমানি

মুজিবনগর (বাংলাদেশ), ১৭ই এপ্রিল।

"আমি এখন আমাদের প্রধান সেনাপতিকে হাজির করছি।"— আজ (১৭ই এপ্রিল) দুপুরে এখানে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে মন্ত্রীদের নামোল্লেখ করার পরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ওই কথা ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সামনে এসে স্যালুট করে দাড়ালেন তিপ্পান্ন বছরের ঋজু দেহ উন্নতশির এক সামরিক অফিসার। নাম তার কর্নেল মহম্মদ উসমানি। বাড়ি শ্রীহট্ট।

উপস্থিত জনমণ্ডলী উল্লাসধ্বনিতে তাকে অভিনন্দন জানালেন। স্বাধীন-গণতান্ত্রিক বাংলা দেশের প্রধান সেনাপতি কর্নেল উসমানি পরে সাংবাদিকদের কাছে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "প্রয়োজন হলে আমরা বিশ বছর ধরে লড়াই করব।"

১৯৫৮ সালে আয়ুব ক্ষমতায় এসে প্রথম যে বাঙালী সামরিক অফিসারকে জোর করে ছাঁটাই করেছিলেন, তিনিই এই কর্নেল উসমানি। তিনিই আজ স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের প্রধান সেনাপতি পদে বৃত হলেন।

নতুন স্বাধীন বাংলা সরকার সেনাবাহিনীতে তার কৃতিত্বের

জন্য এইদিন কর্নেল উসমানিকে সরকারের অন্যতম মন্ত্রীর পদ-মর্যাদা দেওয়া হয়।

প্রধান সেনাপতি বলেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীন যে সমস্ত উন্নত ধরনের মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করেছে সেগুলি আজ শুধু আমাদের বুকেই হানা হচ্ছে।

স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র

শনিবার (১৭ই এপ্রিল) মুজিবনগরে বাংলাদেশ গণ প্রজাতন্ত্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" প্রকাশ করা হয়। ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগের অন্যতম হুইপ ইউসুফ আলি।

[illegible] ১০ই এপ্রিল এই ঘোষণাপত্রটি গৃহীত হয়েছিল। এই ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকেই কার্যকর বলে গণ্য। "যেহেতু ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইয়াছিল, যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ দলীয় ১৬৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ তারিখে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন, এবং যেহেতু আহূত এই পরিষদ স্বেচ্ছাচার এবং বেআইনী ভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিবার পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সহিত পারস্পরিক আলোচনা চলাকালে হঠাৎ ন্যায়নীতি বহির্ভূত এবং বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য উদ্ভূত

পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান, এবং যেহেতু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছে এবং এখনও বাংলাদেশের বে-সামরিক ও নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন চালাইতেছে এবং যেহেতু পাকিস্তান সরকার অন্যায় যুদ্ধ ও গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার পরিচালনা দ্বারা বাংলা দেশের গণ-প্রতিনিধিদের একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিয়া জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে এবং যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাহাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর তাহাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি যে ম্যাণ্ডেট দিয়াছেন সেই ম্যাণ্ডেট মোতাবেক আমরা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আমাদের সমবায়ে গণ-পরিষদ গঠন করিয়া পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য, সেই হেতু আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণ প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি এবং উহার দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করিতেছি। এতদ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধান

প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনী সমূহের সর্বাধিনায়ক পদেও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ণের ক্ষমতার অধিকারী।

রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগের ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহার কর ধার্য ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা থাকিবে, তাঁহার গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও উহার অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণার ক্ষমতা থাকিবে। উহা ছাড়া বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হইবেন। বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে কোন কারণে রাষ্ট্রপ্রধান যদি না থাকেন অথবা রাষ্ট্রপ্রধান যদি কাজে যোগদান করিতে না পারেন অথবা তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপরাষ্ট্রপ্রধান পালন করিবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে বিশ্বের একটি জাতি হিসাবে এবং জাতি সংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইয়াছে, উহা যথাযথভাবে আমরা পালন করিব। আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছি যে আমাদের এই স্বাধীনতার ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকরী বলিয়া গণ্য হইবে। জয় বাংলা।

শেষ কথা

শনিবার ৩রা এপ্রিল ১৯৭১—স্বাধীন বাংলা দেশের ছোট্ট সহর চুয়াডাঙায় পাক হার্মাদবাহিনী যখন নির্বিচারে নাপাম বোমা বর্ষণ করছিল তখন আমি সেখানে। শুধু বোমা ফেলার মুহূর্তটিতেই নয়—বোমা ফেলার আগে ও পরে পাকিস্তানের শোষক শ্রেণীর শিকল ছিঁড়ে যারা মুক্তাঞ্চল গঠন করেছে, যারা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে তাদের সেই স্বাধীনতা রক্ষার অভূতপূর্ব সংগ্রামও দেখেছি। দেখেছি সমগ্র নূরনগর গ্রামটি নাপাম বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর গ্রামের মানুষগুলোর কি নিদারুণ ক্রোধ আর ক্ষোভ। ক্রোধে ফেটে পড়েছে মানুষগুলো, কিন্তু তার মধ্যে সর্বস্ব হারাবার শোক ও বেদনার লেশমাত্র নেই।

জোর কদমে এগিয়ে গেলাম দর্শনার দিকে। শুধু আমি একা নয়। আমার আগে পিছনে আরো অনেক মানুষ যাচ্ছে দর্শনার দিকে। দর্শনার দিক থেকে অনেক মানুষ আসছে গেদের দিকে। মুখোমুখি হতেই একপক্ষ বলছেন: 'জয় বাংলা'। নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড পেরিয়ে যেখানে আগে পাকিস্তান লেখা সাইনবোর্ড ছিল, আজ সেখানে পাকিস্তান মুছে ফেলে লেখা হয়েছে 'বাংলা দেশ'। দর্শনা পৌঁছে খুঁজে বার করলাম স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রধানকে। তিনি আমাদের একখানা গাড়ী দিলেন। বললেন, "যাঁন চলে যান, দেখে আসুন স্বাধীন বাংলা দেশ।" এগিয়ে চলেছি দর্শনা পেছনে ফেলে কুষ্টিয়ার পথে।

স্বাধীন সরকার চলছে চুয়াডাঙা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও ঝিনাইদহের কিছু অঞ্চল নিয়ে। সরকারের আঞ্চলিক মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়েছে। যার মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রধান হিসাবে কাজ করছেন জনাব আসাদুল হক। অন্য মন্ত্রীদের মধ্যে আছেন আবজালউর রসিদ, ইউনিস আলি, ব্যারিস্টার আবদুল রসিদ। সেনাবাহিনী তথা প্রতিরক্ষা ও শান্তিরক্ষার দায়িত্বে আছেন মেজর ওসমান।

একবার নয় যতবার সুযোগ হয়েছে ততবারই চলে গেছি বাংলা দেশে, থেকেছি বাংলাদেশের মুক্তিপাগল স্বাধীনতার যোদ্ধা ভাই-বোনদের সঙ্গে। বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনেতা ও কর্মীরা এপার বাংলায় এসে যে

যখন যেখানে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের কাছে গেছি, শুনেছি বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের ইতিবৃত্ত, শুনেছি মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব-কাহিনী, আর শুনেছি যাঁর আহ্বানে সাত কোটি বাঙ্গালী সর্বস্ব পণ করে স্বাধিকারের লড়াইয়ে এগিয়ে এসেছিলেন সেই মহান নায়ক মুজিবের কাহিনী।

বাংলা দেশে যা ঘটেছে সেটা বিগত চব্বিশ বৎসরের ইতিহাসের ধারা যে গতিপথে এগিয়ে এসেছে, বর্তমান মুক্তিযুদ্ধ হলো তার সফল পরিণতি। ধর্মের ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। এই বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের স্বাভাবিক গতি কোন যুক্তি, মানবতা-বোধ অথবা কোন উচ্ছ্বাসে রুদ্ধ হতে পারে না। অবৈজ্ঞানিক কোন ঘটনা সাময়িক ভাবে ঘটলেও সেটা চিরস্থায়ী হয় না। পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল এমনি অবৈজ্ঞানিক মানবিকতা ও আবেগের মধ্য দিয়ে, তাই আজ ধর্মের নামে গঠিত যে পাকিস্তান রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্র থেকে ধর্মীয় আবরণ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে তার মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। তাই ভুট্টো, ইয়াহিয়া খাঁ, টিক্কা খাঁ অথবা এদের চেয়ে আরো বড় কোন অস্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি শুধুমাত্র বন্দুক, বেয়নেট দিয়ে ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে চান সে চেষ্টায় তাঁরা ব্যর্থ হবেন।

বাংলা যে হবেনই তার নজির অনেক দিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। বর্তমান মুক্তিযুদ্ধে সেটা আরো প্রকট ভাবে ধরা পড়ল। ইয়াহিয়া খাঁ বা তাঁর সাঙ্গরা ভালভাবেই সেটা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই কারণেই বাংলা দেশের মানুষকে নির্মম ও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যায় তাঁরা এত বেশী আগ্রহী। এই ধ্বংসলীলার ব্যাপকতা কত তা আজ পর্যন্ত নির্ণয় হয় নি। তবে ইতিমধ্যে এই সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে যে বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধ দমনে ইয়াহিয়া খাঁ যে অমানবিক পথ গ্রহণ করেছে তা বিগত বিশ্বযুদ্ধে নাগাসাকি-হিরোসিমাতে আটম বোমা বর্ষণের নিষ্ঠুরতাকে হার মানিয়েছে এবং ভিয়েতনামে মাইলাই-এর কলঙ্কজনক ঘটনার ইতিবৃত্তকে ম্লান করে দিয়েছে। নাগাসাকি-হিরোসিমাতে বোমা বর্ষণে পাঁচ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খাঁ চক্র তার চেয়ে অনেক বেশী মানুষকে খুন করেছে। মাইলাই-এর কলঙ্কজনক ঘটনায় মাত্র একটি গ্রামের কিছু মহিলা কিছু সংখ্যক মার্কিন দস্যুদের দ্বারা

ধর্ষিতা হয়েছিল, কিন্তু বাংলা দেশে ইয়াহিয়া খাঁর বর্বর চমূরা শত শত মাইলাই-এর নজির স্থাপন করেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের হাত থেকে বাংলা দেশকে কি রক্ষা করা যেতো না? অনেকে প্রশ্ন করেন ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে মুজিব আলোচনায় বসে এতো সময় দিলেন কেন? আবার কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, এই ভাবে নিরস্ত্র মানুষদের যুদ্ধবাজ নেকড়েদের থাবায় ফেলে দেওয়া অদূরদর্শিতার কাজ হয়েছে। এই কথাগুলির জবাব আছে। প্রথম কথা হলো শেখ মুজিবুর রহমান পরিষদীয় রাজনীতির প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়মনিষ্ঠার সাথে মেনে চললেন। কিন্তু ভুট্টো-ইয়াহিয়া খাঁ চক্র যখন তাদের নির্দেশিত ফর্মান তাঁরা নিজেরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন (যেমন নির্বাচনের পর জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে। জাতীয় পরিষদ একশত বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করবেন। নির্বাচনে যাঁরা সংখ্যাধিক্য লাভ করবেন তারা সরকার গঠনের সুযোগ পাবেন – এই সব নিয়ম নীতি, পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন ইয়াহিয়া ও ভুট্টো চক্র।) তখন শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে কোন পথ খোলা ছিল না। তিনি কি কেন্দ্রে ভুট্টোকে সরকার গঠন করতে দেবেন, না তিনি কি পূর্ব পাকিস্তানে নুরুল আমিনকে সরকার গঠন করতে দেবেন। সেটা সম্ভব ছিল না। তাই শেখ মুজিব ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলন। নির্বাচনের মাধ্যমে একবার প্রমাণিত হলো দেশের মানুষ কাকে সমর্থন করে, কোন দলকে সমর্থন করে, কাদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার তুলে দিতে চায়। অসহযোগ আন্দোলনে আর একবার প্রমাণিত হলো দেশের মানুষ শতকরা একশত জনই মুজিবুর রহমানের পক্ষে এবং ইয়াহিয়া খাঁ নিজের বিশ্বস্ত জন ভেবে যাঁদের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছেন তাঁরাও পর্যন্ত কেউ ইয়াহিয়া খাঁর পক্ষে নয়। তাই তো অনেক আগে থাকতেই ইয়াহিয়া খাঁ চক্র বাঙ্গালী সশস্ত্র বাহিনীকে নিরস্ত্র করবার প্রচেষ্টায় তৎপর হয়েছিল। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলা দেশে অসহযোগ আন্দোলন যা হলো তার কোন নজির নেই, তার কোন তুলনা নেই। ভারতবর্ষে গান্ধীজির নেতৃত্বে সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলন মুজিবের নেতৃত্বে আন্দোলনের কাছে, শুনতে খারাপ শোনালেও, খুবই নগণ্য মনে হয়। একজন চাপরাশি থেকে আরম্ভ করে সর্বোচ্চ বিচারপতি পর্যন্ত অথবা একজন চৌকিদার থেকে আরম্ভ করে পুলিশ

প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর সর্বপ্রধান আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এমন অসহযোগ আন্দোলন কখনো হয় নি, কখনো কেউ দেখে নি, যার কোন নজির অতীতে কোথাও নেই।)

জনমতকে যদি সামরিক শক্তি দিয়ে পর্যুদস্ত করবার পথ বেছে নেওয়া হয় তবে নিরস্ত্র জনগণের সাময়িক পরাজয় অথবা পশ্চাদপসারণ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে শুধু লোকসানই হয় না, লাভও কিছু হয়। সেই লাভ হলো দুঃখের অন্ধকারে বন্ধুকে চেনা যায়, আর সেই সঙ্গে স্বাভাবিক সময়ে নানা উচ্চমার্গের বাতচিতের স্বরূপ ধরা পড়ে। ভারত বিদ্বেষ ও দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্ধ-উন্মাদনার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক দর্শনে পাকিস্তান কখনই একটি রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ ধর্মের ভিত্তিতে কখনো কোন রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে না। আবার শুধুমাত্র বিদ্বেষ ভিত্তি করেও কোন রাষ্ট্রের পক্ষে স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই পাকিস্তান বলে কোন রাষ্ট্র যে ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে ও বর্তমানে আছে, তা কখনো চিরস্থায়ী হবে না। তার অর্থ এই নয় পাকিস্তান রাষ্ট্রটি রাতারাতি ভারতের সঙ্গে মিলে যাবে। তার অর্থ হলো এই যে বর্তমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের দর্শন ও কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হবেই। বাংলাদেশে শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান ঘটল সেটা হলো এই রাষ্ট্র কাঠামোর পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ। তাই দেখা গেল ইয়াহিয়া বাহিনী যখন বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করে নৃশংস হত্যালীলা চালিয়ে পাকিস্তানের মানুষের স্বাভাবিক দাবিকে দাবিয়ে দিতে চাইল তখন কিন্তু গত পচিশ বছর ধরে যে ভারতবিদ্বেষের হিস্টিরিয়া সৃষ্টি করেছিল তা উবে গেল। বাংলা দেশের মানুষ আশ্রয়ের জন্য, নিরাপত্তার জন্য ভারতবর্ষে চলে এলো। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ভারতে এসে যখন দাঁড়াল তখন কিন্তু ভিন্ন রাষ্ট্রে বা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিচারে শত্রুরাষ্ট্রে এলো—সে কথা ভাবল না।

শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে, তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দর্শন সম্পর্কে আমি আমার নিজের কোনো ভাষা এই বইতে উপস্থাপনের চেষ্টা করিনি। আমি শুধু পাকিস্তান সৃষ্টি ও তৎপরবর্তীকালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক কর্মধারার বিবরণ তুলে ধরেছি। (একটি প্রশ্ন এই গ্রন্থ লিখবার সময় বারে বারে উঠেছে নানা মহল থেকে। সে প্রশ্ন হলো

মুজিবুর রহমান কেন পঁচিশ বা ছাব্বিশ মার্চ ইয়াহিয়া বাহিনীর কাছে ধরা দিলেন বা পড়লেন কেন? তার জবাব হলো এই কাজও মুজিবুর করেছেন দেশবাসীর প্রতি তাঁর প্রবল প্রেম ও মানবতাবোধ থেকেই। মুজিবুর চাননি তিনি নিরাপদ দূরত্বে বেঁচে থাকবেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্র নিরাপদে থাকবে আর ঢাকা বা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইয়াহিয়া বাহিনীর কাছে চরম নির্যাতন ভোগ করবে। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল সকলের ভাগ্যে যা ঘটবে তাঁর ভাগ্যেও তাই ঘটবে। তাই তিনি পলায়নের পথ গ্রহণে স্বীকৃত হননি। সেখানেও তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল তাঁকে না পেলে ইয়াহিয়া বাহিনী মানুষকে আরো বেশী নির্যাতন করবে। তাঁকে খুঁজে পেতে ও দিতে আরো মানুষের মৃত্যু ঘটাবে। এছাড়া মুজিবুর একটি কথা ১৯৬৬ সাল থেকে বলে এসেছেন, "আমি থাকি বা না থাকি, আমি বেঁচে থাকি বা মরে যাই, তাতে আন্দোলনের কোন পরিবর্তন হবে না।" এছাড়া আরো একটা কথা আছে। শেখ মুজিবুর যদি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসতেন তাহলে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারে পাকিস্তানের হাতই শক্ত হতো। লোকে বলতো লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর মুখে ফেলে মুজিবুর পালিয়ে গেছে। স্ট্রাটেজির দিক থেকে মুজিবুরের আত্মগোপন যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন ভবিষ্যৎ আন্দোলনের পক্ষে সেটা কোন মহৎ নজির হতো না। মুজিবুরের রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ তুলে ধরছি। শুধু এই নিবন্ধ নয়, অন্য আরো বহু ঘটনা ও নজিরে দেখা যায় শেখ মুজিবুর রহমান হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সার্থক উত্তরাধিকারী ও জীবনদর্শন অনুসরণকারী।

"ছাত্রাবস্থায় শেখ মুজিবুরের রাজনীতিতে হাতেখড়ি কলকাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের কাছে। তাঁর বয়স তখন মাত্র সতের। তখন থেকে মুজিবুর কলকাতার বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন এবং নেতাজী এবং শ্রদ্ধেয় শরৎ বসু মহাশয়ের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। তখন ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি এবং নেতাজী তখন স্বদেশ ও বিদেশের ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য।

মুজিব নেতাজীর এই সাংগঠনিক প্রস্তুতির অবস্থায় তাঁর সান্নিধ্যে আসেন। উনিশ শ' তেত্রিশ সালে নেতাজী তাঁর মৌলিক রাজনৈতিক দর্শন উপস্থাপিত করেন লণ্ডনে এক ছাত্রসভায়। বক্তৃতার বিষয় ছিল, "সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

সংগ্রাম এবং সাম্যবাদ।" এই বক্তৃতায় ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও আপসমুখী নেতৃত্বের জন্য কিভাবে পঙ্গু হয়ে গেছে তার এক বিরাট ইতিবৃত্ত নেতাজী তুলে ধরেন।

মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের অবশ্য বিরোধী তিনি ছিলেন না। কিন্তু নেতাজী আন্দোলনের স্তর উন্নয়ন সম্পর্কে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা সভায় উপস্থাপিত করেন। তিনি আন্দোলনের সাফল্যের জন্য ৪টি প্রাথমিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন :

১। সরকারের কর এবং অন্যান্য রাজস্ব আদায় সম্পূর্ণ বানচাল করার ব্যবস্থা।

২। সরকারী প্রশাসন, পুলিশ এবং সম্ভব হলে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি সৃষ্টির প্রচেষ্টা করা—যাতে আন্দোলন দমন করার সরকারী নির্দেশ কার্যকরী না হয়।

৩। আন্দোলন চলাকালীন সরকারের সংকটময় মুহূর্তে সমস্ত সরকারী সরবরাহ—খাদ্য, অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সব কিছু বিচ্ছিন্ন করার জন্য সুসংগঠিত করণ।

এবং (৪ পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সশস্ত্র প্রচেষ্টা।

নেতাজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, প্রথম তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ছন্নছাড়া হয়ে যাবে আর সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হওয়ার ফলে আন্দোলন জয়ের পথে এগিয়ে যাবে। এই বক্তৃতায় নেতাজী ঠিক কোন স্তরে বিপ্লব সশস্ত্র আকার নেবে তার কোন উল্লেখ করেননি। শুধু তিনি বলেছিলেন, গান্ধীজির নেতৃত্বে বিপ্লব ঠিক পূর্বোক্ত পথে এগোয়নি, তা ব্যর্থ হয়েছে।

মুজিবুর রহমানের কাছে নেতাজীর এই বক্তৃতা প্রথম রাজনৈতিক জ্ঞান উদয়ে সাহায্য করেছিল এবং এবারের পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলন সংগঠনে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক দীক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। প্রথমেই মুজিব আন্দোলনের লক্ষ্য স্থির, হয় সরকার তাঁর ৬ দফা দাবি মেনে নিক, অন্যথায় তাঁর সংগ্রাম আপোসহীন। আন্দোলনের কৌশল অবশ্যই অহিংস—অসহযোগ, কিন্তু হিংস্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তাঁর বক্তৃতায় অনেকদিন থেকেই

বলে আসছেন। আক্রমণ হিংস্র এবং বীভৎস পর্যায়ে যেতে পারে এই ধারণা তাঁর এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ছিল। এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন পর্যায়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক প্রস্তুতিও করেছেন লীগ নেতারা।

মার্চ মাসের দু তারিখ হতে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় চলে মার্চ মাসের চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত। তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায় এবং শেখ মুজিবুর ঘোষণা করেন তাঁর ৩৫ দফা নির্দেশ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"বীরত্বপূর্ণ গণ-সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যারা স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছেন তারা যেন আমাদের সংগ্রামকে বিশ্ব-জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসাবে মনে করেন। বাংলাদেশের জনসাধারণ প্রমাণ করেছে কিভাবে তাঁদের সংগ্রামী ঐক্য ও দৃঢ়তা পাশবিক শক্তির দ্বারা স্বাধীনতাকে যারা নিষ্পিষ্ট করতে চায় সেই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করতে পারে। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ—পুরুষ-মহিলা এবং এমন কি শিশুরা পর্যন্ত উন্নত শির। নগ্ন হিংসা দিয়ে যারা মানুষকে অবদমিত করতে চেয়েছে তারা আজ পর্যুদস্ত। সরকারী ও অফিস কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক-কৃষক ও ছাত্র, বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ নিশ্চিত ভাবে ঘোষণা করেছে যে তারা আত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মদানে প্রস্তুত।"

"বাংলাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করা যাবে না। আমরা অজেয়, কারণ প্রয়োজন হলে আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত—যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা স্বাধীনতা ও সম্মানের সঙ্গে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচতে পারে। তাই আমাদের সংগ্রাম নতুন উদ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। যে কোন আত্মত্যাগের জন্য আমি মানুষকে প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই এবং আন্দোলনকে হিংসার দ্বারা দমন করার সমস্ত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই।"

শেখ মুজিবুর পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রীরূপে একবার জাপান পরিদর্শনে যান। জাপানে গিয়ে মুজিবুর দেখলেন অনেক কিছু, কিন্তু সেই সঙ্গে দেখতে গেলেন জাপানের উপকণ্ঠে রেনকোজী মন্দির। যেখানে রয়েছে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের

তথাকথিত চিতাভস্ম। রেনকোজী মন্দিরে একখানা মন্তব্য লিখবার খাতাও রয়েছে যে খাতায় দেশ বিদেশের সুধীজনেরা তাঁদের মন্তব্য লিখে রেখে আসেন। সেই মন্তব্য খাতায়, স্বর্গত পণ্ডিত জহওরলাল নেহরুরও মন্তব্য লেখা রয়েছে। নেহরুজী লিখেছেন "বুদ্ধের ভাবমূর্তি সর্বজনে বিরাজ করুক।" নেতাজীর চিতাভস্ম দেখতে গিয়ে পণ্ডিত নেহরুর কিন্তু একবারও নেতাজীর কথা মনে পড়লো না। তিনি লিখলেন বুদ্ধের কথা। আর সেই খাতায় শেখ মুজিবুর লিখলেন "নেতাজী হলেন অখণ্ড ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা যাঁর নেতৃত্বে কোন গলদ ছিল না এবং একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব হত অখণ্ড ভারতের মুক্তিসাধনা। হে নেতাজী লহ প্রণাম।" নেতাজীর চিতাভস্ম সমীপে উপস্থিত হয়ে মুজিবুরের বারে বারে মনে পড়েছে অখণ্ড ভারতের কথা, মনে পড়েছে নেতাজী থাকলে ভারত বিভাগ হয়ত হত না। মুজিব বুঝি নেতাজীর অসমাপ্ত কার্যই করতে চেয়েছিলেন, তাই নিজের জীবন দর্শন প্রবাহিত করেছিলেন নেতাজীরই ভাবাদর্শে। নেতাজী আর মুজিবের চোখে বাংলা দেশের রূপ ছিল অভিন্ন।

বিশ্বকবির সোনার বাংলা
নজরুলের এই বাংলাদেশ
জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
নেইকো তার রূপের শেষ।

জয় হিন্দ—জয় বাংলা—

॥ সমাপ্ত ॥

লেখক পরিচিতি

মহাকবি কৃত্তিবাসের বংশধারার যুক্ত গৌরবে ছদ্মনাম—কৃত্তিবাস ওঝা। নৈহাটীতে ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যুক্ত হন, জেলে গেছেন অনেকবার, জেল থেকে শেষ বেরিয়ে আসেন ১৯৫৯ সালে। ১৯৫২ সালে সম্মিলিত বামপন্থীদলের নির্বাচনপ্রার্থী মনোনীত হয়েছিলেন। ছাত্র অবস্থায় রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং নাটক রচনা ও অভিনয়ে স্বীকৃতি লাভ করেন। অনেক নাটক লিখেছেন। তন্মধ্যে বিশ্ব যুব উৎসবে পুরস্কার ও পদকপ্রাপ্ত একখানি নাটক অধ্যাপক নীরেন রায় "দি এক্সাইল" নামে বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করেন। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী ও শচীন সেনগুপ্তের স্নেহসান্নিধ্য লাভ করেন। ছোটগল্পে সুলেখা পুরস্কার লাভ করেন।

রাজনীতি করার সময়েই সাংবাদিকতার আঙ্গিনায় প্রবেশ করে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় নেপথ্য রাজনীতির চিত্র লিখে সাড়া জাগান এবং নানা পত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লেখক রূপে পরিচিত হন। ১৯৬৩ সালে নবকলেবরে বসুমতী পত্রিকা প্রকাশিত হলে সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করেন, পরে রাজনৈতিক সংবাদদাতার পদে উন্নীত হন। দৈনিক ও সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকাতেই প্রথম কৃত্তিবাস ওঝা নামে লিখতে শুরু করেন।

রাজনৈতিক নেপথ্য ও অকথিত কাহিনী নিয়ে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন। তন্মধ্যে হালের রাজনীতি নিয়ে তিনিই প্রথম "নকশালবাড়ী ও রাজনৈতিক আবর্ত" নামে গ্রন্থ রচনা করেন। লেখকের অন্যতম সাম্প্রতিক গ্রন্থ "আমায় মারছো কেন : নিঃশত্রু নায়ক হেমন্ত বসু।"

জন্ম খুলনার সেনহাটীতে বিখ্যাত চাটুজ্যেবাড়ীতে। পৈত্রিক নিবাস যশোহরে কালিয়ার রায়পুরে।

এই পুস্তক রচনায় যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে :—

১। ইণ্ডিয়া টুডে টুমরো — রজনী পাম দত্ত
২। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল — চীরেন মুখার্জী
৩। ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রিডম — এ,বুল কালাম আজাদ
৪। এক্লিপ্‌স্ অব ইস্ট প্যাকিস্তান — জ্যোতি সেনগুপ্ত
৫। ভইদার টু বেঙ্গলস — শরৎচন্দ্র বসু
৬। পাকিস্তান অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া রিলেশন — শকসেনা
৭। দ লাস্ট ডেজ অব দ ব্রিটিশরাজ — লিওনার্ড মোসলে
৮। এ হিস্ট্রি অব পাকিস্তান — ওয়াই. ভি গ্যানকোভস্কি ও এল. আর. গর্ডন পলসনকারা
৯। দ্য ইন্টিগ্রেশন অব দ্য ইণ্ডিয়ান স্টেটস্ — ভি পি. মেনন
১০। পাকিস্তান — ডোনাল্ড এন উইলবার
১১। আই ওয়ার্নড মাই কান্ট্রিমেন — শরৎচন্দ্র বসু
১২। মুক্তির সন্ধানে ভারত — যোগেশচন্দ্র বাগল
১৩। পূর্ব-পাকিস্তান — অমিতাভ গুপ্ত
১৪। বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান — কহ্লন
১৫। ভারতের মুক্তিসংগ্রাম — সুভাষচন্দ্র বসু
১৬। বিপ্লবী বাংলা ও স্বাধীনতার ইতিহাস — রাজেন্দ্রলাল আচার্য
১৭। মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন — আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৮। জেল ডায়েরী — সতীন সেন
১৯। পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি ও মার্কিন চক্রান্ত — ভূপেশ গুপ্ত
২০। পত্রিকাসমূহ—সপ্তাহ, কম্পাস, লিংক, মেনষ্ট্রিম, ব্লিৎস, আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ, সাপ্তাহিক বসুমতী।
২১। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাসমূহ—ইত্তেফাক, আজাদ, পূর্বপাকিস্তান, জনতা, একতা, স্বাধিকার, পূর্বদেশ, গণশক্তি প্রভৃতি।

বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পের তালি

[illegible]6/K (1)
[illegible]dhut, Kalikananda
অব[illegible]ত, কালিকানন্দ

অনাহত আহুতি	৫	০০
অবিমুক্ত ক্ষেত্রে	৪	৫০
উদ্ধারণপুরের ঘাট	৪	৫০
একা জেগে থাকি	২	০০
কলিতীর্থ কালীঘাট	৪	০০
কৌশিকী কানাড়া	৩	৫০
[illegible]	৭	০০
দেবারিগণ	৪	৫০
দুরি বৌদি	৪	০০
*দুই তার	২	৫০
ন ভূতং ন ভবিষ্যতি	২	০০
নিরাকারের নিয়তি	২	০০
পিয়ারী	৪	০০
ফক্কড়তন্ত্রম্ ১ম পর্ব	২	৭৫
ফক্কড়তন্ত্রম্ ২য় ও ৩য় পর্ব	৩	৭৫
বশীকরণ	৪	০০
*বহুব্রীহি	৪	৫০
ভূমিকালিপি পূর্ববৎ	৫	৫০
মরুতীর্থ হিংলাজ	৫	০০
মায়া মাধুরী	৫	৫০
মিড় গমক মূর্চ্ছনা	৪	০০
শুভায় ভবতু	৫	০০
[illegible] পিনাকিনী	৩	০০
[illegible]স্তিনী সীমা	৪	০০
[illegible]	[illegible]	[illegible]

A-147
Abhijatri
অভিযাত্রী (ছদ্মনাম)

অনির্বাণ শিখা
নষ্টচন্দ্রের আলো
পাওয়া না পাওয়া

A-176/M (9)
Acharya, Mihir
আচার্য, মিহির

অনিকেতা
আলোর সহোদর
এক নদী বহু তরঙ্গ
ছয় ঋতু বারো মাস
জোনাকীর আলো
দ্বিরাগমন
ধূসর পদাতিক
প[illegible]ারের তীরে

A-176/P (8)
Acharya, Phanibhus
আচার্য, ফণীভূষণ

পঞ্চকন্যা
পলাশ বনের গোধূলি
হলুদ পাখীর ডাক

A-176/S (21)
Acharya, Sushil
আচার্য, সুশীল

প্রতীক্ষা